বর্ধমান পরিচিতি

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন, এম. এ.
ও
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, এম. এ.

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

"বর্ধমান পরিচিতি" বর্ধমানেরই জনগণের হাতে সমর্পিত হইল।

পূর্বতন যে সকল রচনা গ্রন্থ-প্রণয়নের উপাদান সংগ্রহে প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছে তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। Fifth Report on the affairs of the East India Company.

২। Indian Famine Commission Report, 1880

৩। District Gazetteer, Burdwan, 1910

৪। Final Report of Survey and Settlement, Burdwan District, 1932

৫। Land Revenue Commission Report, 1938

৬। Ancient System of Irrigation in Bengal—William Wilcocks

৭। Bengal Peasant Life—Rev. Lal Behari De

৮। Census Report, 1951

৯। Bengal Crop, Statistics Report, 1942

১০। মধ্যযুগের বাংলা—কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১১। বাংলার ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

১২। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহার রায়

১৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ

১৪। ধর্মমঙ্গল—রূপরাম চক্রবর্তী—ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত

১৫। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৬। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয় কুমার দত্ত

বর্ধমান পরিচিতি

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট সমূহ

"বহুদিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

নিবেদন

বর্ধমান পরিচিতি প্রকাশিত হইল।

ইং ১৯১০ সালে জিলা গেজেটিয়ার প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল গত হইয়াছে। ইতোমধ্যে ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক দিয়া যেমন বহু নূতন নূতন তথ্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসিয়াছে বহু। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানের ইতিহাস সঙ্কলনে অনেকেই কিছু কিছু অগ্রণী হইয়াছেন কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও সাধারণ জীবন সম্পর্কীয় পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য প্রকাশের কোন সুসংবদ্ধ প্রয়াস হয় নাই। ১৯৫১ সালে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে জিলার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য "রাঢ় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং এই গ্রন্থের অন্যতম রচয়িতা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমিতির প্রচেষ্টায় কোন ইতিহাস রচনা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৫৪ সালে বর্ধমান গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সম্মেলনের সুযোগে স্বর্গত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বলাই দেবশর্মার সহযোগিতায় অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন। তারপর ১৯৫৯ সালে বর্ধমান জিলা কংগ্রেস সম্মেলনের সময় স্বর্গতঃ বলাই দেবশর্মার সহযোগিতায় "বর্ধমানের ইতিহাস" নামে পুনরায় আর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এই সময় বর্ধমান সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সহিত অন্যতম গ্রন্থকার শ্রীঅনুকূল সেনের আলোচনা হয়। নানাবিধ সরকারী কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বহুকাল বর্ধমানে অবস্থানের জন্য শ্রীসেন এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং উভয়েই জিলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে বিশেষ আগ্রহশীল হন। ইহা হইতেই রূপ পায় বর্তমান গ্রন্থ।

গ্রন্থ প্রণয়নে বহু শুভানুধ্যায়ী ও সহৃদয় সুহৃদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের নিকট ঋণী। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও দেশপ্রেমিক শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থখানির প্রস্তাবনা লিখিয়া উৎসাহবর্ধন করিয়াছেন; গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেছেন।

যে সকল প্রাচীন দেবালয় বা মন্দিরের চিত্র গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, ইহাদের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্তের নিকট কৃতজ্ঞ। আসানসোল খনি-অঞ্চলের বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে উখরার শ্রীনলিনবিহারী লাল সিং মহাশয়ের সৌজন্যে; তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইতেছে। গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টের লেখক হইতেছেন অধ্যাপক শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়; নবম ও দশম পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহাদের সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকৃত হইতেছে।

সর্বশেষে, ব্যবসায়িক লাভ ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া প্রকাশন সংস্থার পক্ষে শ্রীজ্যোতির্ময় গুহ মহাশয় এই ধরণের পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য যে আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন সেইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে।

কলিকাতা
২৩শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৩

অনুকূলচন্দ্র সেন
নারায়ণ চৌধুরী

প্রস্তাবনা

বর্ধমানের ইতিহাস রচনার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। ....কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সকলেরই উপর এই কার্যভার অর্পণ ক'রে গেছেন। বাঙালী মাথা পেতে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে বাঙলার ইতিহাস রচনার চেষ্টা বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বর্ধমানের ইতিহাস রচনা এই মহান প্রয়াসের অঙ্গ।

বর্ধমান বলতে মাত্র বর্ধমান শহর বা জিলাকে বুঝায় না; বর্ধমান অর্থে রাঢ়ভূমি, পশ্চিমবঙ্গ। প্রশাসনিক ব্যাপারে আজও রাঢ়ভূমি বর্ধমান বিভাগ বলে কথিত। বর্ধমানের ইতিহাস অবশ্য আঞ্চলিক ইতিহাস। কিন্তু আঞ্চলিক বিশিষ্টতার কারণে বর্ধমান সমগ্র বাঙলার ইতিহাস গঠনে প্রচুর উপাদান জুগিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল নিয়েই তো দেশ। সমগ্র বাঙলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-সৃষ্টির সাগর-সঙ্গমে বর্ধমান বা রাঢ় দেশ বা পশ্চিম বাঙলা তার বিশেষ অর্ঘ্য দান করেছে।

বর্ধমান ভুক্তি কথাটা পুরাতন—খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও চলিত ছিল। ভুক্তি অর্থে দেশ বা প্রদেশ। তখন বাঙলার দুটি অংশ ছিল গঙ্গার দুই তীরে—এক পারে বর্ধমান ভুক্তি ও অপর পারে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি। বর্ধমানের গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামে ষষ্ঠ শতাব্দীর এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রশাসনে বর্ধমান ভুক্তির কথা উল্লেখ আছে। বর্ধমান নগরের নাম অনুসারে দেশের নাম হয়েছিল বর্ধমানভুক্তি, একথা বিচারসহ ও গ্রাহ্য।

বর্ধমান নাম কোথা হতে এল—এর উৎপত্তি কি? ২৪শ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানস্বামী জৈন ধর্ম প্রচারকল্পে শিষ্যবৃন্দসহ দ্বাদশ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ সুহ্মভূমি বজ্রভূমি বা লাঢ় (রাঢ়) ভূমিতে ভ্রমণ করে বেড়িয়ে ছিলেন। তখন এই দেশে জৈনধর্ম প্রবল ছিল। মহাপুরুষ

বর্ধমানস্বামীর পুণ্য নাম অনুসারে পশ্চিম বাঙলার নাম বর্ধমান হয়েছিল একথা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং বধমান নাম অতি প্রাচীন, কারণ মহাবীর বর্ধমান ভগবান তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ছিলেন। সে তো খৃঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্ গঙ্গারিড়ি নামে এক জনপদের কথা বর্ণনা করেছেন। ঐ জনপদের মেগাস্থিনিস্ যে স্থান নির্ণয় করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে ঐ জনপদ বাঙলার রাঢ় দেশ। গঙ্গারিড়ি অর্থে গঙ্গারাঢ় অর্থাৎ গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় দেশ। এই দেশ প্রবল পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

পাল রাজগণের সময় বর্ধমান বা রাঢ় দেশের দুই অংশ উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে চলিত হয়। আজও এই নাম প্রচলিত আছে। বর্তমানে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের ছেদ রেখা হল অজয় নদী। অনেকে মনে করেন, পূর্বে দামোদরই ছিল এই ছেদ রেখা। কালক্রমে দামোদরের খাদ অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

বর্ধমানের ভৌগোলিক বিশেষত্ব বর্ধমানের ইতিহাসকেও একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বর্ধমান বাঙলা দেশের সমতলভূমি ও পার্বত্যভূমির সঙ্গমস্থল— 'বর্ধমানের রাঙ্গামাটি'র ভিতরই পাহাড় অঞ্চলের প্রথম পরিচয়—তার রেশ। গঙ্গার উত্তরে শুধু সমতল, যতক্ষণ না হিমালয়ের পাদদেশে পৌছানো যায়। এদিকে গঙ্গার অপর পারে বর্ধমান বা রাঢ়ভূমির প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন সমতল ক্রমশঃ শেষ হয়ে এসেছে, আর পাহাড় জঙ্গলময় ঝাড়খণ্ড শুরু হয়েছে। তাই এই স্থান সমতলের আর্যসভ্যতা ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সভ্যতার একটি সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণ স্থান এবং এই অঞ্চলের সংস্কৃতি সর্বত্র তারই দ্বারা প্রভাবিত, পুষ্ট ও বিচিত্রীকৃত। বর্ধমানের ইতিহাস আলোচনায় এই কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অতি প্রাচীনকালে এই সুহ্মদেশ পূর্বদক্ষিণভাগে সমুদ্র বেষ্টিত ছিল। মহাভারত, জৈনধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র, পালি মহাবংশ, রঘু-বংশ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দশকুমার চরিতে সুহ্ম বা বর্ধমান নামের উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু বহুবিস্তৃত প্রাচীন রাঢ়ের ঠিকমত সীমানা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। অনেকে বলেন, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত রাঢ়ের বিস্তার ছিল।

সিংহলের পালি মহাবংশে প্রকাশ, খৃঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহপুর রাঢ়ের রাজধানী ছিল। রাজা সিংহবাহু সেখানে রাজত্ব করতেন। পুত্র বিজয়

সিংহকে অপরাধের শাস্তি দিয়ে তিনি নির্বাসিত করেন। বিজয় সিংহ সাতশত অনুচরসহ নৌবাহিনী নিয়ে সিংহল জয় করেন। জৈন শাস্ত্রে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলে পরিচিত। মহাবীরস্বামীর সময় বজ্রভূমি বা বর্ধমান জনপদ বন্যজন্তু ও অসভ্য লোকের বিস্তৃত আবাস ছিল। তিনি এই অঞ্চলের অসভ্য ও সুসভ্য উভয় জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। বহুপূর্ব যুগে মহাভারতের কালে এই অঞ্চলে সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতির বাস ছিল। মহাভারতে তাঁদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদানের বর্ণনা আছে। পাল-রাজগণের সময় এই জনপদে বৌদ্ধ প্রভাব ও সেন রাজগণের সময় ব্রাহ্মণ প্রভাব প্রবল হয়।

সমতল ও পার্বত্যদেশের সঙ্গমস্থল হিসাবে এবং সেই কারণে আর্য ও আদিবাসিগণের আদান প্রদান ও মিশ্রণের ক্ষেত্র হওয়ায় বর্ধমান বাঙলার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বর্ধমানের ইতিহাস আলোচনা ভূতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে অশেষ রহস্যপূর্ণ ও কৌতূহলপ্রদ। গবেষণা কার্য এই ক্ষেত্রে নানাদিক থেকে ফলপ্রসূ হয়ে প্রাচীন ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করবে, ঐতিহাসিকগণ এই আশা করেন।

বর্ধমানের প্রধান নদী হল ভাগীরথী, অজয় ও দামোদর। অজয় ও দামোদর বর্ধমান-ক্ষেত্রে একটি পাহাড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে ও অপরদিকে সমতলে এসে পড়েছে। দামোদর আদিবাসী এবং ধর্মঠাকুরের উপাসকদের নিকট গঙ্গার মত পবিত্র। সম্প্রতি দামোদর তীরস্থিত দুর্গাপুর অঞ্চল খননকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। ফলে বর্ধমানের ইতিহাস সুদূর অতীতের ভিতর প্রসারিত হয়ে গিয়ে চমৎকারিত্বে ও কৌতূহলের উদ্দীপনায় অভিনব একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বর্ধমান ক্ষেত্র ধর্মপুজার আদি এবং প্রধান স্থান। ঐতিহাসিকগণ বলেন, অনার্য ও আর্যদেবতার মিশ্রণে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি। ধর্মঠাকুর এই উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি বিশেষ পরিচয়। প্রাচীন মল্লসারুল তাম্রশাসনে ধর্মঠাকুরের বন্দনা আছে। বর্ধমানের বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, ধর্মপুজার পণ্ডিত বা পুরোহিতের কাজ করেন। বর্ধমানের আদিবাসীরা প্রাচীনকালে যাযাবর ও পশুপালক ছিল। বাউড়ি, হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি তাদেরই বংশধর। এরা আর্যপূর্ব সংস্কৃতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। বর্ধমানে গোপ ও সদ্গোপ-গণের প্রাধান্য যথেষ্ট। প্রাচীনকালে দুর্গাপুর অঞ্চলের নাম ছিল গোপভূম।

এদের মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন আছে। মনসা ও চণ্ডীপূজার প্রচলনও বর্ধমানে সমধিক। মনসার ঝাঁপান এককালে এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে খুব বড় উৎসব ছিল। মনসা-ভাসান খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, বল্লুকা প্রভৃতি দামোদরের বিভিন্ন খাতে ও পথেই সম্পন্ন হত, সেকথা মনসা-মঙ্গলে বলা হয়েছে। বর্ধমানের নানাস্থানে বাশুলী, ষষ্ঠী, বিশালাক্ষী রুক্মিণীদেবীর পূজা হয়ে থাকে। রুক্মিণী পুজায় শতাব্দী পূর্বেও যে নরবলি হত তার মুদ্রিত বিবরণ রয়েছে। এই সকল দেবতা বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে গ্রাম্য দেবতা হিসাবে বিরাজিত ও পূজিত হয়ে আসছেন। এই সকল গ্রাম্য দেবতা এবং তাঁদের পূজা পার্বণ ও উৎসবাদি নিয়ে গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতি বহুযুগ ধরে গড়ে উঠেছে। ধর্মের গাজন, শিবের গাজন, মঙ্গলচণ্ডীব্রত প্রভৃতি এই সংস্কৃতির উপাদান।

শূর ও সেন বংশের সময় রাঢ়ে জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যমতের প্রভাব বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু ভূমিদান-পত্র এই মতের পোষক। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান পত্র লিখে দিয়ে জমি দান করে বাস করানো অতিশয় পুণ্য কর্ম বলে গণ্য হয়ে এসেছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গ সমাজে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। তন্ত্রের শৈব ও শাক্ত উভয় মত এখানে প্রবল। ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে ৯টি এই রাঢ় দেশে অবস্থিত। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সর্বত্র দৃষ্ট হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শিব, কালী, কৃষ্ণ এখানে সর্বত্র নানাভাবে পূজিত হয়ে আসছেন। পুরাতন মন্দির গাত্রে, টালির ছাঁচে, কোথাও বা পাথরের উপর, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলার উৎকীর্ণ চিত্র নানাস্থানে দেখা যায়।

পাঠান আমল থেকে বর্ধমানের মুসলমানগণের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। কালনা ও মঙ্গলকোটের মসজিদ স্থাপত্যের দিক থেকে মনোরমও লক্ষণীয়। বর্ধমান অঞ্চলে গ্রাম্য সমাজে মুসলমানগণের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। বর্ধমান শহরে ও রাঢ়ের সর্বত্র পীরের আস্তানা গড়ে উঠেছে। পীরকে অবলম্বন করে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন পথ খোলা হয়েছে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজা তার বিশেষ নিদর্শন। কবিদের দিগবন্দনায় নানা দেবদেবীর সঙ্গে পীর পয়গম্বরের স্তুতি আছে। সংস্কৃতির সমন্বয়ে এই ধারাটি বিশেষ লক্ষণীয়।

বর্ধমানের গ্রাম্য সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদ্গোপদের প্রভাব সর্বত্র দেখা যায়। বণিকগণ প্রাচীন কাল থেকেই বর্ধমানকে সমৃদ্ধি-

সম্পন্ন করেছে। এই সম্পর্কে মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমানের কৃষি সম্পদ প্রচুর—এককালে বর্ধমান বাঙলার শস্যগোলা বলে পরিগণিত হয়েছে। যন্ত্র শিল্পের আক্রমণে অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও গ্রামশিল্প আজ একান্ত ম্রিয়মান অবস্থায়।

মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যে বর্ধমানের দান অমূল্য। ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম ও রূপরাম এবং চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরাম রাঢ়দেশের লোক। মহাভারতকার মহাকবি কাশীরাম দাস, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ), চৈতন্য চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ও চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন দাস বর্ধমানের চির-গৌরব হয়ে আছেন। বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস বর্ধমানের অলঙ্কার।

আধুনিক যুগে বাঙলার নবজাগরণ রাঢ় দেশেই আরম্ভ হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ বিশাল রাঢ়ের পুণ্য অমল জ্যোতিঃ। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাঢ় দেশ আপন বিশেষ শক্তির পরিচয় নানাভাবে দান করেছে।

বর্ধমানের ইতিহাস রচনার এই শুভ প্রচেষ্টা শুভফলদায়ী হউক এই আমার একান্ত আশা।

শিক্ষা-নিকেতন, বর্ধমান।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
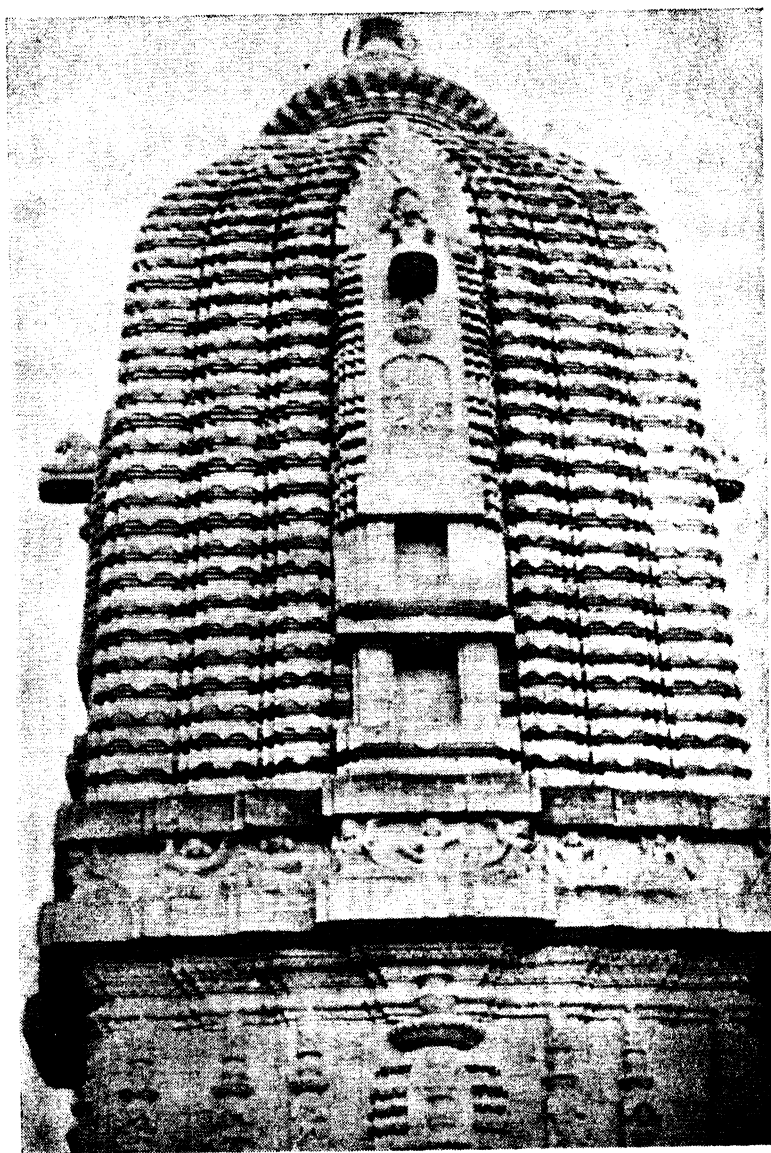
বরাকরের মন্দির

বরাকরের মন্দির

বরাকরের মন্দির

বৈদ্যপুরের দেউল
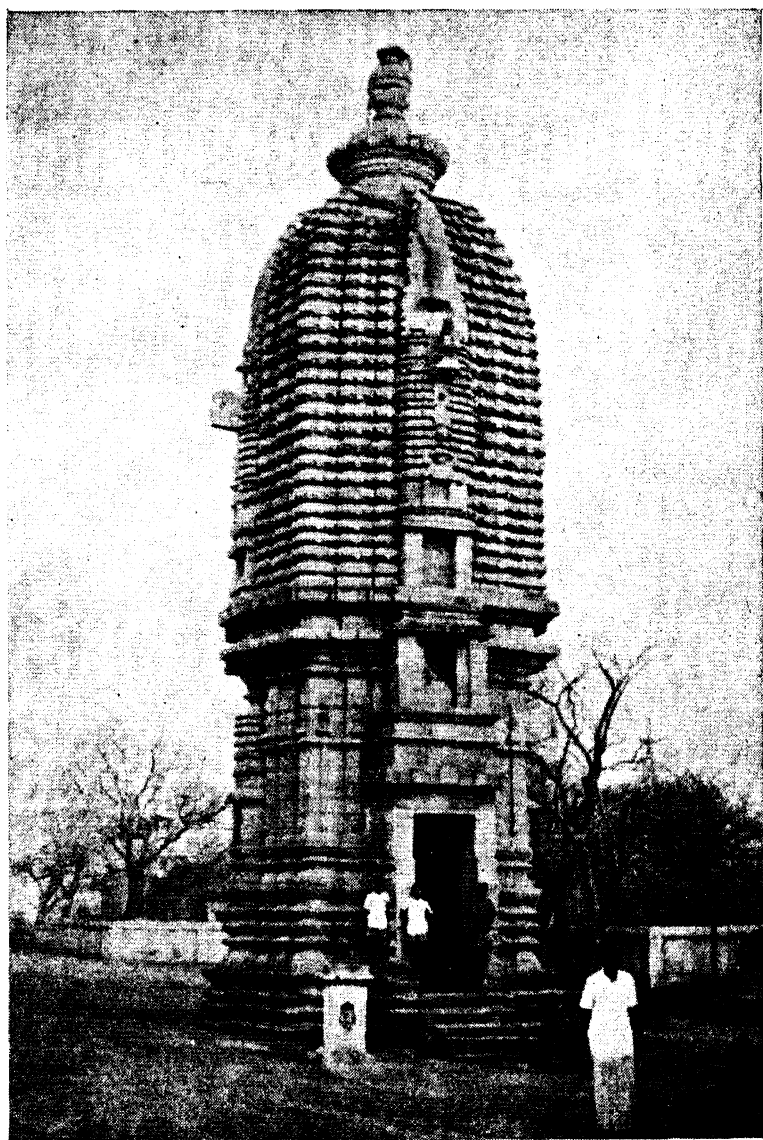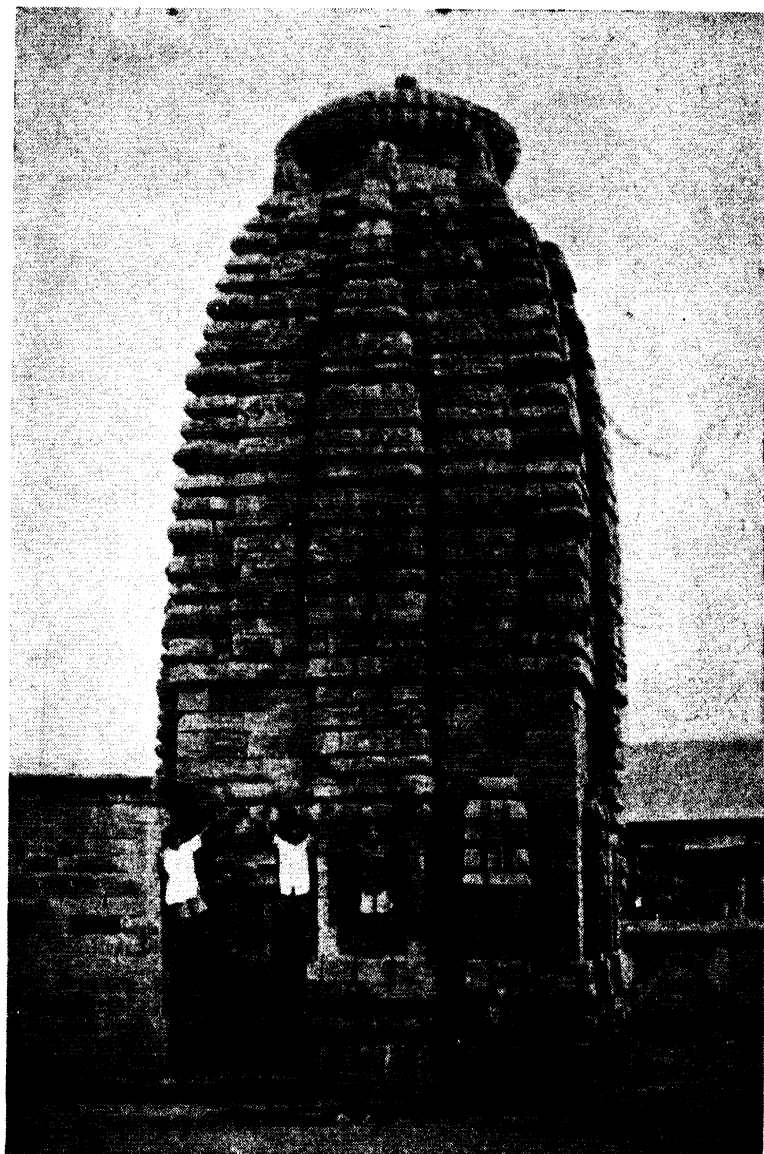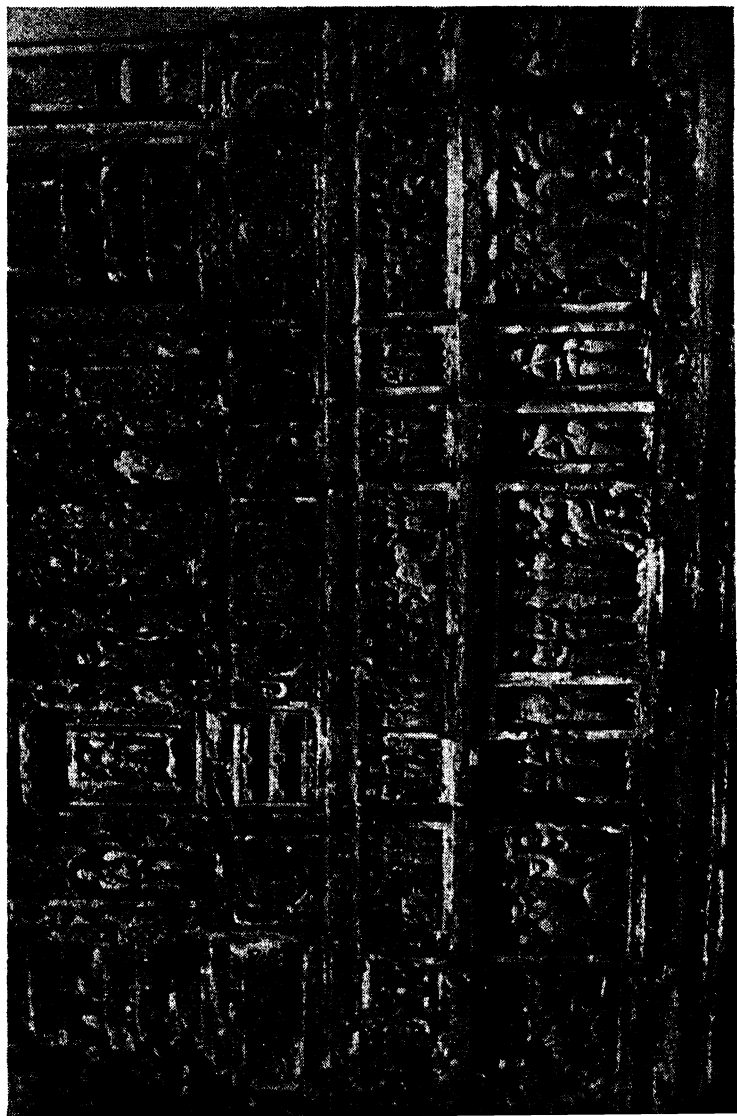
বৈদ্যপুর মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির—কালনা
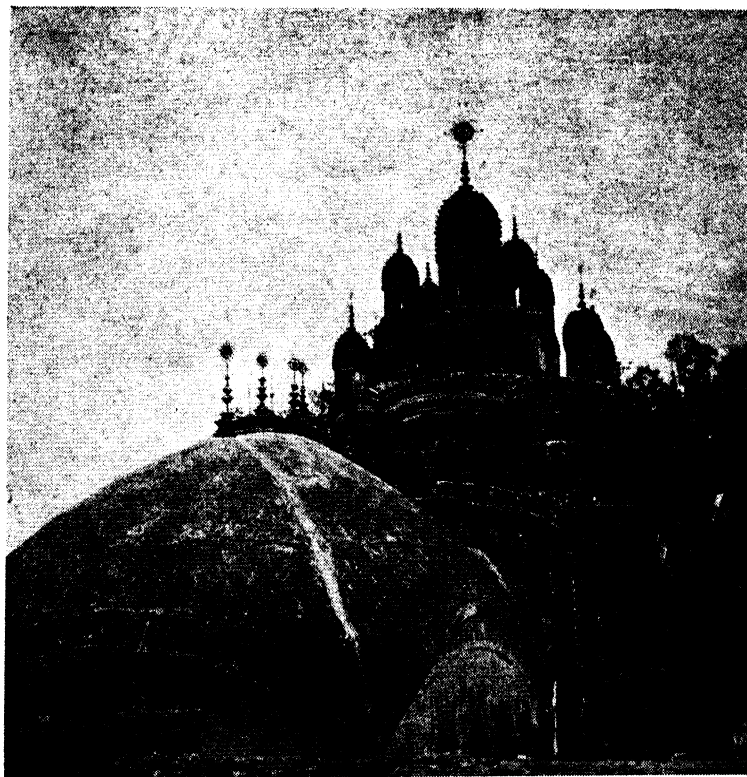
লালজির মন্দির—কালনা

বোরোর বলরাম মন্দির

গোপালজির মন্দির, কুলিনগ্রাম

জৌগ্রামের মন্দির
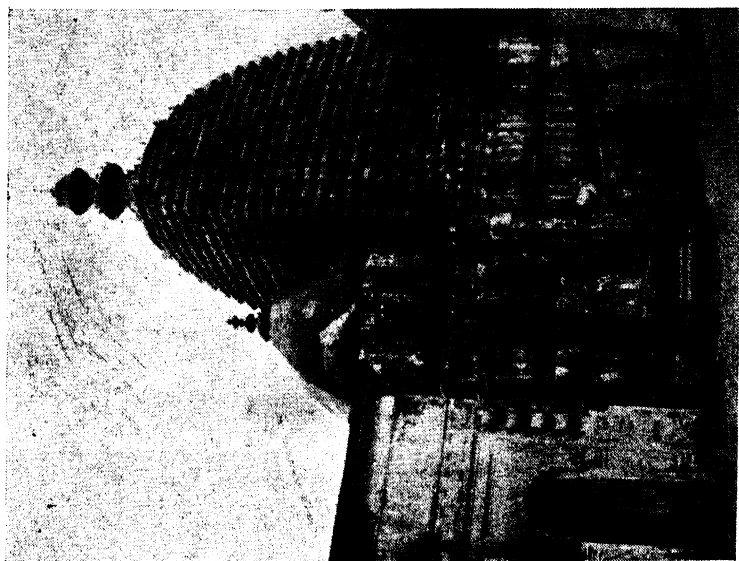
বলরাম বিষ্ণু, মশাগ্রাম
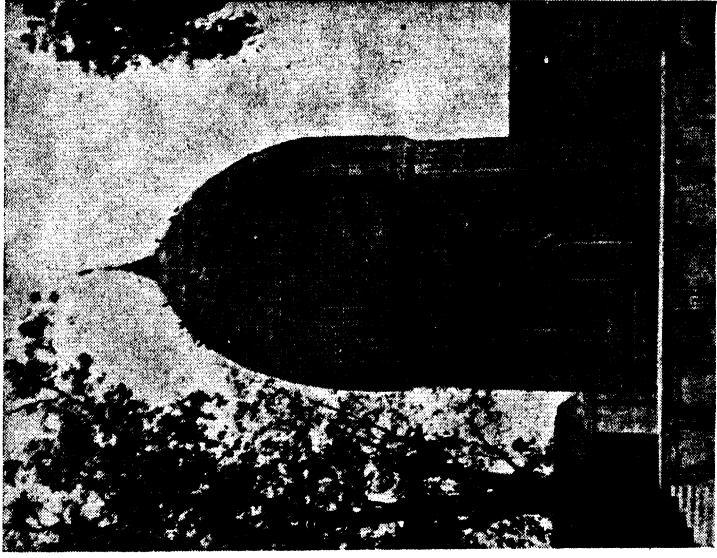
জলেশ্বর মন্দির—কালনা (শিখর দেউল)

বর্ধমান পরিচিতি

প্রথম ভাগ

"কাহিনী"

ভূমিকা

প্রধান শহর বর্ধমান হইতে জিলার নামকরণ হইয়াছে—বর্ধমান। "বর্ধমান" কথাটির অর্থ হইল—যাহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ধমান বা শ্রীবর্ধমান নাম অতি পুরাতন। গলসি থানার অন্তর্গত মল্ল সারুল গ্রামে প্রাপ্ত রাজা বিজয়সেনের নামাঙ্কিত তাম্রশাসনে "শ্রীবর্ধমান ভুক্তি"র উল্লেখ আছে: "সতত ধর্মক্রিয়া মানায়াং শ্রীবর্ধমান ভুক্তৌ।" তাম্রশাসনের সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। ধর্ম-ঠাকুরের পূজা-বিধানে "শ্রীবর্ধমান"কে অতি উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে; "শ্রীবর্ধমান" ধর্ম-ঠাকুরের পবিত্র পীঠস্থান, ধর্ম-ঠাকুরের যাবতীয় পীঠ-মালার মধ্যমণি। বর্তমান বর্ধমান নগরী ও "শ্রীবর্ধমান" একই স্থান কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে মেমারি থানার অন্তর্গত সুপ্রাচীন গ্রাম বরোঁয়া ধর্মপূজা বিধানোক্ত "শ্রীবর্ধমান"। বর্তমান বর্ধমান নগরীর ঐতিহাসিক উল্লেখ কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না।

কবি ভারতচন্দ্র রায় (রায়গুণাকর) তাঁহার কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ধমান নগরীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

"দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ!
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ।

চৌদিকে শহর পনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়
কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সলখে বানের গড় হয়।

ঢালী খেলে উড় পাকে ঘন ঘন হাঁক হাঁকে
রায় বেঁশে লোফে রায় বাঁশ
মল্লগণ মাল সাটে ফুটি যেন মাটি ফাটে
দূর হইতে শুনিতে তরাস।

নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসির থানা
বিকট দেখিতে লাগে শঙ্কা
দয়া সর্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা।”

প্রথম পর্ব

প্রাথমিক পরিচয়

জিলার সৃষ্টি

ইংরাজী ১৭৬০ সালে বর্ধমান যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে, তখন ইহার পরিচয় ছিল "চাকলা বর্ধমান" নামে। চাকলা বর্ধমানের আয়তন মাত্র বর্তমান বর্ধমান জিলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; সমগ্র বিষ্ণুপুর পরগনা, বর্তমান হুগলি ও বীরভূম জিলার এক বিরাট অংশ ও বর্তমান বর্ধমান জিলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত ছিল চাকলা বর্ধমান। ইং ১৮০৫ সালে বর্তমান আসানসোল মহকুমার কিয়দংশ—পরগনা সেন পাহাড়ি ও সেরগড়—এবং পরগনা বিষ্ণুপুর বর্ধমান হইতে পৃথক্ হইয়া জঙ্গল মহল নামক নূতন জিলার সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু ইং ১৮৩৩ সালে এই পরগনাগুলি আবার বর্ধমানের সহিত যুক্ত হয়। ইহার অব্যবহিত পরই অর্থাৎ ইং ১৮৩৫-৩৬ সালে বিষ্ণুপুর পরগনা, কোতুলপুর ও ইন্দাস সহ, নব গঠিত পশ্চিম বর্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত হয় ; এই জিলার সদর হয় বাঁকুড়া। ইতিপূর্বে ইং ১৮২০ সালে যখন হুগলি জিলা গঠিত হয়, পুরাতন চাকলা বর্ধমানের এক অংশ ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। ইং ১৮৭২ সালে কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী থানা পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া হইতে পৃথক্ হইয়া বর্ধমানের সামিল হয়, কিন্তু ১৮৭৯ সালে এই অংশ আবার উক্ত জিলায় ফিরিয়া যায়। এই সময় জাহানাবাদ—বর্তমান আরামবাগ মহকুমা—হুগলি জিলার সহিত যুক্ত হয়। ইহার পর জিলার সীমারেখার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই।

চতুঃসীমা

জিলার উত্তর সীমায় সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূম জিলা। অজয় নদ কাটোয়া মহকুমার প্রান্ত পর্যন্ত বীরভূমকে বর্ধমান হইতে পৃথক্ করিয়াছে কিন্তু তাহার পরই বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানা অজয়ের উত্তর ভাগে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলার সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দক্ষিণ ভাগে বাঁকুড়া ও হুগলি জিলা ও পুরুলিয়া জিলার কিছু অংশ। বিশাল দামোদর নদ বর্ধমানকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জিলা হইতে পৃথক্

করিয়া প্রবহমান। বাঁকুড়া জিলার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বর্ধমান দামোদরের অপর তীরে হুগলি জিলার প্রান্ত দেশ পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব সীমায় ভাগীরথী-প্রবাহ কাটোয়া মহকুমার উত্তর-পূর্ব হইতে কালনা শহরের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগীরথীর অপর তীরে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জিলা। কালনার পর সীমারেখা হুগলি জিলার উত্তর সীমার সহিত সমান্তরাল। পশ্চিমে বরাকর নদ, দিশেরগড়ের নিকট বরাকর দামোদরে মিশিয়াছে।

বরাকর নদ হইতে কালনার উপকণ্ঠে ভাগীরথী পর্যন্ত জিলার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ মাইল; কালনা ও কাটোয়া মহকুমা বরাবর ইহার প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল কিন্তু আসানসোল মহকুমায় এই প্রস্থ গড়ে প্রায় ১২ মাইল মাত্র।

আয়তন

ইং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মেজর রেনেল (Major Rennel) যখন নিম্ন বাংলা জরিপ করেন, বর্ধমানের আয়তন পরিমাপ হয় ৫১৭৪ বর্গমাইল। তখন বর্ধমানের মোট গ্রামসংখ্যা ছিল আট হাজারের উপর আর জনসংখ্যা ছিল প্রায় তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ইং ১৮৭২ সালের জরিপে আয়তন স্থির হয় ৩৫৮৮ বর্গমাইল। ইতিমধ্যে জিলার সীমারেখার যে পরিবর্তন হয় তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। ইং ১৯০৭-৮ সালের জিলা গেজেটিয়ারে আয়তন প্রকাশিত হয় ২৬৮৯ বর্গমাইল। ইং ১৯২৭-৩৪ সালের জরিপে আয়তন নির্ধারিত হয় ২৭০১ বর্গমাইল। ইহাই বর্তমান আয়তন।

মহকুমা ও থানা

শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র জিলা চারিটি মহকুমায় বিভক্ত; নিম্নে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল:

নাম	আয়তন	লোকসংখ্যা
বর্ধমান সদর	১২৮৪ বর্গমাইল	১১৪৭১৪১
কালনা	৩৮৫ "	৪১৬০৪৬
কাটোয়া	৪১০ "	৪২৭০০৬
আসানসোল	৬২২ "	১০৯৩৩৭৭

জিলার মোট থানার সংখ্যা ২৬টি। তাহাদের পরিচয় এইরূপ ঃ

মহকুমা	থানা	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
বর্ধমান সদর	বর্ধমান	১৫৬·২	২২৮১৬২
	গলসি	১৮৩·০	১৫৩৭৭০
	আউশগ্রাম	২৩০·৮	১৩·৫৮৪
	ভাতার	১৬০·০	১২৪১১০
	মেমারি	১৬৪·৯	১৭২২০০
	জামালপুর	১০১·৫	১০৯৫৯৩
	রায়না	১৮৭·১	১৪৮২৬৩
	খণ্ডঘোষ	১০০·৫	৭৯৪৫৯
কালনা	কালনা	১৩৪·২	১৬৫৫০৫
	মন্তেশ্বর	১১৭·৮	১০৭০৫৬
	পূর্বস্থলী	১৩৩·০	১৪৩৫৮৫
কাটোয়া	কাটোয়া	১৩১·৫	১৭৩২৬০
	মঙ্গলকোট	১৪১·০	১২২৫৭৮
	কেতুগ্রাম	১৩৭·৫	১৩১১৬৮
আসানসোল	আসানসোল	৩০·৬	১৬১১৭৬
	কুলটি	৩২·৫	১৫০১৯৭
	হীরাপুর	২৪·৬	৮৭৬০৪
	বরাবনি	৬০·৪	৬৫২২০
	রানীগঞ্জ	৩২·৮	৯১৮৫৩
	জামুরিয়া	৯০·৬	১৪৫২৩২
	অণ্ডাল	৭০·৪	৯৯৪৮০
	ফরিদপুর	১০৭·২	৬৪৪৪০
	কাঁকসা	১০৭·৮	৬৩৬৫৫
	দুর্গাপুর	১৩·০	৯১৪৬৬
	সালানপুর	৪৫·১	৪২৫৭৭
	চিত্তরঞ্জন	৭·০	৩০৪৭১

মিউনিসিপালিটি বা পৌরশাসন প্রতিষ্ঠান

মিউনিসিপালিটি বা পৌরশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বর্তমানে ছয়টি ; তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

মিউনিসিপালিটি	স্থাপিত	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গমাইল)
বর্ধমান	ইং ১৮৬৫ সাল	১০৭৮৮১	প্রায় ১০
কালনা	ইং ১৮৬৯ "	২২৫২৯	,, ৩
কাটোয়া	ঐ	২০৫৬৮	,, ৩
দাঁইহাট	ঐ	১০৫১৪	,, ৪
রানীগঞ্জ	ইং ১৮৭৬ "	২৯৭১৩	,, ৫
আসানসোল	ইং ১৮৯৬ "	১০৩৬৫৯	,, ৬

আসানসোল অঞ্চলে কয়েকটি জনবহুল শিল্পকেন্দ্র আছে। ইহারা কোনও মিউনিসিপালিটি-ভুক্ত নহে এবং ইহাদের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থার। নিম্নে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল :—

শিল্পকেন্দ্র	জনসংখ্যা
অণ্ডাল	১৭২৫৪
বার্নপুর	২১০৪৯
কুলটি	৩৪২৩৩
চিত্তরঞ্জন	২৮৯৭৩
দুর্গাপুর ইস্পাত-নগরী	৩৫৩৩৯
কোক ওভেন	৬৩৬০

দুর্গাপুর নোটিফায়েড্ এরিয়া অথরিটি, দুর্গাপুর উন্নয়ন (ডেভেলপমেণ্ট) অথরিটি ও আসানসোল প্লানিং অরগানাইজেশন প্রভৃতি উন্নয়ন সংস্থা এই মহকুমার উন্নয়নে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসে বর্দ্ধমান

"কথা কও, কথা কও
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন ব'সে চেয়ে রও।

*　　*　　*

"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
　　অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখেছ
　　মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত
　　কথা কও, কথা কও।"

প্রথম অধ্যায়

সুদূর অতীত

সুদূর অতীত কালের কোন ধারাবাহিক কাহিনীর পরিচয় সম্ভব নহে; ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত উপাদানের অভাব। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি অন্ধকারের যবনিকায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ আলোকরেখা এই অন্ধকার ভেদ করিয়া এক মহিমময় ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত করে বটে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অন্ধকারে আবৃত হয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অজয় অববাহিকায় রাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন মোহেন-জো-দেরো ও হারাপ্পার সমসাময়িক, অন্যূন সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের, এক প্রাচীন রাষ্ট্রের পরিচয় অজয়-বিধৌত অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু এ যুগের সম্যক্ ইতিহাস অজ্ঞাত। এই সভ্যতার বাহক যে প্রাক্-আর্য কোন জাতি সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উত্তর ভারতে আর্য অনুপ্রবেশে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহার ফলে কোন কোন প্রাক্-আর্য জাতি তাহাদের উন্নত সভ্যতার অভিজ্ঞতাসহ গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা নগর নির্মাণ করিতে পারিত, লৌহ ও তাম্রের ব্যবহার জানিত, কৃষিবিদ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিত। ইহাদের কোন কোন শাখা পূর্ব ভারতে বসতি স্থাপন করিয়া নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তার করে। অজয় অববাহিকার এই প্রাক্-আর্য-সভ্যতার বিকাশ, ইহাদেরই কীর্তি। কিন্তু ইহাও সম্ভব যে সিন্ধু সভ্যতার ন্যায় অজয় সভ্যতাও স্বয়ং প্রভাবান্বিত, স্বাধীন ভাবে অভিব্যক্ত।

অন্ধকার অতীত

অজয় অববাহিকায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

প্রাচীন কোন আর্য গ্রন্থে কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রাক্-আর্য সভ্যতা বিকাশের উল্লেখ নাই। প্রাচীন ভারতের এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিন্যাস যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে চারিটি প্রধান রাজ্যের সাক্ষাৎ মেলে

প্রাচীন প্রাচী রাজ্য

—মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ। মগধ ছিল বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা ও গয়া জিলা লইয়া অবস্থিত; অঙ্গদেশের অবস্থান ছিল মগধের পূর্বে, তাহার পূর্বে ছিল বঙ্গদেশ। কলিঙ্গ রাজ্য ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জিলা ও উড়িষ্যার অংশ লইয়া। এই প্রাচ্য অঞ্চলে খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ হয় নাই বলিয়া অনুমান। আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব যখন উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই, তৎকালীন সঙ্কলিত ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে প্রাচ্য রাজ্য সম্বন্ধে আর্যদের ধারণা ছিল ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায় খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে সকল রাজ্য বর্তমান ছিল তাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল রাজ্য বা মহাজনপদ সংখ্যায় ছিল ষোলটি।

"অঙ্গা : মগধা : কাশী-কোশলা :
বজ্জী-মল্লা : চেদি-বংশা :
কুরু-পঞ্চালা : মৎস্য-শূরসেনা :
অশ্মকা : অবন্তি গন্ধারা : কম্বোজা :।

সেই সময় যে সকল রাজ্য বা জনপদ আর্য-সংস্কৃতির গণ্ডির ভিতর ছিল, মাত্র তাহাদেরই নাম এই তালিকাভুক্ত। মনে হয় যে বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে তখন পর্যন্ত আর্য-সভ্যতার প্রবেশ হয় নাই। প্রবেশ করিলেও তাহার ধারা ছিল ক্ষীণ। প্রায় সমসাময়িক বৌধায়ন ধর্ম-সূত্র হইতে মনে হয় যে তখন বঙ্গ ও মগধদেশে আর্য-সংস্কৃতির মাত্র আংশিক বিস্তার হইয়াছে।

সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশ

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত দুইটি স্বাধীন রাজ্যের পরিচয় মহাভারত ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে পাওয়া যায়; ইহারা হইল সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশ। মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত আছে যে দৈত্যরাজ বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র ছিল ও তাহাদের স্থাপিত পঞ্চ রাজ্যও এই নামে পরিচিত হয়। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ভীম পুণ্ড্র দেশাধিপতি বাসুদেবকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরে সুহ্মদের অধীশ্বর ও সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করেন। পরবর্তী

বহু কাব্যাদি গ্রন্থে সুহ্মদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রঘু নানাদেশ জয় করিয়া তালিবনশ্যাম সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইলে সুহ্মবাসিগণ নতজানু হইয়া তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করে। তৎপরে রঘু বঙ্গীয় বীরগণের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া গঙ্গা স্রোতোঽন্তরে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। তারপর কপিশা নদী অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। এই কপিশা বর্তমান মেদিনীপুর জিলার কাঁসাই নদী। দশকুমার চরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তের পরিচয়ে বলা হইয়াছে যে এই নগর সুহ্মদেশের অন্তর্গত ছিল। তাম্রলিপ্ত বর্তমান তমলুক। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সুহ্মদেশের অবস্থিতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ইহার উত্তরে ছিল পুণ্ড্রদেশ, পূর্বে ভাগীরথী প্রবাহ, দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমে কলিঙ্গ।

রাঢ় দেশ

পশ্চিম বঙ্গের যে অংশে বর্ধমান জিলা অবস্থিত, তাহা এই প্রাচীন সুহ্মদেশেরই অন্তর্গত ছিল। ইহারই অংশ বিশেষ আবার রাঢ় নামে পরিচিত হয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সুহ্মদেশ ও রাঢ় দেশ একই—"সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"। মনে হয় যে কালক্রমে প্রাচীন সুহ্ম দেশ ইহার স্বাতন্ত্র্য হারায় আর ইহার কিয়দংশ যুক্ত হয় কলিঙ্গ বা উৎকল রাজ্যের সহিত ও অবশিষ্টাংশ রাঢ় বা লাঢ়া নামে পরিচিত হইতে থাকিল। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু প্রাচীন কাব্যাদিতে বহুকাল যাবৎ "রাঢ়" স্থান পায় নাই। দেশের এই অংশ পুরাতন সুহ্ম নামেই পরিচয় পাইয়াছে। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্য লিখিয়াছেন খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে; তাহাতে "সুহ্ম" দেশেরই উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী রাঢ় দেশেরই পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার পবনদূতে সুহ্ম নামে:

"গঙ্গাবীচিপ্লুত-পরিসর-সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্তয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।"

রাঢ়ের পরিচয়

রাঢ় বা লাঢ়ার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত আচারাঙ্গ সুত্ত নামক জৈন শাস্ত্র গ্রন্থে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে রাঢ় দেশ তখন ছিল জনপথহীন বিস্তৃত অরণ্যময়; অধিবাসিগণ ছিল সদাচারহীন ক্রূর প্রকৃতির। জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর তাহাদের

প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ

হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থেও রাঢ়বাসি-গণ কদাচারী বলিয়া বর্ণিত আছে। রাঢ়ের পরবর্তী উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক-সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) ও তৎপরবর্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে। এই

গ্রীক ঐতিহাসিকের গঙ্গারিডি

সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সেই সময় ভারতের পূর্ব-প্রান্তে প্রাচি ও গঙ্গারিডি নামক দুই পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে গঙ্গারিডির অবস্থান ছিল গঙ্গা প্রবাহের নিম্নাঞ্চল বেষ্টন করিয়া। গঙ্গারিডি রাজ্যের অধিবাসিগণও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট গঙ্গারিডি নামেই পরিচিত ছিল। গঙ্গারিডিয়গণ ছিল একটি শক্তিশালী জাতি। তাহাদের রাজ্যও ছিল সমৃদ্ধিশালী। পরাক্রান্ত সামরিক বাহিনীর ভিতর ছিল বহু সহস্র রণহস্তী। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার তাঁহার পঞ্চনদের শিবিরেই গঙ্গারিডির শৌর্যবীর্যের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। মৌর্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes) নামে যে গ্রীক দূত আসিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে গঙ্গারিডি রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের বাহিরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক প্লিনিও (Pliny) তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উহার প্রধান নগরী ছিল পার্থেলিস্। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই পার্থেলিস্ ও বর্ধমান নগরী অভিন্ন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐতিহাসিক টলেমি (Ptolemy) গঙ্গারিডি রাজ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লাটিন কবি ভার্জিল (Virgil) উচ্ছ্বসিত ভাষায় গঙ্গারিডির সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির জয়গান করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের প্রায় তিনশত বৎসর পরের পেরিপ্লাস্ গ্রন্থে (Periplus of the Erythrean Sea) গঙ্গারিডি রাজ্য পরাক্রম-শালী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গারিডিয়গণ ছিলেন নৌ-বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী এবং বহুপরিমাণে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র এই দেশ হইতে সাগরপথে বিদেশে প্রেরণ করা হইত। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত এই রাজ্যের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তারপর ইহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

গঙ্গারিডিয় সভ্যতা ছিল প্রাক্-আর্য যুগের। ঐতিহাসিক রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গঙ্গারিডিয়গণ ছিলেন দ্রবিড় জাতীয়। ওল্ডহ্যাম (Oldham) সাহেব বলেন যে, তাঁহারা ছিলেন বর্তমান বাগ্‌দি জাতির পূর্বপুরুষ (Oldham—Some historical and ethnological aspects of Burdwan District)। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাগ্‌দি জাতির সহিত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্ল রাজগণের ইতিহাস জড়িত আছে।

গঙ্গারিডিয় সভ্যতা প্রাক্ আর্য যুগের

এই গঙ্গারিডি ও রাঢ় অভিন্ন। গঙ্গাস্রোত-সংলগ্ন এই রাষ্ট্র বা রাজ্য আর্য ভাষাভাষীগণের নিকট পরিচিত হয় গঙ্গারাষ্ট্র নামে; ইহাই গ্রীক ঐতিহাসিকের গঙ্গারিডি। গঙ্গারাষ্ট্র নাম ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া গঙ্গারাঢ় বা মাত্র রাঢ় কথায় পর্যবসিত হয়। গঙ্গানদী বা বর্তমান ভাগীরথীর মূল প্রবাহ ছিল ইহার পূর্ব সীমা। খৃষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মূল প্রবাহ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জিলার মধ্য দিয়া ও বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার পূর্ব সীমা বরাবর প্রবাহিত ছিল, তারপর নৈসর্গিক কারণে এই মূল প্রবাহ মুর্শিদাবাদ জিলার উত্তর সীমা দিয়া পদ্মানদীর খাত অনুসরণ করে। বর্তমান ভাগীরথী প্রাচীন গঙ্গার পরিত্যক্ত প্রবাহ। গঙ্গারিডির কাহিনী হইতে প্রকাশ পায় যে আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বহু পূর্বেই এই জনপদ একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাহার অধিবাসিগণ কি জাতীয় ছিলেন, কোন্ ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন ও কি নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন তাহা সঠিক জানিবার কোনও উপায় নাই।

গঙ্গারিডি ও রাঢ়

সিংহলের প্রাচীন পালি গ্রন্থ মহাবংশে রাঢ়ের নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

মহাবংশ ও বিজয়-উপাখ্যান

বঙ্গদেশের রাজকন্যা রাঢ়ের গভীর অরণ্যানীর ভিতর দিয়া মগধ যাইবার পথে অরণ্য প্রদেশের সিংহ-রাজা কর্তৃক অপহৃতা হন্। সিংহ-রাজা পরে রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র সিংহবাহু। সিংহবাহু একশত যোজন পরিমাণ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া তথায় এক জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন, এই জনপদই রাঢ়। সিংহবাহুর পুত্র ছিলেন বিজয়সিংহ। বিজয়ের ঔদ্ধত্যের জন্য সিংহবাহু তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। বিজয় সাতশত অনুচর সহ অর্ণবযানে

সমুদ্রযাত্রা করেন ও লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি লঙ্কা অধিকার করেন ও নিজবংশের নামানুসারে লঙ্কার নামকরণ করেন সিংহল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার মনোরম ছন্দে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"ওই সিংহল দ্বীপ সিন্ধুর টিপ
কাঞ্চনময় দেশ
* * * *
শৈশব তার রাক্ষস আর
যক্ষের বশ হায়
আর যৌবন তার "সিংহে"র বশ
সিংহল নাম যায়
এই বঙ্গের বীজ ন্যাগ্রোধ প্রায়
প্রান্তর তার ছায়
আজো বঙ্গের বীর "সিংহে"র নাম
অন্তর তার গায়।"

মহাবংশ-বর্ণিত বিজয়-কাহিনী প্রাচীন রাঢ়ের শৌর্য, প্রাণ-শক্তি ও সমুদ্রান্ত বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের পরিচয় দেয়।

পরবর্তী প্রাচীন গ্রন্থ, লিপি প্রভৃতিতে রাঢ়

পরবর্তী যুগের বহু প্রাচীন গ্রন্থ, তাম্রশাসন বা খোদিত লিপিতে "রাঢ়" প্রদেশের উল্লেখ আছে। আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত দেবী পুরাণে বর্ণিত আছে যে রাঢ় বামাচারী শাক্তগণের আবাসভূমি। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে রাঢ় দেশের উল্লেখ আছে--

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমম্ নিরুপমা তথাপি রাঢ়াপুরী।"

চোল-সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয় লিপিতে (Tirumalai inscription) উত্তিল লাঢ়া অর্থাৎ উত্তর রাঢ় ও তক্কন লাঢ়া অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে। মনে হয় যে ইতিপূর্বেই রাঢ় এই দুইভাগে বিভক্ত হয়; উভয়ের সীমারেখা ছিল কাহারও মতে অজয় নদ, আবার কাহারও মতে দামোদর।

বর্ধমান ভুক্তি

রাঢ়ের একটি অংশ পরিচিত হয় "বর্ধমান ভুক্তি" নামে। "ভুক্তি"র অর্থ হইল প্রদেশ। বর্ধমান ভুক্তির আদি সীমারেখা ছিল উত্তরে অজয়

নদ, পূর্ব ও দক্ষিণে গঙ্গা প্রবাহ, পশ্চিমে অরণ্য। এক সময় কিন্তু বর্ধমান ভুক্তি বলিতে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে বুঝাইত। বর্ধমান ভুক্তির প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজা বিজয় সেনের মল্ল সারুল লিপিতে—

"সতত ধর্মক্রিয়া মানায়াং শ্রীবর্ধমান ভুক্তৌ"।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক্-তুর্কবিজয়

গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র রাজ্যের কাহিনীর সহিত রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাসের আদি পর্বের অবসান হয়। তারপর যে যুগের অবতারণা হয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা হইল এক অন্ধকারময় যুগ। ইতিমধ্যে আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি রাঢ় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। আর্য প্রভাবের বিস্তৃতি হয় তিনটি পৃথক্ ধারায়; জৈন ধর্মের বিকাশ প্রথম, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার দ্বিতীয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা তৃতীয়। ইহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যখন অন্ধকার যবনিকা কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজধর্ম রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

গুপ্ত যুগ পুষ্করণ ও চন্দ্রবর্মা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাঁকুড়া জিলার শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তখন চন্দ্রবর্মা নামক একজন রাজা পুষ্করণে রাজত্ব করিতেন। এই শুশুনিয়া লিপি পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি। চন্দ্রবর্মা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। মনে হয় বর্ধমান ও বাঁকুড়ার অংশ লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। পুষ্করণ বর্তমান পোখরনা, দামোদরের অপর তীরে বাঁকুড়া জিলায়। গুপ্ত-সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আছে যে সম্রাট্ দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে যে সকল নরপতিকে পরাস্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন পুষ্করণাধীপ চন্দ্রবর্মা। এলাহাবাদ প্রশস্তির চন্দ্রবর্মা ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা যে একই ব্যক্তি, তাহা একরূপ স্বীকৃত। এই চন্দ্রবর্মাকে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার বঙ্গ বিজয়ের পথে অগ্রসর হন।

মসাগ্রামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা

বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তর্গত মসাগ্রামে গুপ্তযুগের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই অঞ্চল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ বর্ণিত রঘুর সুহ্ম ও বঙ্গ বিজয় প্রকৃত পক্ষে গুপ্ত-সম্রাটগণের রাঢ়-বঙ্গ বিজয়েরই কাহিনী। কিন্তু গুপ্ত-সম্রাটগণের রাঢ়

বিজয় কোনও সুদৃঢ় শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়েন। সাম্রাজ্যের এই সুদূর প্রান্তসীমায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব হয়; তাহার অধিপতি হইলেন এক একজন সামন্ত নৃপতি। রাঢ় অঞ্চলের যিনি অধিনায়ক হইলেন তাঁহার নাম গোপচন্দ্র। গোপচন্দ্র আঞ্চলিক সামন্ত নৃপতিগণকে জয় করিয়া একটা বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্বে যে মল্ল সারুল লিপির কথা বলা হইয়াছে (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) তাহাতে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্ত জনৈক মহাসামন্ত বিজয় সেন কর্তৃক ভূমি দানের উল্লেখ আছে। মহাসামন্ত বিজয় সেন রাঢ়ের এই অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমান। সম্ভবতঃ তিনি পরবর্তী সেন রাজবংশের কোনও পূর্বপুরুষ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান সামন্ত শক্তির অভ্যুত্থান

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র

মহাসামন্ত বিজয় সেন

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে গৌড় অন্যতম। তখনকার গৌড় রাজ্য বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের অংশ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া অনুমান। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন সামন্ত নৃপতি গৌড়ের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গৌড় রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করার কল্পনা করেন। তিনি মহাসামন্ত শশাঙ্ক। শশাঙ্কের সময় গৌড়-রাজ্য পশ্চিমে কনৌজের সীমা ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও শশাঙ্ক যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় এবং বিহারের দক্ষিণাংশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাস স্বীকার করে। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণ-সুবর্ণ। কর্ণ-সুবর্ণের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যদিও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মুর্শিদাবাদ জিলার রাঙ্গামাটিই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ, কেহ কেহ মনে করেন যে হুগলী জিলায় মহানাদই এই স্থান। আবার কাহারও কাহারও অনুমান যে বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী কাঞ্চনগরই ছিল শশাঙ্কের কর্ণ-সুবর্ণ। শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব। চৈনিক পরিব্রাজক

মহাসামন্ত শশাঙ্ক

কর্ণ সুবর্ণ

ইয়ুয়ান-চ্যাঙ-এর মতে তিনি ছিলেন ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ও তাঁহার অত্যাচারে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পায়।

বাংলায় মাৎস্যন্যায়

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। ইহার পর যে যুগ আসিল তাহাকে বাংলার ইতিহাসে এক বিশৃঙ্খলার যুগ বলা যাইতে পারে। হর্ষবর্ধন পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন বটে, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর পশ্চিম বাংলা পার্শ্ববর্তী রাজগণ কর্তৃক মুহুর্মুহু আক্রান্ত হইতে থাকিল। কান্যকুব্জের যশোবর্মন, কামরূপের হর্ষদেব, কাশ্মীরের ললিতাদিত্য, সকলেই পর পর এই দেশের উপর অভিযান চালাইলেন। এদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতিগণ পুনরায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইলেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইল; অবিচার, অরাজকতা ও আত্মকলহের ফলে সাধারণের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। জলাশয়ের বড় মাছ যেমন ক্ষুদ্র মাছকে গ্রাস করিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে, দুর্বল সেইরূপ সবল কর্তৃক নিগৃহীত হইতে লাগিল; তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিল না। ইহারই নাম মাৎস্যন্যায়। এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সমাধান কল্পে বাংলার জনসাধারণ গোপাল নামক একজন নেতাকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন (৭৩০ খৃষ্টাব্দ)। ইনিই পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাল রাজ ধর্ম-পাল দেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে :—

"মাৎস্যন্যায়মপহিতুম্ প্রকৃতিভির্লক্ষ্যা করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ—শিরসাং চূড়ামণি—।"

আদিশূরের কাহিনী

প্রাচীন কিংবদন্তি ও কুলপঞ্জিকায় আদিশূর নামক একজন নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। কথিত আছে যে তাঁহার আবির্ভাবের সময় সকল রাজগণই বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক-মত প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রাঢ় দেশনিবাসী সপ্তশত ঘর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রিত বা অধিকারে অবস্থিত থাকিয়া এই তান্ত্রিক মতের পক্ষপাতী হন। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৌদ্ধমত-প্লাবিত দেশে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হন। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে ৬৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বেদবিধান

বঞ্চিত সপ্তশত ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য জানাইয়া দিলেন কিন্তু রাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে ঐ শকেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এ দেশে আগমন করেন। কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে দেশীয় সাতশত ব্রাহ্মণের পার্থক্য রাখিবার জন্য তাঁহাদের আখ্যা দেওয়া হয় "সপ্তশতী"। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Vincent smith) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্রমাণাভাবে আদিশূর নামক কোনও নরপতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এই নামিয় কোনও নরপতি বর্ত্তমান ছিলেন ও তিনি এই রাষ্ট্র বিপ্লবের সুযোগ লইয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে যে কাশ্মীর রাজ জয়াদিত্য গৌড়াধিপ জয়ন্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে এই জয়ন্তই আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন ও কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। জয়াদিত্য ৭৫১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে আগমন করেন।

রাঢ়ের শূরবংশ

কাহিনী যাহাই হউক না কেন, রাঢ় দেশে পাল রাজগণের প্রায় সমসাময়িক শূর বংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাঢ়ীয়কুল পঞ্জিকায় উল্লেখ আছে যে ভূশূর নামক কোনও নরপতি রাঢ়ে রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি শূরবংশীয়গণের পূর্বপুরুষ। এই ভূশূরের সহিত আদিশূর কাহিনীর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা জানা যায় না। রাজা ভূশূর কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের শ্রেণী বিভাগ করেন বলিয়া বর্ণনায় প্রকাশ। ইতিমধ্যে গৌড়ে পাল রাজগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাঁহাদের রাজ্যসীমা মাত্র বঙ্গদেশ নহে, পূর্বে কামরূপ ও পশ্চিমে মগধ ছাড়াইয়া বিস্তৃত হয়। পাল বংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের সময় উত্তর রাঢ় বিজিত হয়। শূর বংশীয় নরপতিগণ উত্তর রাঢ় ত্যাগ করিয়া পাল রাজগণের সামন্ত রূপে দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিতে থাকেন। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই অবস্থার সুযোগ লইয়া কয়েকটি বহির্শক্তি পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করিয়া ইহার অংশ বিশেষ অধিকার করে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উড়িষ্যার রাজা রণস্তম্ভ, চাণ্ডেলরাজ যশোবর্মন ও তাঁহার পুত্র ধঙ্গ, কলচুরি রাজ যুবরাজ ও তাঁহার পুত্র

পাল শক্তির রাঢ় বিজয়

শূররাজগণের উত্তর রাঢ় ত্যাগ

রাঢ়ে বহিরাক্রমণ

মহারাজাধি-
রাজ কান্তিদেব
ও বর্ধমান পুরী

লক্ষ্মণ রাজ, কম্বোজ রাজ গোপাল। এই সময়কার একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত সামন্ত নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়, নাম মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব। তাহার রাজধানী ছিল বর্ধমানপুরী। এই বর্ধমানপুরী ও পরবর্তীকালের বর্ধমান নগরী এক কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া শূর বংশীয় ধরণী শূর উত্তর রাঢ় পুনরধিকার করেন ও নিজের নামকরণ করিলেন আদিত্য শূর। কিন্তু পালরাজ বংশের নারায়ণ পালের সময় পালরাজ্যের হৃত গৌরব কিছু পুনরুদ্ধার হয়। নারায়ণ পাল উত্তর রাঢ় জয় করিয়া শূর বংশের আধিপত্য নষ্ট করেন। শূরবংশীয়গণ দক্ষিণ রাঢ়ের অপর-মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধরণী শূর

নারায়ণ পাল
ও
উত্তর রাঢ় জয়

পাল রাজ
মহিপাল ও
রাজেন্দ্র চোল

পালরাজ নারায়ণ পালের পর পাল শক্তি আবার দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে রাঢ় পুনরায় হস্তচ্যুত হয়। কিন্তু ইহার পর পাল বংশের নবম রাজা প্রথম মহিপালের সময় পালরাজ্য আবার শক্তিশালী হয়। মহিপাল হৃতরাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হন। উত্তর রাঢ় পুনরায় বিজিত হয়। কিন্তু সমগ্র রাঢ় প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইবার পূর্বেই সুদূর দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল রাঢ় আক্রমণ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজেন্দ্র চোল বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে দামোদর অতিক্রম করেন ও পরে যুদ্ধে মহিপালকে পরাস্ত করেন। রাজেন্দ্র চোল ভাগীরথী তীরস্থ ত্রিবেণী পর্যন্ত যাবতীয় ভূখণ্ড অধিকার করেন কিন্তু বিজয় লব্ধ রাজ্য সুসংবদ্ধ না করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর মহিপাল সমগ্র রাঢ়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু পালশক্তি তখন ধ্বংসোন্মুখ। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সামন্তগণ আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কেহ কেহ বা বিশেষ শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঢেকুরের ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই ঘোষ।

ধ্বংসোন্মুখ
পালশক্তি

ঢেকুর ও
ইছাই ঘোষ

বর্ধমান জিলার যে অংশে গোপভূম পরগনা অবস্থিত, তথাকার সদ্‌গোপগণ তৎকালে এক পরাক্রান্তশালী সম্প্রদায় ছিলেন। ইছাই ঘোষ ছিলেন সদ্‌গোপবংশীয় ও সদ্‌গোপদের একজন অধিনায়ক। সামান্য সামন্ত পদ হইতে নিজ প্রতিভা ও বাহুবলে

তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও ক্রমে ক্রমে সমগ্র গোপভূম অধিকার করিয়া নিজেকে "মহা মাণ্ডলিক" বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ঢেকুর, বর্তমান শ্যামারূপার গড়। কাঁকসা থানার অন্তর্গত অজয় তীরে অরণ্যাবৃত এই শ্যামারূপার গড় এখনও ইছাই ঘোষের দুর্গ ও রাজধানীর সাক্ষ্য স্বরূপ বর্তমান। অরণ্যের মধ্যে টিলার উপর একটি পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে ইছাই প্রতিষ্ঠিত দেবী শ্যামারূপার মন্দির বলিয়া পরিচয় দেয়। শ্যামারূপার গড়ের প্রায় দুই মাইল পূর্বে গৌরাঙ্গপুরে একটি পুরাতন কিন্তু মনোহর রেখ দেউল এখনও ইছাই ঘোষের স্মৃতি বহন করে। ইং ১৮৬৪ সালের সার্ভে নকসায় এই দেউলকে "ইছাই ঘোষের দেউল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইছাই ঘোষ ছিলেন শাক্ত—ভবানীর উপাসক।

ধর্মমঙ্গল ও ইছাই ঘোষ

ইছাই ঘোষের কাহিনী পরবর্তী যুগে আখ্যানের ভিতর চলিয়া গিয়াছে ও ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এইরূপ। ইছাই ঘোষের পিতা ছিলেন গৌড়ের পালরাজগণের অধীনস্থ কর্মচারী। গৌড়রাজ তাঁহাকে অজয় নদ তীরে ঢেকুরে ভূসম্পত্তি দান করেন ও তিনি তথায় বসতি স্থাপন করেন। তখন গৌড়রাজের নিকট-আত্মীয় কর্ণসেন ঢেকুরে পালরাজের একজন অধীনস্থ সামন্ত। শক্তি উপাসক ইছাই কর্ণসেনের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন ও ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিয়া কর্ণসেনকে ঢেকুর হইতে বিতাড়িত করেন ও নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কর্ণসেন গৌড়ে পলায়ন করিয়া গৌড়রাজের আশ্রয়প্রার্থী হন ও পরে তাঁহার অনুগ্রহে ময়নাগড়ের অধিপতি হন। কর্ণসেনের এক পুত্র হয়, নাম লাউসেন। তিনি ছিলেন ধর্মঠাকুরের বরপুত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া লাউসেন গৌড়েশ্বরের আদেশে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ঢেকুর অধিকার করেন।

পালরাজ রাম পাল ও ঢেকুর

এই কাহিনী হইতে মনে হয় ইছাই ঘোষ পালরাজ মহিপালের সম-সাময়িক। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত মহিপালের অধস্তন নৃপতি রাম পালের (১০৭৭—১১২০ খৃষ্টাব্দে) প্রশস্তি রামচরিতে বর্ণিত আছে যে রামপাল যখন কৈবর্তগণের হাত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী

অধিকারের জন্য অগ্রসর হন, তখন যে সকল সামন্ত রাজ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঢেক্করির প্রতাপ। ঐতিহাসিকগণের মতে এই ঢেক্করি হইতেছে ঢেকুর। মনে হয় ঢেকুরের গৌরব তখনও ম্লান হয় নাই।

অমরার গড়ের সদ্গোপ রাজগণ

ইতিমধ্যে অমরার গড়ের সদ্গোপ রাজগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এই রাজবংশ এক সময় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠেন যে কাটোয়া হইতে পঞ্চকোট রাজ্যের সীমা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম বর্ধমান তাহাদের অধিকারে আসে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভল্লপাদ (আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)। তিনি যেখানে রাজধানী স্থাপন করেন, তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হয় ভাল্‌কি। ভল্লপাদের পুত্র ছিলেন গোপাল; গোপালের পৌত্র বিখ্যাত মহীন্দ্র বা মহিন্দির রাজা। রাজা মহীন্দ্র একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যসীমা বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। কথিত আছে যে তিনি লাউসেনের সহায়তায় ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে পরাজিত করিয়া ঢেকুর অধিকার করেন। মহীন্দ্র ভাল্‌কি হইতে অমরার গড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন ও ইহাকে বিশেষ সুরক্ষিত করেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশের রাজধানী হয় দিগ্‌নগর, অপর অংশের রাজধানী রহিল অমরার গড়। মহীন্দ্রের পরবর্তী রাজগণের সময় রাজ্য সীমা আরও বিস্তৃত হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভাগও হয়। রাজ বংশের এক শাখা কাঁকসায় রাজধানী স্থাপন করেন। অপর একটি শাখা বা অধীনস্থ সামন্ত দ্বারা শাসিত হইত মঙ্গলকোট। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সদ্গোপ রাজ্য আক্রান্ত হয়। প্রথম বিজিত হয় মঙ্গলকোট। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ বোখারি কাঁকসা জয় করেন। অন্যান্য রাজবংশও মুসলমান অধিকারে আসে। কিন্তু অমরার গড়ের উপর পর পর মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং এখানে সদ্গোপ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অমরার গড়ের রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেন।

ভল্লপাদ

মহিন্দির রাজা

পরবর্তী রাজগণ

সদ্গোপ রাজগণ ছিলেন শৈব ও শাক্ত। অমরার গড়ের প্রসিদ্ধ

শিবাক্ষা মন্দির রাজা মহীন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয় বলিয়া বিশ্বাস। কাঁকসার কঙ্কেশ্বর শিব-মন্দির সদ্‌গোপ রাজগণেরই কীর্তি। আয়রার বিখ্যাত রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরও তাঁহাদের কীর্তি বলিয়া অনেকের অনুমান।

সেন বংশের কাহিনী

পাল শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে সামন্তরাজ একটি সার্ব-ভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তিনি বিজয় সেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সেন রাজবংশের পিতৃভূমি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট। পাল রাজগণের প্রশস্তিতে খস-মালব-হূন-কুনিক-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় জাতির রাজ-সৈন্য দলভুক্ত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে সেন রাজগণের পূর্বপুরুষ এইরূপ একটি ভাগ্যান্বেষী সৈন্য-বাহিনীর নেতা হিসাবে এদেশে প্রথমে আগমন করেন। যাহা হউক তাঁহারা যে প্রথমে পালরাজগণের অধীন সামন্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নেই। মল্ল সারুল লিপি ও রাজা বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপি হইতে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে বল্লাল সেনের পূর্বেই সেন রাজগণ বহুপুরুষ যাবৎ রাঢ় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেন

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই বংশের সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেন একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হেমন্ত সেনের পুত্র

বিজয় সেন

বিজয় সেন রাজ্য সুসংবদ্ধ করেন ও দক্ষিণ রাঢ়ের অপর-মন্দারের শূর বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আরও শক্তিশালী হইয়া উঠেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল রাজ রাম পালের মৃত্যুর পর পাল শক্তি ক্ষীণ হয়। বিজয় সেন এই সুযোগ অবহেলা করেন নাই। তিনি গৌড় আক্রমণ করেন ও পাল বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয় সেন মাত্র পাল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া তিনি উত্তর বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিজয় সেনের পুত্র

বল্লাল সেন

ছিলেন বল্লাল সেন (১১৫৮—১১৭৯ খৃষ্টাব্দ)। রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কার ও কৃষ্টির পুনরুজ্জীবনের কার্যে তিনি অধিকতর মনোযোগী হন। বাংলার হিন্দু উচ্চ বর্ণের মধ্যে যে সমাজ

বিন্যাস ও কৌলিন্য প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা তিনিই প্রবর্তন করেন। বিদ্যার উপরেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তাঁহার রচিত "দান সাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" নামক দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থই ইহার প্রমাণ। বল্লালসেন ছিলেন শৈব, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পোষক হন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন। যৌবনে তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা। মিথিলা ও গয়া জয় করিয়া তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার নিজ রাজ্যভুক্ত করেন ও পরে গাড়ওয়াল রাজশক্তির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া কাশী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। পিতার ন্যায় তিনিও পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গীত-গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, পবনদূত প্রণেতা ধোয়ী, পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র, উমাপতি ধর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি হইলেন পরম ভাগবত বৈষ্ণব। জীবনের সায়াহ্নে রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব অবিশ্বাসী, অবিবেচক ও আরামপ্রিয় অমাত্যদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করিতেছিলেন, সেই সময় পাঠান সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খিল্‌জি অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পশ্চিমবঙ্গে সেন বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিল। "বঙ্গে তুরুক আসিল।"

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠান মোগল

মুসলমান কর্তৃক সহজ লব্ধ নবদ্বীপ জয়ের কারণ

বিহার হইতে নবদ্বীপ অভিযানের পথে বখতিয়ার খল্জি বর্তমান বর্ধমান জিলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। যে পথ দিয়া তিনি প্রথম এই জিলায় প্রবেশ করেন তাহা বীরভূম জিলার মধ্য দিয়া আসিয়া মঙ্গলকোট প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ হইল মধ্যযুগের মুঙ্গের-রাজমহল-বীরভূম-বর্ধমান-মেদিনীপুর রাজপথ। ১৮ জন আউলিয়া সহিত বখতিয়ার যখন মঙ্গলকোটে প্রবেশ করেন, তখন বিক্রমজিৎ মঙ্গল কোটের সামন্ত নৃপতি। পাঠান সেনাপতি তাঁহার নিকট হইতে কোন বাধা পান নাই। মঙ্গলকোটের পর বখতিয়ার কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হন ও তথা হইতে গঙ্গাপ্রবাহ অনুসরণ করিয়া নবদ্বীপ আগমন করেন। তখনও কোন বাধা পান নাই; এমন কি রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথেও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে ইহার একটি কারণ বিকেন্দ্রীয় সামন্ততন্ত্র। এই বিকেন্দ্রীয় সামন্ততন্ত্র ইতিপূর্বেই সেন রাজ্যকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। তারপর লক্ষ্মণ সেনের কাশী জয় ও গাড়োয়াল রাজশক্তির ধ্বংস সাধন সেন রাজ্য ও উদীয়মান মুসলমান শক্তির মধ্যস্থলের বাধা অপসারিত করিয়াছিল। পাল রাজগণের সময় হইতেই খস-মালব-হুণ-কুনিক-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি বহু ভাগ্যান্বেষী বৈদেশিক রাজ সরকারে ও রাজ-সৈন্য বাহিনীতে স্থান লাভ করে। সেইরূপ রাজসৈন্য-বাহিনীতে যে মুসলমান ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। সুতরাং পাঠান সেনাপতির নবদ্বীপ যাত্রার পথে কাহারও সন্দেহ না হওয়াই স্বাভাবিক। তৎকালীন নৈতিক অবনতি ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও পাঠান সেনাপতির পক্ষে কোনওরূপ বাধায় সম্মুখীন না হইবার অন্য একটি মুখ্য কারণ। বিকৃত তন্ত্র-ধর্মের প্রভাব প্রায় সর্বশ্রেণীকে ও সমাজ জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত ও নীতিভ্রষ্ট

করিয়াছিল (১)। লক্ষ্মণ সেনের রাজ সভার কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনায় ইহা প্রকাশ পায়। তারপর ছিল দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনী। রাজ সভায় বহু পণ্ডিতের মুসলমান প্রীতি ছিল। উমাপতি ধর তাঁহার রচনায় মুসলমান ধর্মের প্রশংসা করিয়াছেন; পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র মুসলমান সাধু জালাল উদ্দিন তাব্রেজিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং অনেকের বিশ্বাস যে "শেখ শুভোদয়া" নামক প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি তাঁহারই রচিত। এই পুঁথিতে জালাল উদ্দিন তাব্রেজি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তিব্বতের লামা তারানাথ বলেন যে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বখতিয়ার খিলজির গুপ্তচরের কার্যে নিযুক্ত ছিল।

মুসলমান অভিযানের অগ্রগতি মঙ্গলকোট

নবদ্বীপ জয় করার অব্যবহিত পরই যে মুসলমান শক্তি সমগ্র জিলায় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কারণ নাই। মঙ্গলকোটে গৌড়ের সুলতান হুশেন শাহের (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) আমলের এক মসজিদে রাজা চন্দ্রসেনের উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রসেন সম্ভবতঃ গোপভূমের একজন সামন্ত ছিলেন। গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজগণ বহুকাল যাবৎ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটসহ বর্ধমানের পূর্বাংশ পাঠান অধিকারে আসিবার পরও অমরার গড়ের স্বাধীন সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অমরার গড় কাঁকসা

সদগোপরাজগণের অপর কেন্দ্র কাঁকসা কিন্তু বেশীদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কাঁকসা বিজিত হয়। ক্রমে ক্রমে বর্ধমানের অবশিষ্ট অংশও মুসলমান অধিকারে আসে, বাকী রহিল পশ্চিম ভাগ ও দক্ষিণ অঞ্চল।

পশ্চিম বর্ধমান

পশ্চিমাঞ্চল নৈসর্গিক কারণে দুর্ভেদ্য ছিল। ইহার উপর আবার শক্তিশালী পঞ্চকোট রাজ ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ ইহার অংশ বিশেষের উপর আধিপত্য করিতেন। এই অঞ্চল সহজে বিজিত হয় নাই। সের শাহের সময় মুসলমান সৈন্য প্রথমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। মনে হয় প্রথমে চুরুলিয়া আক্রান্ত হয়।

চুরুলিয়া

কিংবদন্তী অনুসারে চুরুলিয়ার রাজা ছিলেন নরোত্তম; চুরুলিয়ায় প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা এখনও

(১) এই সম্বন্ধে তৃতীয় পর্ব প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

"রাজা নরোত্তমের গড়" নামে পরিচিত। তারপর মুসলমান অভিযানের অগ্রগতি হয় উখরার দিকে। সের শাহের সময় উখরার নিকট একটি দুর্গ নির্মিত হয়, তাহার নামকরণ হয় সের গড়। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকগণ যখন পরগণা প্রথার প্রবর্তন করেন তখন এই অঞ্চলের নামকরণ হয় পরগণা সের গড়। কিন্তু মুসলমান অধিকার এই দিকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং আসানসোল মহকুমার পশ্চিম ভাগ বহুকাল যাবৎ বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের অধীন থাকে। দামোদরের দক্ষিণ অংশও সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দামোদরের উত্তর ভাগ মুসলমান অধিকারে আসিবার পরও উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণ এই অঞ্চল তাঁহাদের অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুশেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে (১৪৯৩-১৫২০ খৃষ্টাব্দ) তখন এই অঞ্চল সাময়িক ভাবে তাঁহার অধিকারে আসে কিন্তু তাহার পরই উড়িষ্যারাজ হরিচন্দন মুকুন্দ দেব মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দক্ষিণ দামোদর পুনরায় অধিকার করেন। পরে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররাণি এই ভূ-ভাগ জয় করিয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন।

সের গড়

দক্ষিণদামোদর

পাঠান বিজয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় হইল "আয়মা"র সৃষ্টি। পাঠান সুলতানগণ সুদক্ষ মুসলমান সেনানী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদিগকে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া তাহাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রথাই "আয়মা" নামে পরিচিত। আয়মার উপভোগকারিগণ পরিচিত হইলেন "আয়মাদার" নামে। বর্ধমানে এই আয়মা ও আয়মাদারের সংখ্যা বহু। মঙ্গলকোট, কুসুমগ্রাম, বোহার, চৌঘরিয়া, চুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে এই আয়মাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান প্রাধান্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

পাঠান বিজয় ও আয়মা

সুলেমান কররাণি যখন উড়িষ্যায় অভিযান করেন, তখন উত্তর ভারতে মোগল শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সুলেমান যতদিন জীবিত ছিলেন, মোগল সৈন্য বঙ্গদেশে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যু হয়। তাহার পরই তোডরমলের অধিনায়কত্বে বঙ্গদেশে মোগল অভিযান আরম্ভ হয়। সুলেমানের পুত্র দাউদ পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বর্ধমান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ

পাঠান মোগল সজ্ঘর্ষ

তোডরমল ও

মোগলের বর্ধমান জয়

করেন। মোগল সৈন্য তাঁহাকে তথায় অনুসরণ করিলে দাউদ দামোদর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। মোগল সৈন্য মেদিনীপুর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে দাউদ বাধ্য হইয়া মোগলের সহিত সন্ধি করেন ও ইহার ফলে দক্ষিণ দামোদরসহ সমগ্র বর্ধমান মোগলের অধিকারে আসে। ইহার পরই দাউদ বিদ্রোহ করেন ও সৈন্য বাহিনী লইয়া রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দাউদের পরিবারবর্গ বর্ধমান শহরে মোগল বাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়।

বর্তমান বর্ধমান শহরের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দাউদের সহিত মোগলের সঙ্ঘর্ষের সময় পাওয়া যায়।

কতলু খাঁ

দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুর পরই কিন্তু মোগল পাঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয় নাই। মোগলের সহিত বহু খণ্ডযুদ্ধ সত্ত্বেও দামোদরের দক্ষিণাঞ্চলে দাউদের পুত্র কতলু খাঁয়ের অধিকার রহিয়া গেল। অবশেষে রাজা মানসিংহের অধীনে মোগল সৈন্য এই অঞ্চলে অভিযান করিয়া কতলু খাঁকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। কতলু খাঁ উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন ও দামোদরের দক্ষিণাঞ্চল চূড়ান্ত ভাবে মোগলের অধিকারে আসে।

পাঠান শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়

মোগল বিজয়ের স্বরূপ

মোগল শক্তির বঙ্গ বিজয় ও অধিকার সামরিক দখলের পর্যায় বলিয়া অনেকে মন্তব্য করেন। শাসনভার ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর—সুবেদার ও তাহার অধীনস্থ ফৌজদার। সুবেদারগণ চাহিতেন দিল্লীর প্রভুত্ব হইতে স্বাধীন থাকিতে, আর ফৌজদারগণ চাহিতেন সুবেদারের বশ্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে। মোগল শাসনের রূপ যাহাই থাকুক না কেন এ কথা স্বীকার্য যে বাদশাহ আকবরের সময় দেশের রাজস্ব শাসন সম্বন্ধে যে পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়, তাহা ছিল সুদূর ব্যাপী। পরবর্তী যুগের ইংরেজ শাসকগন ইহার অনুসরণ করিয়া রাজস্ব নীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। আকবরের সময় যে সকল উল্লেখযোগ্য রাজস্ব-নীতির প্রবর্তন হয় তাহা আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

তোডরমলের ভূমি-রাজস্ব সংস্কার

মোগল সেনাপতি তোডরমল ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সুবে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং উপরোক্ত প্রবর্তন কার্যকরী করার কৃতিত্ব

তাঁহার। দেশের যাবতীয় ভূমি একই পদ্ধতিতে পরিমাপ করিয়া বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ স্থির করা হয়। উৎপাদনের তারতম্য অনুসারে কৃষি জমিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। সর্বোৎকৃষ্ট জমি প্রথম শ্রেণী, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জমি দ্বিতীয় শ্রেণী ও সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমি তৃতীয় শ্রেণী। এই তিন শ্রেণীর জমির গড় উৎপাদন নির্ধারণ করা হয় এবং সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সাব্যস্ত হয় এক-তৃতীয়াংশ। বাংলাদেশ তখন মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশ। রাজস্ব শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র সুবে বাংলাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করা হয়। আবার প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি মহল বা পরগণায় ভাগ করা হয়। তোডরমলের এই বিভাগ পরবর্তী কালের বিশাল জমিদারির আবির্ভাব ও মুরশিদ্ কুলি খাঁ প্রবর্তিত চাকলা সৃষ্টি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু বর্ধমান মুখ্যতঃ তিনটি আদিম সরকারের অন্তর্ভূর্ত রহিয়া গিয়াছে—সরকার সরিফাবাদ, সেলিমাবাদ বা সুলেমানাবাদ ও মান্দারণ। জিলার পশ্চিম ভাগ সরকার মান্দারণের অন্তর্গত; হুগলি জিলার সংলগ্ন পূর্ব-দক্ষিণ ভাগ সরকার সেলিমাবাদ-ভুক্ত, অবশিষ্ট ভাগ অর্থাৎ জিলার প্রায় অধিকাংশ সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত।

রাজস্বের ভিত্তি নির্ধারণ

সরকার পরগণা বা মহল

আইন-ই-আকবরিতে মহল বর্ধমানের উল্লেখ দেখা যায়। তখনকার আয়তন অনুযায়ী ইহার রাজস্ব নিরূপণ হয় ১৮,৭৬,১৪২ দাম বা ৪৬,৯০৩ আকবরশাহী মুদ্রা। পরে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বা নবাব জাফর আলি খাঁ হস্তবুদ পরিবর্তন করেন। তাঁহার হস্তবুদে বর্ধমানকে চাক্‌লা বলিয়া গণ্য করা হয়। সরকার সরিফাবাদ, সেলিমাবাদ ও মান্দারণের এক বিশাল অংশ ছাড়াও, সরকার সাতগাঁওয়ের কিছু অংশ লইয়া গঠিত হয় চাক্‌লা বর্ধমান। এক সময় চাক্‌লা বর্ধমান বলিতে বুঝাইত পরবর্তী কালের মহারাজা বর্ধমানের বিস্তৃত জমিদারি, বর্তমান বীরভূম জিলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, বাঁকুড়া জিলার সমগ্র বিষ্ণুপুর পরগণা ও পঞ্চকোট। মোট ৬১টি পরগণা ছিল ইহার মধ্যে; নিরূপিত রাজস্ব ছিল ২২,৪৪,৮১২ সিক্কা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই চাক্‌লা বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামসহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হয়। তখন ইহার মোট মালগুজারি বা আদায়ী রাজস্ব

মহল বর্ধমান

চাক্‌লা বর্ধমান

স্থির হয় ৩১,৭৫,৪০৬ সিক্কা, তাহার মধ্যে ভূমি-রাজস্ব বাবদ ছিল ২২৫১৩০৬ সিক্কা, অবশিষ্ট ছিল নানাবিধ আবওয়াব বাবদ।

মেহের-উন্নিসার কাহিনী

বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে এক বিশিষ্ট কারণে বর্ধমান দিল্লী-দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা হইতেছে সের আফগানের বর্ধমান আগমন ও পরবর্তী ঘটনাবলী। সের আফগান দরবারের একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও শৌর্যশালী এবং বহু যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কথিত আছে যে তিনি এইরূপ বলিষ্ঠ ছিলেন যে একাই একটি হিংস্র বাঘের সহিত লড়াই করিয়া তাহাকে সংহার করেন, আর ইহার পর হইতেই তাঁহার পরিচয় হয় "সের আফগান" নামে। বাদশাহ্ আকবরের ব্যবস্থায় তাঁহার বিবাহ হয় অসামান্যা রূপসী মেহের-উন্নিসার সহিত কিন্তু তাহার পূর্বেই মেহের-উন্নিসার অনবদ্য রূপ ও গুণের জন্য যুবরাজ সেলিম তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। সেলিম মেহের-উন্নিসাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাদশাহ আকবর তাহাতে অসম্মত হন কারণ মেহের-উন্নিসার পিতা ছিলেন দরবারের সামান্য কর্মচারী। ইহার পরই আকবর সের আফগানের সহিত তাহার বিবাহ দেন ও উভয়কেই বর্ধমান পাঠান।

সের আফগান ও যুবরাজ সেলিম

জাহাঙ্গীর ও সের আফগান

সেলিম কিন্তু মেহের-উন্নিসাকে বিস্মৃত হন নাই। আকবরের মৃত্যুর পর তিনি "জাহাঙ্গীর" নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মেহের উন্নিসাকে লাভ করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। কিন্তু বুঝিতে পারেন যে সের আফগান জীবিত থাকা পর্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। সুতরাং সের আফগানকে ইহলোক হইতে অপসারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাজকার্যের অজুহাতে তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। বাহ্যতঃ সের আফগানকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্ভ্রম দেখান হয় কিন্তু গোপনে তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। হত্যা করিবার চেষ্টা দুই দুইবার ব্যর্থ হইল, সের আফগান ব্যাপার বুঝিয়া বর্ধমান ফিরিয়া আসিলেন। তখন বাংলার সুবেদার বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুতুবুদ্দিন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, যে কোনও উপায়ে সের আফগানকে

হত্যা করিতে হইবে। কুতুবুদ্দিন এই কথা গোপন রাখেন নাই ও এই উদ্দেশ্যে বর্ধমান আসেন। তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া সের আফগান মাত্র দুইজন অনুচরসহ বর্ধমানের উপকণ্ঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় কুতুবুদ্দিনের জনৈক পার্শ্বচর সের আফগানের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করে আর ইহার ফলে যে সঙ্ঘর্ষ হয় তাহাতে কুতুবুদ্দিন ও সের আফগান উভয়েই প্রাণ হারান। তাঁহাদের দুইজনকেই পাশাপাশি সমাধিস্থ করা হয়, এই সমাধি এখনও বর্তমান।

সের আফগানের মৃত্যু

ইহার পর বর্ধমানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যুবরাজ খুড়ম কর্তৃক বর্ধমান অধিকার। যুবরাজ খুড়ম ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে পিতা বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও প্রথমে মধ্যপ্রদেশ ও পরে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া বর্ধমান প্রবেশ করেন।

যুবরাজ খুড়মের বর্ধমান অধিকার

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্ধমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ইহার পর বর্ধমানের ইতিহাস মুখ্যতঃ এই রাজবংশেরই ইতিহাস। এই রাজবংশের জনৈক পূর্ব পুরুষ সঙ্গম রায় ব্যবসায় সূত্রে সুদূর লাহোর হইতে বর্ধমান আগমন করেন। সঙ্গম রায়ের পৌত্র আবু রায় বিশেষ কোনও সঙ্কটপূর্ণ সময় বর্ধমানের ফৌজদারকে রসদ সরবরাহে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় পুরস্কার-স্বরূপ বর্ধমান রেকাবি বাজারের চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় পরগণা বর্ধমানের জমিদারি অর্জন করেন। বাবু রায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম এই জমিদারি প্রসারিত করেন ও সেন পাহাড়ী পরগণা নিজ জমিদারিভুক্ত করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের এক ফরমানে কৃষ্ণরাম রায় পরগণা বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরী পরিচয়ে সম্মানিত হন। কৃষ্ণরাম বর্ধমান শহরে একটি বিশাল দীর্ঘিকা খনন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহা আজও কৃষ্ণ সাগর নামে পরিচিত।

বর্ধমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

সঙ্গম রায়

আবু রায়

বাবু রায়

কৃষ্ণরাম রায়

কৃষ্ণ সাগর

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ রহিম খাঁ নামক একজন আফগান সরদারের সহায়তায় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী বর্ধমান আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণরাম রায়কে পরাজিত ও নিহত করে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগতরাম

শোভা সিংহের বিদ্রোহ

ঢাকায় পলায়ন করিয়া নবাবের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাজ-পরিবারের অন্যান্য সকলেই বন্দী হইলেন। বিদ্রোহিগণ দলপুষ্ট হইয়া হুগলি পর্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ অধিকার করে। বর্ধমান রাজপরিবারের যাঁহারা বন্দী হন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রাজকুমারী সত্যবতী। সত্যবতীকে বহুদিন বন্দিনী রাখার পর শোভা সিংহ তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে সত্যবতী নিজের পরিধেয় বসনের ভিতর লুক্কায়িত ছুরিকাদ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন ও নিজেও আত্মঘাতিনী হন। শোভাসিংহ নিহত হইলে বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁকে অধিনায়ক নির্বাচিত করে। বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করে যে বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব তাঁহার পৌত্র আজিম-উ-সানকে সুবেদার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে ঢাকার নবাবপুত্র জবদ্দস্ত খাঁ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন ও পর পর কয়েকটি যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে পরাস্ত করিয়া বর্ধমানের উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিতাড়িত করেন। পরে বর্ধমানের নিকটে আজিম-উ-সান বিদ্রোহী বাহিনীকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেন। আজিম-উ-সান প্রায় তিন বৎসর বর্ধমানে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সময় বর্ধমানের বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়।

রাজকুমারী সত্যবতী

শোভা সিংহের মৃত্যু

বিদ্রোহ দমন

আজিম-উ-সান

জগতরাম জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি করেন ও বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব ফরমান জাহীর করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে জগতরাম আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান। তাঁহার মৃত্যুতে পুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন। কীর্তিচন্দ্রের সময় রাজবংশের প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। চেতুয়া, ভুরশুট, বরদা ও মনোহরশাহী পরগণা বর্ধমান জমিদারির অন্তর্গত হয়। চন্দ্রকোনা ও বলঘরার রাজাকে পরাজিত করিয়া কীর্তিচন্দ্র তাহাদের জমিদারির অংশ স্বীয় অধিকারে আনেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র রায় পরলোক গমন করেন ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র চিত্রসেন। চিত্রসেনের সময় মণ্ডলঘাট, আরসা, ও চন্দ্রকোনা পরগণা বর্ধমানের অধিকারে আসে। বীরভূম, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের রাজগণের সহিত যুদ্ধে চিত্রসেন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও তাঁহাদের রাজ্যের অংশবিশেষ জয় করেন। চিত্রসেন

জগতরাম রায়

কীর্তিচন্দ্র রায়

চিত্রসেন রায়

রাজগড়ে এক দুর্গ নির্মাণ করেন। বীরভূমের প্রান্তে অজয়তীরে তিনি আর একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার নামকরণ করেন সেন পাহাড়ি। দিল্লীর বাদশাহের ফরমানে চিত্রসেন "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন।

"রাজা" চিত্র সেন

ইতোমধ্যে পশ্চিম দিগ্‌বালে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হইতেছিল। এই ঘূর্ণবাত ক্রমে ক্রমে পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া পশ্চিম বাংলায় যে দুর্গতি সাধন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাহা পরবর্তী কালে "বরগির হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। এই হাঙ্গামা জনসাধারণকে এইরূপ সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়াছিল যে বহুকাল যাবৎ ইহার কাহিনী এক বিরাট দুঃস্বপ্নের ন্যায় তাহাদের স্মৃতিতে জাগিয়া ছিল। এখনও শিশু-ভুলান ছড়ায় সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বর্তমান রহিয়া গিয়াছে—

বরগির হাঙ্গামা

"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বরগি এল দেশে।"

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মারাঠা অধিনায়ক রঘুজি ভোঁসলের অধীন চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য উড়িষ্যা ও বাংলার পশ্চিম প্রান্ত বিপর্যস্ত করে। এই মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল "বরগি" নামে। পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বারংবার মারাঠা আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়; ইহার পর আক্রান্ত হয় মেদিনীপুর ও বর্ধমান। ক্রমে এই আক্রমণ বিস্তৃত হয় বর্ধমানের অন্তস্তল পর্যন্ত। কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় ভূভাগে অবাধ লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চলে। তখন আলিবরদি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি প্রথমে মেদিনীপুরে মারাঠা আক্রমণ রোধ করিবার প্রয়াসী হন, কিন্তু মারাঠা আক্রমণের চাপে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন ও বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারাঠা বাহিনীর অস্থির ও অতর্কিত আক্রমণ এবং যন্ত্রণাদায়ক রণ-কৌশলের সমক্ষে বর্ধমান শিবির নিরাপদ না হওয়ায় নবাব কাটোয়া দুর্গাভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। এই সময় নবাবী ফৌজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ও ইহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। অবশেষে অতি কষ্টে নবাব অবশিষ্ট সৈন্যসহ কাটোয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ইহার ফলে মারাঠা সৈন্যের বিশেষ সুবিধা হয়; তাহারা ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠন ও উৎপীড়নে ব্যাপৃত হয়। সম-সাময়িক

রঘুজি ভোঁসলে ও আলিবরদি খাঁ

একজন মুসলমান ঐতিহাসিক (Riyazu-s-salatin) এই অত্যাচার সম্বন্ধে বলেন :

বরগির অত্যাচারের বিবরণ

"তাহারা (বরগিগণ) চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন, ব্যাপক নরহত্যা ও অপহরণ কার্যে ব্যাপৃত হইল। ধানের গোলায় অগ্নিসংযোগ করিল; উর্বরতার কোনই নিদর্শন জমিতে রাখিল না। বর্ধমানের শস্যভাণ্ডার যখন ধ্বংস হইল ও বাহির হইতে খাদ্যশস্য আসিবার পথও রুদ্ধ হইল, তখন দেশের লোক অনাহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গাছের মূল ও পাতা খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এগুলিও ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইল। রাতে কিংবা দিনে জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্তির কিছুই মিলিল না, মাত্র চক্ষুর ক্ষুধা মিটাইত আকাশের সূর্য-গোলক ও চন্দ্রমা। রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত যাবতীয় প্রদেশ মারাঠাদের অধিকারে আসিল। এই নরঘাতক দস্যুগণ অসংখ্য লোকের কর্ণ, নাসিকা ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহাদিগকে নদীর জলে নিমজ্জিত করিয়া মারিল আবার কাহাকেও বা গলায় ময়লা ভর্তি বস্তা বাঁধিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিল বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া মারিল।"

ভাস্কর পণ্ডিত

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবরদি খাঁ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে কাটোয়ার নিকট পরাজিত করেন ও কিছুসময়ের জন্য মারাঠা-গণকে পশ্চিম বাংলা হইতে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হন। মারাঠা সৈন্য পঞ্চকোটের দিকে পলায়ন করে। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন ছিল মাত্র সাময়িক, কারণ কিছুকাল পরই তাহারা চন্দ্রকোনার ভিতর দিয়া মেদিনীপুরের সমতল ভূমিতে আবির্ভূত হয়। তারপর মারাঠা অভিযান কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্নরূপে অব্যাহত থাকে। একদিকে প্রতিহত হইয়া মারাঠাগণ অন্যদিকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাইতে থাকিল। অবশেষে ক্লান্ত নবাব বাধ্য হইয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির চুক্তি অনুসারে নবাব কটকের উপর প্রভুত্ব ত্যাগ করেন ও বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন।

মারাঠার সহিত সন্ধি

বরগির হাঙ্গামায় ক্ষতির পরিচয়

মারাঠা আক্রমণে বা বরগির হাঙ্গামায় বর্ধমানের প্রভূত ক্ষতি হয়। বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও জনপদ বিনষ্ট হয়; কৃষি বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয় ও সমাজ-জীবন ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহু নরনারী নিরাপদ আশ্রয় লাভের

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ

আশায় দেশত্যাগ করে। তখন ইংরেজ কোম্পানি কলিকাতা সুরক্ষিত করিতেছিলেন, অনেকে সেখানে আশ্রয় লয়। তৎকালীন রচিত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণের বর্ণনায় :—

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হুড়পি লইয়া।
গন্ধ বণিক্ পলায় দোকান লইয়া জত
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলায় কত।
শঙ্খ-বণিক্ পলায় করাত লইয়া জত
চতুর্দিকে লোক পলায় কি বলিব কত।"

তিলকচাঁদ রায়

ইতোমধ্যে রাজা চিত্রসেন রায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচাঁদ রায়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ আহমদ্ শাহ্ রাজা তিলকচাঁদ রায়ের বর্ধমান গদি প্রাপ্তির স্বীকৃতি দান করিয়া ফরমান জাহীর করেন। ইহার পরই বাদশাহ্ সাহ্-আলম তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও পঞ্চহাজারি খেতাব দান করেন। কিন্তু বর্ধমানের তখন অত্যন্ত দুঃসময়। মারাঠা হাঙ্গামায় যে অপরিমেয় ক্ষতি হয় তাহার ফলে রাজস্ব আদায় অসম্ভব হইয়া পড়ে, রাজকোষও হয় কপর্দকহীন। অনাদায়ী করের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতাস্থ বর্ধমান রাজের সম্পত্তি ক্রোক করেন। ইহার প্রতিশোধ হিসাবে মহারাজা বর্ধমানে কোম্পানির যত কুঠি ছিল তাহার সবই আটক করেন। এই বিবাদের অবশ্য পরে মীমাংসা হয়। কিন্তু বর্ধমানের জন্য আরও জটিল ও সঙ্কটের দিন অপেক্ষা করিতেছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ নবাব আলিবরদি খাঁ পরলোক গমন করেন। তাহার দুই বৎসরের মধ্যেই পলাশীর রণক্ষেত্রে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার ভাগ্য-বিপর্যয় হয়। মীরজাফর নবাব হইলেন বটে কিন্তু কার্যতঃ প্রভু হইলেন কোম্পানি। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সমৃদ্ধিশালী বর্ধমান কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হয়। তখন বর্ধমানের আয়তন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল অর্থাৎ

পলাশী

বর্তমান আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ ও বর্ধমান সুবে বাংলায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জমিদারি বলিয়া পরিগণিত। তারপর—

"বণিকের মানদণ্ড
দেখা দিল পোহালে শর্বরী—
রাজদণ্ডরূপে।"

চতুর্থ অধ্যায়

কোম্পানির আমল ও ইংরেজ শাসন

"পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের কবি নবীনচন্দ্র ক্ষেদ করিয়া বলিয়াছেন—

"কোথায় ভারতবর্ষ কোথায় বৃটন
দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতরাজি দুস্তর সাগর ;
ইংলণ্ডের চন্দ্র-সূর্য দেখে না ভারত,
ভারতের চন্দ্র-সূর্য দেখে না বৃটন !"

পলাশীর পর যে যুগের প্রবর্তন হয়, সমগ্র দেশের পক্ষে তাহা এক কলঙ্কময় যুগ।

মীরজাফর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

মীরজাফরের সহিত কোম্পানির যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়, তদনুসারে কলিকাতা অঞ্চলে কোম্পানির বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি অর্জনের দাবী স্বীকৃত হয়। অধিকন্তু তৎপূর্বে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অবরোধের সময় কোম্পানির যে ক্ষতি সাধন হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা নবাবের নিকট কোম্পানির প্রাপ্য বলিয়াও স্বীকৃত হয়। ইহা ভিন্ন ইংরেজ স্থল ও নৌ-বাহিনীর রক্ষণা-বেক্ষণ বাবদ ছয় লক্ষ পাউণ্ড ও বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীর প্রাপ্য বাবদ ৫৮,৯০,০০০ টাকা কোম্পানিকে দিবার প্রতিশ্রুতিও আদায় করা হয়। রাজত্বের প্রথম ভাগে নবাব যাবতীয় দাবী ও প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ পালন করেন কিন্তু তাঁহার নিজের আর্থিক দৈন্য উপস্থিত হয়। বাধ্য হইয়া নবাব মূল্যবান অলঙ্কার-সমূহ কোম্পানির নিকট গচ্ছিত রাখেন। তাহাতেও যখন প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ হইল না, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্বের অংশ তন্‌খা হিসাবে কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হয়।

বর্ধমানের মহারাজা ও কোম্পানি

মহারাজা তিলকচাঁদ কিন্তু এই বিধান সহজে স্বীকার করেন নাই। দেশের অবস্থা তখনও স্বাভাবিক হয় নাই। মারাঠা অত্যাচারে বহু জনপদ ইতিপূর্বে বিনষ্ট হইয়াছে ; কৃষি, বাণিজ্য, কর-আদায়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই। ইহার উপর আসিল কোম্পানির কর্মচারিগণের প্রভুত্ব। ফলে মনোমালিন্য ও বিবাদ

অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। মহারাজা কোম্পানির কর্মচারিগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার বা তাঁহার আভ্যন্তরীণ কার্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করিবার দাবী মানিয়া লইলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন ও মহারাজার "ধৃষ্টতা" সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ আনয়ন করিলেন। রাজস্ব আদায়ে মহারাজা বাধা সৃষ্টি করিতেছেন এইরূপ সংবাদও কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। কোনও কোনও অভিযোগে মহারাজার কার্যাবলি যে "বিদ্রোহ" ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ বলা হইল। ইং ১৭৫৯ সালে তিক্ততা তীব্ররূপ ধারণ করে। কোম্পানির সিপাহী মহারাজার কোনও কর্মচারীকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, মহারাজার সৈন্য বাহিনীর সহিত কোম্পানির সিপাহী দলের সঙ্ঘর্ষ হয় ও তাহাতে সিপাহিগণ পরাজিত হয়। কোম্পানি কলিকাতা ও মেদিনীপুর হইতে সৈন্য আমদানি করিয়া সম্মান রক্ষা করেন।

মীরকাশেম

মীরজাফরের সহিত কোম্পানির সদ্‌ভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইং ১৭৬০ সালের অকটোবর মাসে মীরজাফর গদিচ্যুত হন ও তাঁহার স্থলে মীরকাশেম মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত হন। মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মীর কাশেম যে সনদ জাহীর করিলেন, তাহা দ্বারা বর্ধমান কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হয়। তখন বর্ধমানের মোট রাজস্ব স্থির হয় ৩১,৭৫,৪০৬ সিক্কা।

মহারাজার আর্থিক দুরবস্থা

মহারাজা তিলকচাঁদের তখন গুরুতর আর্থিক দুরবস্থা। তদানীন্তন কলিকাতা কাউনসিলের সভ্য হলওয়েল সাহেবের মতে ইহার কারণ প্রাক্তন নবাব মীরজাফরের যথেচ্ছ শোষণ। এই উক্তি মানিয়া লইলেও মহারাজার দুরবস্থার অন্য কারণও ছিল। মারাঠা হাঙ্গামার ক্ষত তখনও শুষ্ক হয় নাই। তখনও পশ্চিম প্রান্ত হইতে হাম্‌লা অব্যাহত ছিল। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থায় কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধের ক্ষমতা মহারাজার ছিল না কিন্তু কোম্পানি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। মহারাজার পক্ষে রাজস্ব পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি কোনও অভিসন্ধির প্ররোচনায় তাহা করিতেছেন না, ইহাই ছিল কোম্পানির স্থির ধারণা। সুতরাং মহারাজাকে হিসাবপত্রসহ কলিকাতায় হাজির হইবার জন্য নির্দেশ হইল। তাহার অব্যবহিত পরই তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইল যে কলিকাতায় যদি স্বেচ্ছায় হাজির না হন ফৌজ পাঠাইয়া তাঁহাকে

হাজির করান হইবে। তারপর দুই দিন যাইতে না যাইতেই হুকুম হইল যে কোম্পানি মহারাজাকে জমিদারি হইতে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজা কলিকাতায় উকিল পাঠাইলেন ও তৎসহ মারাঠা হাঙ্গামাজনিত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ প্রায় আট লক্ষ টাকার ফিরিস্তি পেশ করিলেন। অবশেষে কোম্পানির সহিত মহারাজার আপস মীমাংসা হয় এবং তদনুযায়ী বকেয়া রাজস্ব বাবদ দেয় প্রায় এগার লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য কিস্তিবন্দি হয়। কিন্তু কিস্তিবন্দি অনুযায়ী টাকা আদায় হইল না।

কোম্পানির সহিত সাময়িক মীমাংসা

ইতোমধ্যে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা বাড়িয়া চলিল; মেদিনীপুর ও বীরভূমের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মেজর হোয়াইট নামক একজন ইংরেজ সেনানির পরিচালনায় কোম্পানির সিপাহী মেদিনীপুর দখল করে। মেজর ইয়র্ক নামক আর একজন ইংরেজকে নবাবী ফৌজের সহিত বীরভূম প্রেরণ করা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর হোয়াইট মেজর ইয়র্কের সহিত যোগদান করিবার জন্য মেদিনীপুর হইতে বীরভূম যাত্রা করেন। কিন্তু বর্ধমানের নিকট প্রায় ১০,০০০ রাজসৈন্য তাঁহার পথ অবরোধ করে। মহারাজার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হয় ও রাজসৈন্য পরাজিত হয়।

পুনরায় সঙ্ঘর্ষ

এই অবস্থায় বর্ধমানের মহারাজকে গদিচ্যুত করাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু কোম্পানি তাহা করেন নাই। মহারাজাকে স্বপক্ষে রাখা ছিল কোম্পানির পক্ষে অতি প্রয়োজন। কোম্পানি বেশ জানিতেন যে বর্ধমানের কুঠিগুলির সচল অবস্থা নির্ভর করে মহারাজার সহানুভূতির উপর সুতরাং ব্যবসায়ের স্বার্থে মহারাজাকে বিরাগ ভাজন করা সঙ্গত নহে। তারপর কোম্পানি সবে মাত্র জমিদারির স্বাদ পাইয়াছে কিন্তু রাজস্ব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চারিদিকে তখন বিরোধের আশঙ্কা। বীরভূম ও মেদিনীপুরে বিরোধের আগুন ইতিপূর্বেই জলিয়াছে। এই অবস্থায় মহারাজার ন্যায় একটি প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ জমিদারির অধিকারীকে বিরূপ করিয়া স্বার্থহানি ও শত্রু বৃদ্ধি করা অপেক্ষা মিত্রভাবে গ্রহণ করাই হইল কোম্পানির কাম্য। দেশের আভ্যন্তরীণ কার্যে হস্তক্ষেপ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখনও কোম্পানির ডিরেক্টারগণের কল্পনায় স্থান পায় নাই। তাঁহারা

মহারাজার সহিত সদ্ভাব রক্ষা

সিদ্ধান্ত করিলেন যে মহারাজাকে স্বপক্ষে রাখিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের সুসংযত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ইং ১৭৬১ সালে বর্ধমানে একজন রেসিডেণ্ট (Resident) নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হয়। রাজস্ব আদায়ে কিন্তু মহারাজার দায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হইল না। পরে ইহার উন্নতি বিধানের জন্য ইং ১৭৬৩ সালে জনস্টোন (Johnstone) নামক একজন ইংরেজ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্ (Superintendent) নিযুক্ত হইয়া বর্ধমান আসেন। জনস্টোন রাজস্ব আদায়ের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর প্রকাশ্য নিলামে জমিদারির পৃথক্ পৃথক্ অংশ সর্বোচ্চ ডাকে বন্দোবস্ত করার নীতি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি করিতে পারিলেন না। জনস্টোনের পর আরও দুইজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্ হে (Hay) ও বোলট্‌স্ (Bolts), এই প্রথায় জমিদারি বিলি করেন কিন্তু দেখা গেল যে নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের পরিবর্তে তিন বৎসরের বকেয়া হইয়াছে ২৬ লক্ষ টাকার উপর। যাঁহারা বন্দোবস্ত লইয়াছেন, তাঁহারা অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ও প্রজা উৎপীড়ন করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্‌গণ নিজেরাই হইলেন দুর্নীতিপরায়ণ ; বেনামিতে জমিদারির অংশ বন্দোবস্ত লইয়া নিজেদের হাতে রাখিলেন। অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হওয়ায় কোম্পানি ভেরেল্‌স্‌ট্ (Verelst) নামক অন্য একজন ইংরেজকে সুপারভাইজার নিযুক্ত করিয়া বর্ধমান পাঠান। বিশেষ তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া ভেরেল্‌স্‌ট্ দেখিলেন যে সঠিক হস্তবুদ্ প্রস্তুত ও তৎসহ রাজস্ব আদায়ের পুরাতন পন্থাই অবস্থার উন্নতি বিধানের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক। নিলাম প্রথার অবসান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ—ইহা হইল তাঁহার নীতি। কাউন্‌সিল্ তাঁহাকে সমর্থন করেন। এই নীতি প্রয়োগে রাজস্ব আদায়ের কিছু উন্নতি হয়।

রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা

ইতিমধ্যে মীরকাশেমের সহিত কোম্পানির বিরোধ উপস্থিত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হইবে যে পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানির পক্ষে লভ্য হইল কলিকাতা ও চতুষ্পার্শ্বে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকৃত হওয়া ও তৎসহ আদিম বণিক্ বৃত্তিতে লিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা অর্জন। কিন্তু বাস্তব দাঁড়াইল অন্যরূপ। ইংরেজ কর্মচারিগণ

কোম্পানি ও মীরকাশেম

বেশ বুঝিলেন যে আসল ক্ষমতা তাঁহাদের, আর ইহার উৎস কোথায়। তাঁহাদের ইহা জানিতে বিলম্ব হয় নাই যে নবাব নামে মাত্র দেশের প্রভু, বাস্তবিক প্রভু হইল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ইতিপূর্বেই কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়া দেশের অভ্যন্তরে বহু কুঠি বা ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতির ব্যবসায়ে কোম্পানির বণিক্‌গণ নিজেদের সুবিধানুযায়ী কয়েকটি বিধিও প্রচলন করেন। ক্রমে গবর্ণর হইতে নিম্নস্তরের ইংরেজ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন। অনেকে আবার নিজেরাই কোম্পানি গঠন করিয়া জিলায় জিলায় ইংরেজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গোপন ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োগ করিয়া ইহার অপব্যবহার করিলেন। যে ব্যবসায়ে সাধারণ ব্যবসায়ী দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিজ মূলধনে ক্রয় করিয়া তাহা দেশের মধ্যেই বিক্রয় করে, তাহাই হইল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এই পণ্য দ্রব্যাদি বাহিরে রপ্তানির যোগ্য দ্রব্যাদির পর্যায়ে আসে নাই ও তাহাদের তালিকার বাহিরে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত সনদে এই অন্তর্বাণিজ্যের উল্লেখ নাই বা কোম্পানির কোনও কর্মচারীকে স্বাধীন ব্যবসা করিবার অনুমতিও দেওয়া হয় নাই। কোম্পানি নিজ ব্যবসায় পরিচালনা করিবার জন্য যে সব পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিতেন, নবাবের সনদ অনুযায়ী তাহার উপর কোনও শুল্ক ধার্য ছিল না; কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণ ইহার অপব্যবহার করিয়া নিজেদের গোপন ব্যবসায়ের জন্য কোনও শুল্ক দিতেন না, অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীকে শুল্ক দিতে হইত।

ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ কুঠিয়াল

মীরকাশেম আদেশ দিলেন যে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণকে নিজ নিজ গোপন ব্যবসায়ের জন্য শুল্ক দিতে হইবে। কলিকাতার কাউন্‌সিল্‌ রুষ্ট হইলেন ও মীরকাশেমকে এই আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মীরকাশেম ইংরেজ ও দেশীয় যাবতীয় ব্যবসায়ীকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিলেন। ইহার ফল হইল গুরুতর। ইংরেজ বণিক্‌গণ দেখিলেন যে ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, সুতরাং এই আদেশ যাহাতে কার্যকরী না হয় তাহার চক্রান্ত করিতে

মীরকাশেমের পতন

লাগিলেন। ফলে বহুস্থলে ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয় ও তাহাদের ব্যবসায়ে বাধার সৃষ্টি হয়। মীরকাশেমের সহিত কোম্পানির বিরোধ তীব্রতর হইয়া ওঠে ও যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধে মীরকাশেমের পতন হয় ও মীরজাফর পুনরায় মসনদে অধিষ্ঠিত হন। ইং ১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে মীরজাফরের সহিত কোম্পানির যে চুক্তি হয় তাহাতে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম সহ বর্ধমান কোম্পানিতে ন্যস্ত থাকা সমর্থিত হয়।

মীরজাফর

মীরজাফর কিন্তু অধিক দিন নবাবী উপভোগ করিতে পারেন নাই। ইং ১৭৬৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার অব্যবহিত পরই দিল্লীর বাদশাহ্ ফরমান জাহীর করিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি কোম্পানির হাতে অর্পণ করেন। কোম্পানির বিনা শুল্কে ব্যবসা পরিচালনার দাবীও স্বীকৃত হয়।

মীরজাফরের মৃত্যু ও কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি

সুযোগ বুঝিয়া কোম্পানির কলিকাতাস্থ কাউন্সিল্ ও কর্মচারী-বর্গ তৎপর হইলেন। বিলাতের ডিরেক্টারগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা ইং ১৭৬৫ সালে ট্রেডিং এসোসিয়েশন (Trading Association) নামে একটি বণিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানির যাবতীয় ইংরেজ কর্মচারী ইহার সভ্য হইলেন। লবণ ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ দেখিয়া তাঁহারা আদেশ জারী করিলেন যে এদেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে তাহার সমুদয় ইংরেজ কুঠিয়ালের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে, পরে বণিক্ সভা ইহা চড়া দামে দেশীয় মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিবেন। মহাজনগণ ইহার উপর লাভ রাখিয়া দেশবাসীকে বিক্রয় করিবে। মহাজনগণ বণিক্ সভা-মাধ্যম ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিতে পারিবে না। বণিক্ সভার কার্যপ্রণালী ও একচেটিয়া ব্যবসা কোম্পানির ডিরেক্টারগণ প্রথমে অনুমোদন করেন নাই কিন্তু পরে তাঁহারা যখন দেখিলেন যে কোম্পানির কর্মচারিগণ এই লাভজনক ব্যবসা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না, তখন প্রতি মণ লবণ ৫৲ টাকায় দেশবাসীকে বিক্রয় করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহার পর ইং ১৭৭৯ সালে আইন জারী করিয়া দেশবাসীকে লবণ প্রস্তুত করিতে নিষেধ করা হয়। ইং ১৭৮১ সালে কোম্পানি লবণ-বিভাগ স্থাপন করেন ও ইংরেজ

বণিক সভা

লবণের এক-চেটিয়া ব্যবসা

কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে লবণ তৈয়ারী আরম্ভ করেন। এ যাবৎ লবণ তৈয়ার করিয়া যাহারা অন্ন সংস্থান করিত তাহারা জীবিকার উপায় হারাইল। তারপর আরম্ভ হয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের প্রচেষ্টা। ইহার জন্য তন্তুবায় শ্রেণীর উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিবরণ তখনকার ডিরেক্টারগণের বিবৃতি ও সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক সাহেবের (Edmund Burke) বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তন্তুবায়দের পক্ষে তাঁত চালান অসম্ভব করিবার জন্য তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ক্ষত করিয়া দেওয়া হইত। এই অত্যাচারের ফলে তন্তুবায় শ্রেণীর সমূহ ক্ষতি হয়; তাহাদের অনেকে জীবিকাহীন হইয়া পড়ে ও বহু সমৃদ্ধিশালী পল্লী শ্রীহীন হয়। ইহার সহিত দেশে তুলার চাষও কমিয়া যায়। এই ভাবে মানচেস্টর হইতে আমদানি বস্ত্র এ দেশে চালু করার পথ পরিষ্কার করা হয়। কোম্পানির বণিক্‌গণ শহরে ও গঞ্জে কুঠি স্থাপন করিয়া দেশীয় বস্ত্রশিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। কালক্রমে ইংরেজ বণিকের দৃষ্টি পড়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রের উপর ও যে-ভাবে তাঁহারা কৃষক নির্যাতন ও শস্য উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়াইলেন তাহা হইল নীলচাষের প্রসার। পরবর্তী কালে নীলচাষকে কেন্দ্র করিয়া যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সম-সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। নীলচাষের সুবিধার জন্য দেশে বহু কুঠি স্থাপিত হয়, কুঠি ছিল ইংরেজ বণিকের অধীন আর কুঠিয়ালদের বলা হইত নীলকর সাহেব। তাহারা কৃষকগণকে উর্বর জমিতে ধানের পরিবর্তে নীলচাষ করাইতে বাধ্য করিত। সাহেবগণ যে দর সাব্যস্ত করিয়া দিত সেই হারে জন্মা-অজন্মা, শুকা-হাজার বিচার না করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে নীলের গাছ লইবার হকদার তাহারা ছিল। প্রজার কোনও লাভ না হইয়া বৎসর বৎসর বকেয়া পড়িত আর নীলকরের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। নীলের ব্যবসায়ে ইংরেজ বণিক্‌গণ বহু অর্থ উপার্জন করিতেন।

দেশীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস

নীল চাষ

কোম্পানি যখন নূতন নূতন স্বার্থ অন্বেষণে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর, দেশে তখন একটি ভয়াবহ দুর্যোগ উপস্থিত হইল। ইহা হইল ইং ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ অব্দ) নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, সাধারণে যাহাকে বলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। হাণ্টার সাহেব তাঁহার "পল্লী বাংলার

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

কাহিনী" (*Annals of Rural Bengal*—Hunter) নামক পুস্তকে এই দুর্ভিক্ষের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

"লোকের দুর্দশা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইল যে সরকারী হিসাবকে বিপর্যস্ত করিল। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকার এ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ হইলেন, তখন কিন্তু দেশে অন্নাভাব রোধ করিবার কোনও উপায়ই ছিল না। মৃত্যু সংখ্যা ও ভিক্ষুক বৃত্তি এমন ভাবে বাড়িয়া চলিতেছিল যে বর্ণনা করা যায় না। শস্যপূর্ণ পুর্নিয়ায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অন্য সব স্থানেরও সেই অবস্থা। ইং ১৭৭০ সালের দুঃসহ গ্রীষ্মের সময় লোক মরিয়াই চলিল। কৃষক চাষের বলদ বিক্রয় করিল, পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিল। তারপর আর ক্রেতা মিলিল না। ইং ১৭৭০ সালের জুন মাসে কোম্পানির রেসিডেন্ট স্বীকার করিলেন যে জীবিত লোক মৃতের মাংস খাইতেছে। দিবারাত্র ক্ষুধার্ত ও পীড়িত হতভাগ্যদের অবিরাম স্রোত বড় বড় শহরের ভিতর দিয়া চলিল। বৎসরের প্রথমেই মহামারী ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয়ের ভীড় এক পরিত্যক্ত গ্রাম হইতে অন্য পরিত্যক্ত গ্রামে খাদ্য ও আশ্রয়ের বৃথা আশায় ঘুরিতে লাগিল; লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে করিতেই জীবন হারাইল। ইং ১৭৭১ সাল আরম্ভ হইবার পূর্বেই কৃষককুলের এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইল, বহু বিত্তশালী পরিবার ধ্বংস পাইল। ইং ১৭৭০ সাল হইতে নিম্ন বাংলার অভিজাত পরিবারের দুই-তৃতীয়াংশের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে বর্ধমানের মহারাজা অতিশয় দুর্দশার ভিতর পরলোক গমন করেন, তখন রাজকোষ এরূপ শূন্য যে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে তৈজসপত্র বিক্রয় করিতে হইল; তাহাও যখন নিঃশেষ হইল, পিতার পারলৌকিক কার্যের জন্য তিনি সরকারের নিকট ঋণের জন্য আবেদন করেন।"

তদানীন্তন মুর্শিদাবাদ কাউন্‌সিলের একজন সহকারী, জন্ শোর (John Shore) এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। শোর সাহেব পরে লর্ড টেইনমাউথ (Lord Teignmouth) হইয়াছিলেন।

"Still fresh in Memory's eye the scene I view
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infant's moan
Cries of despair and agonising groans.
In wild confusion dead and dying lie;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dogs fell howl, as amidst the glare of day
They riot unmolested on their prey;
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface."

স্মৃতির নয়নে মম এখনও সে ভাসে দুঃস্বপন—
কৃশ তনু সকুঞ্চিত আভাহীন নিমগ্ন নয়ন,
জননীর আর্তনাদ, শিশুকণ্ঠে করুণ ক্রন্দন
মর্মভেদী হাহাকার, হতাশার নিষ্ফল রোদন।
মৃত মুমূর্ষুর সাথে পুঞ্জীভূত একই শয্যায়
ঐ শোন শিবাদল উল্লাসেতে জয়গান গায়,
শকুনির তারস্বর—তরাসেতে হৃদয় কাঁপায়।
নরদেহ ভোজে মত্ত বাধাহীন কুকুরের দল
রৌদ্রতপ্ত মধ্য-দিনে তুলিয়াছে তীব্র কোলাহল।
সে বড় ভয়াল দৃশ্য, লেখনী না পারে প্রকাশিতে
কাল কভু পারিবে না মুছিবারে স্মৃতিপট হ'তে।

মন্বন্তরের কারণ বিশ্লেষণ

সমসাময়িক বহু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অভিমত, এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের একটি কারণ হইতেছে কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বিচারহীন ব্যবসা পরিচালনা। কোম্পানির ডিরেক্টার সভার বিশ্বাস ছিল যে প্রজাগণকে একচেটিয়া ব্যবসাদার ইংরেজ বণিকগণের নিকট চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইত। নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি চাউলবাহী যানবাহন আটক রাখিয়া সেই চাউল প্রতি টাকায় ২৫-৩০ সের হিসাবে ক্রয় করিতেন আবার টাকা প্রতি ৩-৪ সের দরে বিক্রয় করিয়া বহু সহস্র লোকের জীবনহানি ঘটাইয়াছিলেন। তদানীন্তন কয়েকটি রিপোর্ট দৃষ্টে মনে হয় যে দেশে

খাদ্যশস্যের অভাব লোকক্ষয়ের ততটা কারণ হয় নাই যতটা হইয়া। ইংরেজ বণিকের একচেটিয়া ব্যবসা ও ইংরেজ কর্মচারীর অর্থলোভ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে বিপর্যয় আনে। দস্যু-তস্করের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এক সময় তাহাদের এরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি হয় যে, দমন করিবার জন্য রীতিমত অভিযান চালাইতে হয়। মাত্র বর্ধমান ও বীরভূমেই ডাকাতের সংখ্যা হয় দুই হাজারের উপর। মন্বন্তরের কুফল বর্তমান থাকিতেও কোম্পানির কর্মচারিগণের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনরূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতা কোম্পানি বরদাস্ত করিতেন না। কুঠিয়ালদের উৎপীড়ন ও জবরদস্তির সীমা ছিল না। ইহার ফলে স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত ক্রমবর্ধমান অসদ্ভাব চলিতে থাকিল। বর্ধমানের মহারাজার সহিতও এই সময় কোম্পানির সম্বন্ধ সন্তোষজনক ছিল না।

মহারাজা তেজচন্দ্র

মহারাজা তিলকচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্র। তেজচন্দ্র ছিলেন নাবালক ; রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য ইং ১৭৭৬ সালে জমিদারির শাসনভার তাঁহার মাতা মহারানী বিষ্ণুকুমারীর উপর ন্যস্ত হয়। মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সহিত গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস্-এর (Warren Hastings) সদ্ভাব ছিল না। বিষ্ণুকুমারী হেষ্টিংস্ এর জনৈক বন্ধু গ্রেহামের বিরুদ্ধে নাবালক পুত্রের কয়েক লক্ষ টাকা তসরূপের অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। ইং ১৭৭৯ সালে মহারাজা তেজচন্দ্র স্বয়ং জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন বর্ধমান রাজপরিবারের অতিশয় দুরবস্থা।

কোম্পানির সহিত বিরোধ

রাজস্ব আদায় ভিন্ন মহারাজার উপর আরও কয়েকটি দায়িত্ব অর্পিত ছিল। বাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণ, রাজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহন প্রভৃতির জন্য মহারাজা দায়ী ছিলেন। এই সব দায়িত্ব পালনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু কোনটিরও ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা তখন মহারাজার নাই। কোম্পানির কর্মচারিগণ মহারাজাকে তাঁহার দায়িত্ব মিটাইবার জন্য রীতিমত তাগিদ দিতে দ্বিধা করিতেন না। ইহার ফলে নানারূপ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কোম্পানির কোনও প্রকার জবরদস্তিই যখন মহারাজাকে তাঁহার দেয় পাওনা মিটাইতে সক্ষম হইল না, তখন মহারাজাকে

সাদে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাঁহার জমিদারির অংশ বলপ্রয়োগে বিক্রয় করা হয়। কলেক্টারের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়, রাজস্ব বাবদ মহারাজার যাবতীয় বকেয়া যে কোন প্রকারে আদায় করিতে। কিন্তু এক কপর্দকও জমা দেওয়া তখন মহারাজার সাধ্যাতীত। প্রতি কিস্তিতেই কোম্পানির বকেয়া প্রাপ্য বাড়িয়া চলিল; মহারাজার প্রতি কোম্পানির দুর্ব্যবহারের অন্ত থাকিল না। ইহাতে কিন্তু কোম্পানির লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হইল। ইংরেজ বণিক্‌ ও কুঠিয়ালের অত্যাচারে বর্ধমানের জনসাধারণ পূর্বেই বিরক্ত হইয়াছিল; এবার তাহারা মহারাজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল কোম্পানির বিরুদ্ধে। ইহার ফলে হইল কোম্পানির ব্যবসায়ে অশেষ বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি। বাণিজ্যের ভারপ্রাপ্ত রেসিডেণ্ট ব্যবসায়ে প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ করিলেন। লবণ বিভাগ ক্ষেদ করিলেন যে বাজারে কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে কোম্পানি যেমন মহারাজার জীবন দুঃসহ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন, মহারাজাও সেইরূপ তাঁহার জমিদারি কোম্পানির পক্ষে নিতান্ত অলাভজনক করিতে সক্ষম ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইং ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন ১ অনুসারে মহারাজা তেজচন্দ্র ইংরেজ সরকারের সহিত যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে বর্ধমান জমিদারি বাবদ রাজস্ব ধার্য হয় বার্ষিক ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা। ইহা ব্যতীত পুলবন্দি বাবদ মহারাজার দেয় ধার্য হয় ১,৯৩,৭২১ সিক্কা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বর্ধমানের পক্ষে সদ্য ফলপ্রসূ হয় নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যে দৈন্য ও দুর্দশার সৃষ্টি করে তাহার অবসান তখনও হয় নাই। মহারাজার ব্যক্তিগত ঋণ ও বকেয়া রাজস্ব বাবদ দেনাও ছিল প্রচুর। জমিদারির কিয়দংশ বকেয়া ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ইতিপূর্বেই ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় কিন্তু ইজারাদারগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানা আদায় সম্ভবপর হইল না। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি অনুযায়ী মহারাজা ধার্য রাজস্ব নির্ধারিত কিস্তি অনুসারে দিতে বাধ্য ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে কিস্তি অনুযায়ী খাজনা আদায় করিতেও মহারাজা সক্ষম হইলেন না। সরকারের নিকট বকেয়া প্রাপ্য বৃদ্ধি হইয়া

চলিল। ফলে মহারাজাকে কলিকাতায় রাজস্ব বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় ও জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখান হয়। ইহাতে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে ক্রোকিকে সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া বর্ধমানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণও কোনরূপ উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে বর্ধমানের কলেক্টার প্রস্তাব করিলেন যে পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধের একমাত্র উপায় হইল জমিদারির অংশ পৃথক্ পৃথক্ লাটে বিক্রয় করা। রাজস্ব বোর্ড এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। জমিদারি বিক্রয় আরম্ভ হইল। ক্রেতাগণের মধ্যে ছিলেন সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, ভাস্তারার ছকু সিং, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়গণ ও তেলিনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। এইভাবে হুগলি জিলার কয়েকটি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের সৃষ্টি হয়।

পত্তনির সৃষ্টি

প্রতি তিন মাস অন্তর কিস্তির সময় এইভাবে জমিদারি বিক্রয় হইয়া চলিল। জমিদারি ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হওয়ায় মহারাজা চিন্তান্বিত হইলেন; কর্মচারী ও আত্মীয়স্বজনের বেনামিতে কিছু ক্রয়ও করিলেন। অবশেষে দেখিলেন যে ইংরেজ সরকারের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি যেরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ অনুরূপ চুক্তিতে যদি জমিদারি বিলি বন্দোবস্ত করা যায় তবেই এই জটিল পরিস্থিতির অবসান সম্ভবপর। জমিদারির বিভিন্ন অংশ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট খাজানায় বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল, বন্দোবস্তের প্রধান সর্ত হইল যে ধার্য কিস্তির সময় যদি খাজানা পরিশোধ না করা হয়, তবে বন্দোবস্তি তালুক বা সম্পত্তি নিলাম করা হইবে। ইহার নামই হইল পত্তনি প্রথা। প্রথম প্রথম প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাকে পত্তনি বিলি আরম্ভ হয়। কিস্তির খেলাপে রাজ-সেরেস্তারই পত্তনি নিলাম করা হইত। কলিকাতার রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কখনও এই ক্রয়-বিক্রয় স্বীকার করিতেন আবার কখনও বা আইনের নজির দেখাইয়া ইহা স্বীকার করিতেন না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছুকাল চলিবার পর মহারাজা প্রস্তাব করিলেন যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা পত্তনি প্রথা সরকার স্বীকার করুন। রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় ইং ১৮১৯ সালে পত্তনি আইন প্রবর্তিত হয়। আইনে পত্তনি চিরস্থায়ী, মৌরুষী ও হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় ও কিস্তির

পত্তনিদারের জমিদার জিলা কলেক্টারের আদালতে পত্তনি নিলাম করাইয়া বকেয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবেন এইরূপ স্থির হয়। পত্তনি আইনের একটি ধারা পত্তনিদারকে তাহার পত্তনি বা অংশ বিশেষ বিশেষ সর্তে অধীনস্থ সত্বে বন্দোবস্ত দিবার অধিকার প্রদান করে।

দর-পত্তনি সে-পত্তনি ইত্যাদি

পত্তনি প্রথা বর্ধমান জমিদারিকে রক্ষা করিল। পত্তনিদার দেখিলেন যে রাজস্ব আদায়ের যে দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল তাহা প্রতিপালনের জন্য ও স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পত্তনি প্রথার অনুরূপ প্রথায় তালুক বণ্টন ও বন্দোবস্ত করা যুক্তিসঙ্গত। এইভাবে দর-পত্তনির সৃষ্টি হয়। দর-পত্তনিদার আবার অনুরূপ প্রথায় অধীনস্থ সে-পত্তনির সৃষ্টি করিলেন। সে-পত্তনিদারের অধীন অনুরূপ অধীনস্থ স্বত্ব সৃষ্টি হইল। আইনতঃ সবগুলিই গ্রাহ্য হইল ও ই ১৮১৯ সালের পত্তনি আইনের যাবতীয় বিধান ইহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইল। পত্তনি প্রথা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে ও বর্ধমান জমিদারির অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য জমিদারির অধিকাংশ এই প্রথানুযায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার বিলম্ব হইল না।

জাল প্রতাপচাঁদ

মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র ছিলেন প্রতাপচাঁদ। যৌবনে তিনি নিরুদ্দেশ হন। ইং ১৮৩২ সালে তেজচন্দ্রের পরলোক গমনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন মহতাব চাঁদ। মহতাব চাঁদ ছিলেন দত্তকপুত্র। ইহার পরই প্রতাপচাঁদ পরিচয় দিয়া একব্যক্তি বর্ধমানের গদি দাবী করেন। ইহা উপলক্ষ করিয়া মকদ্দমা হয় কিন্তু এই ব্যক্তিই যে নিরুদ্দিষ্ট প্রতাপচাঁদ তাহা প্রমাণিত হইল না। পরবর্তী কালে এই দাবীদার জাল প্রতাপচাঁদ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

মহারাজা মহতাব চাঁদ

মহারাজা মহতাব চাঁদ ইংরেজ সরকারের সহিত সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি রসদ ও যানবাহন সরবরাহ কার্যে সরকারকে বিশেষ সাহায্য করেন। সিপাহি বিদ্রোহে তিনি বহু রাজহস্তী ও গো-যান সরকারের সাহায্যার্থে যোগাইয়া রাখেন ও যাহাতে অশান্তির কেন্দ্র বহরমপুর ও বীরভূমের সহিত কলিকাতার যোগাযোগের ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কাটোয়া ও বীরভূমগামী রাজপথে সতর্ক পাহারা দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মহারাজার এই

সাহায্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও ইং ১৮৬৪ সালে তিনি বড়লাটের আইন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য পদ লাভ করেন।

"বর্ধমান-জ্বর"

ইং ১৮৬২ সালে বর্ধমানে এক ভয়াবহ মহামারীর আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে এই মহামারী "বর্ধমান-জ্বর" আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ইহা ভাগীরথীর অপর তটস্থ জনপদ ধ্বংস করে। বর্ধমানে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয় কালনায়। কালনা শহর ও পল্লী অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া এই মহামারীর অভিযান হয় কাটোয়ার দিকে। পরে ইহার বিস্তৃতি হয় পশ্চিম দিকে। প্রায় সমগ্র বর্ধমান জিলা এই কালব্যাধির কবলগ্রস্ত হয়। মহামারীর প্রধান উপসর্গ হইল অবিচ্ছেদী প্রবল জ্বর। ইহার পরিণাম ছিল কোনরূপ চিকিৎসার অবকাশ না দিয়াই মৃত্যু সংঘটন। জনমৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে ফ্রেঞ্চ (French) নামক একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসক বিশেষ তদন্ত করিয়া মত প্রকাশ করেন যে, যে অঞ্চলে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই স্থানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত মহামারীর প্রকোপ প্রায় সমভাবে চলে, তারপর ইহার মারণক্ষমতা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। কালনা, কাটোয়া ও বর্ধমান সদর মহকুমার বহু সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল এই মহামারীর আক্রমণে শ্রীহীন হয়। ইং ১৮৮১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে তৎপূর্ববর্তী বার বৎসরে জিলার প্রায় দশ লক্ষ লোকের জীবন হানির কারণ এই ব্যাধি।

দুর্ভিক্ষ—
ইং ১৮৬৬ সাল

মহামারী জিলার পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এই অঞ্চলের জন্য অন্য দুর্দৈব প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রথমে আসে ইং ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ। ইহার প্রকোপ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমানের রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। রাণীগঞ্জের অবস্থা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করে যে কয়লাখনির শ্রমিকগণ স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে পলায়ন করে। তৎকালীন সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে রাণীগঞ্জ এলাকায় তখন বয়স্ক পুরুষ লোক ছিল না; সকলেই পলাতক। ছিল মাত্র স্ত্রীলোক ও শিশু। তাহাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সাহায্যের জন্য সরকার যে চাউল পাঠাইতেন, সেই চাউল-ভর্তি গোযান অনুসরণ করিয়া বস্তা হইতে পতিত চাউল

জন্য তাহাদের ভিতর তুমুল কলহ ও মারামারির সৃষ্টি হইত। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দৈনিক জনমৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জন। সরকারী সাহায্য কেন্দ্রে এই সময় সাহায্য পায় বহু সহস্র লোক।

দুর্ভিক্ষ—
ইং ১৮৭৪ সাল

ইহার পর যে দুর্ভিক্ষ আসিল তাহা ব্যাপ্ত হয় সমগ্র আসানসোল মহকুমায়। ইং ১৮৭২ সালে এই অঞ্চলে ভাল ধান হয় নাই। স্থানে স্থানে গোটা গ্রামেই কোনও ফসল হয় নাই। ইং ১৮৭৩ সালে বৃষ্টি হয় অতিবিলম্বে সুতরাং ধান রোপণ করা সম্ভব হয় নাই। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা যায়। খাদ্যাভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে ও ইং ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। তৎকালীন জিলার কলেক্টার সাহেব এই দুর্ভিক্ষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

"কয়েক শ্রেণীর লোকের অবস্থা বাস্তবিক নিদারুণ। শ্রমজীবীর কাজ মেলে না। তাহাদের অনেকে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর অবস্থা নিম্ন শ্রেণীর ন্যায়। স্বর্ণকারের ব্যবসা বন্ধ, নাপিত ক্ষৌর কার্যের লোক পায় না; ব্রাহ্মণের যজমানি নাই। চৌকিদারের চাকরাণ জমিতে ফসল হয় নাই; তাহার মাহিনাও সে পায় না। ভিখারী, অন্ধ, খঞ্জ ভিক্ষা পায় না; তাঁতির কাজ চলে না। সাধারণের এই অভিযোগ যে সত্য তাহাদের চক্ষুই তাহা প্রকাশ করে।"

খাদ্যাভাব প্রবলতর হইল। জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই অনেকে গাছের পাতা ও ঘাসের বীজ খাইতে আরম্ভ করিল। সরকার হইতে এপ্রিল মাসেই সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়; তখন দৈনিক প্রায় ৭০০০ লোক ইহা হইতে আহার্য পাইত। মে মাসে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা হয় দৈনিক প্রায় ১১০০০ হাজার ও জুন মাসে প্রায় ২৬০০০। পরবর্তী তিন মাসে তাহাদের সংখ্যা পৌঁছে দৈনিক ৫০,০০০ হইতে ৭০,০০০। এই দুর্ভিক্ষে বহু প্রাণহানি হয়।

মহারাজা
আফতাব চাঁদ

ইং ১৮৮১ সালে মহারাজা মহতাব চাঁদ পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থলে দত্তকপুত্র আফতাব চাঁদ বর্ধমানের গদিতে আরোহণ

করেন। আফতাব চাঁদ বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। ইং ১৮৮৫ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভক্ত উইল অনুসারে জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ (Court of wards) এর তত্ত্বাবধানে যায়। ইং ১৮৮৭ সালে আফতাব চাঁদের বিধবা পত্নী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্রই হইলেন পরবর্তী কালের মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহতাব। ইং ১৯০২ সালে বিজয় চাঁদ স্বহস্তে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করেন। ইং ১৯০৩ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জন তাঁহার অতিথি হিসাবে বর্ধমান আগমন করেন। ইং ১৯০৮ সালে কলিকাতায় ওবারটুন হলে লেফটেন্যান্ট গবর্ণর বা ছোট লাট স্যার এনড্রু ফ্রেজারের উপর যখন বৈপ্লবিক আক্রমণ হয়, বিজয় চাঁদের কৃতিত্বে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। বুদ্ধি, বিচার, কার্যক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বে বিজয় চাঁদ একজন বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন এবং যদিও তিনি ইংরেজ শাসকগণের প্রীতিভাজন ছিলেন, বর্ধমানবাসীর সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত ছিলেন। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা পরের অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন—শেষ অঙ্ক

ইং ১৯০৩ সালে মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহতাব যখন বড়লাট লর্ড কার্জনকে বর্ধমান রাজপ্রাসাদে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করেন, একথা তাঁহার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই যে, যে-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ-হিসাবে এই সম্মানিত অতিথি গৌরবের আসনে সমাসীন, অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সেই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিবে। আবার এই বৎসরেই যখন বর্ধমানের জমিদার বংশানুক্রমিক মহারাজাধিরাজ খেতাবে ভূষিত হইলেন, কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই যে এই জমিদারি স্বত্বের বিলোপের বিলম্ব নাই। তখন দেশে জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

জাতীয় চেতনা-বোধের বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই সমগ্র দেশে এক নব জাগৃতির সূচনা হয়। ইহা হইতে রাষ্ট্র চেতনা ও পরে স্বাধীনতার স্বপ্ন রূপ গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের সহিত দেশবাসী তখন পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়াছে; আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসি বিপ্লব ও ইটালির আত্মপ্রতিষ্ঠা, আইরিশ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির কাহিনী দেশবাসীকে জাতীয় চেতনা বোধে উদ্বুদ্ধ করিল; বহু সংবাদপত্র, সাহিত্য, কাব্য দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

কংগ্রেস

রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তি স্বরূপ আবির্ভাব হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই চেতনাবোধের প্রসার হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ইং ১৮৯৯ সালে ও ইং ১৯০৪ সালে বর্ধমানে যে রাজনৈতিক সম্মেলন হয় তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্ধমানে রাজনৈতিক সম্মেলন

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মাধ্যমে। এই সময় বর্ধমানের বহু কৃতী সন্তান দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই আন্দোলনের একটি অংশ ছিল দেশের সর্বত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এই উদ্দেশ্যে রাসবিহারী ঘোষ যে অর্থ দান করেন তাহা অতুলনীয়। জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

হইতে রূপ গ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদের এবং জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থীদলের অনেকেই এই সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে দেশকে ইংরেজশাসন হইতে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিতেন। ইং ১৯০৬ সাল হইতেই বর্ধমান এই সন্ত্রাসবাদের এক কেন্দ্র হইয়া উঠে; ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ এক বিশিষ্ট আকৃতি গ্রহণ করে এবং বর্ধমানের যে সকল যুবক ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদ ক্ষেত্রে বর্ধমানের অন্য দুইটি বিশিষ্ট সন্তান হইতেছেন রাসবিহারী বসু ও বটুকেশ্বর দত্ত কিন্তু তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র ছিল বাংলার বাহিরে।

সন্ত্রাসবাদ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বর্ধমান

ইং ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয় কিন্তু তাহার পরই আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ধমানের জনসাধারণের উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করে নাই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতেই এখানে দেখা দিল এক ভয়াবহ মহামারী যাহা সমরজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা নামে পরিচিত হয়। এই মহামারীর প্রকোপ বিশেষ অনুভূত হয় ইং ১৯১৮-১৯ সালে এবং ইহাতে যে বিরাট লোকক্ষয় হয় তাহা পরবর্তী ইং ১৯২১ সালের সেন্সাস হইতে প্রকাশ পায়। ইং ১৯১১ সালে জিলার লোক-সংখ্যা গণিত হয় ১৫৩৮৮৭৪ কিন্তু ইং ১৯২১ সালে অর্থাৎ দশ বৎসর পর যখন আবার লোকগণনা হয় তখন দেখা যায় যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া প্রায় এক লক্ষ কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪৩৪৭৭১। এই মহামারীর কুফল হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই বর্ধমানে সংক্রামিত হয় আর এক ব্যাধি—বেরিবেরি, চিকিৎসকগণ যাহাকে অভিহিত করেন Epidemic dropsy নামে। ইং ১৯২৮-৩০ সালে এই ব্যাধি বিশেষ তীব্ররূপ ধারণ করে। ব্যাধির মুখ্যফল হিসাবে বহু লোক ক্ষয় হয় নাই সত্য কিন্তু ইহার জিলার অধিবাসীকে এইরূপ নিস্তেজ ও নিবীর্য্য করে যে ইহার পরিণাম হয় অশুভদায়ক। ইং ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রভূত শস্যহানি হয় এবং এই পরি-প্রেক্ষিতে ইং ১৯৩০-৩১ সালে দামোদর খাল সমষ্টির খনন উদ্বোধনে সরকারী প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ শুভ দিনের সূচনা ইঙ্গিত করে।

সমর-জ্বর

বেরিবেরি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

শাসন সংস্কারে ইংরেজ সরকার

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইং ১৯০৯ সালে ইংরেজ সরকার মর্লে-মিন্টো সংবিধান প্রবর্তন করিয়া দেশের ক্রমবর্ধমান অশান্তি সংযত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধান্তে শাসন-তান্ত্রিক সুবিধা অর্জনের প্রত্যাশায় ইংরেজকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করেন, যদিও সন্ত্রাসবাদিগণ এই ধারনা পোষণ করেন নাই। যুদ্ধান্তে ইং ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার নামে শাসন-সংস্কার বৃটিশ পার্লামেণ্ট যখন প্রস্তাব করেন, যাবতীয় রাজনৈতিক দল তখন ইহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইহা ছিল নগন্য। ফলে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন হয়, সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপও বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ সরকার এই আন্দোলন দমন করিতে কঠোর হস্তে অগ্রসর হন। এইরূপ অবস্থায় গণ-আন্দোলন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা হইল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। সরকারের দমন নীতিও অব্যাহত থাকিল। যদিও চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের পর এই আন্দোলন সাময়িক-ভাবে প্রত্যাহৃত হয়, ইং ১৯৩০ সালে কংগ্রেস প্রকল্পিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপলক্ষ করিয়া আন্দোলন আবার আরম্ভ হয়। ফলে বহু নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হন, কংগ্রেস বে-আইনি ঘোষিত হয়।

মর্লেমিন্টো সংবিধান

মণ্টেগু-চেমস্‌ ফোর্ড সংস্কার

দেশব্যাপী আন্দোলন

সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন

গোলটেবিল বৈঠক

ইং ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিশেষ এক শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তাব করিলে তাহা বর্জিত হয়। ইহার পর সাইমন কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে নূতন শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের পরিকল্পনা করিয়া বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণকে লণ্ডনে এক গোলটেবিলে আমন্ত্রিত করেন। ফলে কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে, সরকারও দমন নীতি রহিত করেন। এই গোলটেবিল বৈঠক ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু ইং ১৯৩৫ সালে সাইমন কমিশনের সুপারিশ, গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ আলোচনা প্রভৃতির ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি ভারত শাসন সংস্কার আইন গ্রহণ করেন ও এই আইন ইং ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে

১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার ও কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠন

কার্য্যকরী হয়। কংগ্রেস শাসনতন্ত্র হস্তগত করার উদ্দেশ্যে ইহাতে সম্মতি দেয় ও নির্বাচনে জয়ী হইয়া অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

ফ্লাউড কমিশন ও জমিদারি বিলোপের সুপারীশ

এদিকে জাতীয়তা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সহিত জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠে। ইহার ফলে ইং ১৯৩৭ সালে ফ্লাউড্ কমিশন গঠিত হয়। বিশেষ তদন্ত ও বিবেচনা করিয়া এই কমিশন সুপারীশ করেন যে জমিদারি প্রথা কালোপযোগী নহে ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া এই প্রথার বিলোপ হওয়া উচিত। সুপারীশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবার পুর্বেই অবতারণা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বর্ধমান

এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ধমান জিলায় বিশেষ অনুভূত হয়। সামরিক প্রয়োজনে বহু পল্লী অঞ্চল সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়; বহু সহস্র পল্লীবাসী গৃহচ্যুত ও আশ্রয়হীন হয়। জিলার বহুস্থান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। যুদ্ধ বর্তমান থাকিতেই পরপর দুইটি প্রচণ্ড দুর্বিপাক বর্ধমান আচ্ছন্ন করে। একটি হইল দুর্ভিক্ষ—সাধারণে যাহাকে বলে পঞ্চাশের মন্বন্তর—, অপরটি হইল প্লাবন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

ইং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষকে অনেকে "মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ" নামে অভিহিত করেন। সারা বাংলাদেশে এই দুর্ভিক্ষের তীব্রতা অনুভূত হয়। দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না। কিন্তু ইহার অধিকাংশই সরকার ক্রয় করিয়া গুদামজাত করেন। সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য চলাচলের ব্যবস্থায়ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া এইরূপ অবস্থায় আসিল যে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। বৎসরের প্রথম হইতেই নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জুলাই মাসে অবস্থা চরমে পৌছিল। তখন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারও নাই। সরকার জিলার প্রতি শহরে ও বিশিষ্ট স্থানে ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করিয়া খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। খাদ্যাভাব তখন এইরূপ প্রবল যে দৈনিক প্রায় দুই লক্ষ লোক বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া খিচুরি অন্ন গ্রহণ করিত। অভাবের কারণে এবং কদাহার জনিত রোগে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, বহু ক্ষুদ্র কৃষক নিজ জমি হস্তান্তর করিতে বা মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় আসিল দামোদরের ভয়াবহ প্লাবন। দামোদরের বাঁধ প্লাবনের প্রচণ্ডতা রোধ করিতে ব্যর্থ হয় এবং

দামোদরের বন্যা

ফলে বর্ধমান সদর ঘাটের নিকটে আমিরপুরে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ও বিশাল প্লাবন এই পথ দিয়া নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করে ও শস্যক্ষেত্র এবং পল্লী অঞ্চল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া পূর্বগতিতে ধাবমান হয়। বর্ধমান শহর ও রসুলপুরের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়, বর্ধমান সদর মহকুমার পূর্বাংশ ও কালনা মহকুমা নিমজ্জিত হয় ও বর্ধমান শহর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বহু বাসগৃহ বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যায়, অগণিত গৃহপালিত পশু বিনষ্ট হয়। কয়েক স্থান হইতে লোক-মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যায়। এই নিদারুণ প্লাবনে যে ব্যাপক ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিতে বহু সময় লাগে।

"ভারত ছাড়" আন্দোলন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ ও মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার প্রশ্নে কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে, যে-গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভারতকে অবিলম্বে সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, অন্যথা যুদ্ধে যোগদান করা হইবে না। বৃটিশ সরকার এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় যাবতীয় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। পরিস্থিতির উন্নতি কল্পে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এক শাসন সংস্কারের প্রস্তাবসহ এদেশে আসেন কিন্তু তাঁহার প্রয়াস নিষ্ফল হয়। ইহার পরই আরম্ভ হয় "Quit India" বা "ভারত ছাড়" আন্দোলন। এই আন্দোলন গণবিপ্লবের রূপ ধারণ করে। ইংরেজ সরকার এই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হন, কংগ্রেস অবৈধ ঘোষিত হয়, নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। পুলিশ ও সেনা-বাহিনীর হস্তে বহু লোক নির্য্যাতিত ও নিহত হয়। বর্ধমান এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

নূতন শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা

ইং ১৯৪৫ সালে যুদ্ধাবসানে বৃটিশ মন্ত্রীসভা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। পর বৎসর নব শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য ও তৎসম্পর্কীয় আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের তিনজন সদস্য তাঁহাদের পরিকল্পণাসহ ভারতে আগমণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও নূতন শাসনতন্ত্র রচনা সাপেক্ষে যাবতীয় রাজনৈতিক দলের সহযোগীতায় এক অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়। ইং ১৯৪৭ সালে তদনীন্তন বড় লাট লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন মন্ত্রীসভার সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও

স্বাধীনতা লাভ

পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেন এবং তদনুসারে এই বৎসরের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্ট "ভারত স্বাধীনতা" আইন গ্রহণ করে। আগষ্ট মাসে দেশ খণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের সাত বৎসর পরই ইং ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে "পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি দখল" আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে দেশের অন্যান্য জমিদারিসহ বর্ধমান মহারাজার বিস্তৃত জমিদারি সরকারের অধিকারে আসে। বর্ধমান রাজবংশের সর্বশেষ ভূস্বামী মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ মহতাব।

জমিদারি স্বত্বের অবসান

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমিদারি শাসন ও ইহার অবসান

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যে জমিদারি প্রথার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহার স্রষ্টা কর্ণওয়ালিশ ও ভিত্তি হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

জমিদারি বা অনুরূপ প্রথা পূর্বেও এদেশে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন-কাল হইতে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য পরিচালনা স্থানীয় ভূস্বামী বা সামন্তবর্গের উপরই ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব আদায় ও স্বীয় এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁহাদের। এই শ্রেণীর সামন্ত বা ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল বহু। তাঁহারা সার্বভৌম রাজশক্তির নিকট নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনভাবেই অবস্থান করিতেন। বিজয় সেন, শশাঙ্ক বা ইছাই ঘোষ প্রভৃতি যাহাদের পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি তাহারা আদিতে ছিলেন এই সব সামন্তদের অন্যতম। সামন্ত প্রথা মুসলমান যুগেও অব্যাহত থাকে। ভূতপূর্ব রাজা বা স্বাধীন ভূ-স্বামিগণ মুসলমান বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিলে, আদায়ী রাজস্বের অংশ কর হিসাবে প্রদান করিবার অঙ্গীকারে তাঁহাদের স্বীকৃতি দান করা হইত। আবার পাঠান, মোগল উভয়েই বিশিষ্ট মুসলমান রাজ-কর্মচারী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে আয়মা, জায়গীর প্রভৃতি দ্বারা পুরস্কৃত করিতেন। মুসলমান যুগে আয়মাদার, জায়গীরদার, ডিহিদার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে উল্লিখিত "ডিহিদার মামুদ শরিফ" এই শ্রেণীরই একজন। মুসলমান যুগে রাজস্ব আদায় কার্য্যে বহু হিন্দু নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহারাও ভূ-সম্পত্তি দ্বারা পুরস্কৃত হইতেন। রাজস্ব আদায়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে "চৌধুরী"ও বলা হইত। বর্ধমান রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় রেকাবি ব্যজারের চৌধুরী ছিলেন। যাঁহারা বিশিষ্ট পরিমাণের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁহাদের পরিচয় ছিল "ক্রোরী" নামে। কথাটী আসিয়াছে ক্রোর বা কোটি হইতে। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রঘুনাথ গোস্বামীর

প্রাচীন সামন্ত-রাজ

মধ্যযুগে সামন্ত প্রথা

পিতা সপ্তগ্রামের ক্রোরী ছিলেন। তোডরমলের রাজস্ব নির্ধারণের পর এই সকল ভূস্বামীদের ভিতর যাহারা প্রধান ছিলেন তাঁহারা পরিচিত হইলেন ভুঁইয়া বা জমিদার নামে। এই ভুঁইয়া বা জমিদারগণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। ভূ-সম্পত্তির আকর্ষণ, আভিজাত্য ও সম্মান দেশে বহু জমিদারির সৃষ্টি করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বর্ধমানের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন তখন বর্ধমান জমিদারি ভিন্নও চেতুয়া, বরদা, চন্দ্রকোনা, ভুরসুট, মহম্মদ আমিনপুর, প্রভৃতি বহু জমিদারির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

কোম্পানির আমল ও জমিদার

ইং ১৭৯৩ সালের অব্যবহিত পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহা বহু জমিদারের অনুকূল হয় নাই। ফলে অনেক পুরাতন অভিজাত বংশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার পরও অনিশ্চিত অবস্থার অবসান হয় নাই। পরে পত্তনি প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা জমিদারগণ রক্ষা পাইলেন। জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীই সাধারণ প্রজার নিকট পরিচিত হইলেন "জমিদার" নামে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষক-প্রজা

ইহার পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহা হইল কৃষক-প্রজার স্বার্থবিরোধী। মুসলমান আমল হইতে কৃষক প্রজা তাহার নিজ গ্রামস্থিত কৃষি জমিতে কয়েকটী বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়া আসিয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বহু জমি অনাবাদি হইয়া পড়ে। তখন ভূস্বামিগণ জমি আবাদের জন্য নূতন নূতন অধিকার প্রদান স্বীকার করিয়া প্রজা পত্তন করেন। কৃষক-প্রজার অনুকূল এই সকল ব্যবস্থা কিছুকাল চলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জমিদারগণ যখন সু-প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহারা হইলেন স্বার্থান্বেষী। নিজ নিজ খাস দখলি জমির আয়তন বৃদ্ধি, আত্মীয় স্বজনের স্বার্থ ও অধিকতর লাভ যখন তাঁহাদের কাম্য হইল, তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল প্রজার জমির উপর। আইন তখন ছিল জমিদারের অনুকূলে। সরকার রাজস্ব আদায়ের নিশ্চিত ব্যবস্থার স্বার্থে জমিদারের পৃষ্টপোষক ছিলেন। জমিদারের খাজানা আদায়ের যাহাতে কোনই অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য ইতি পূর্বেই দুইটী বিধান প্রবর্তিত হয়; তাহার একটী হইল ১৭৯৯ সালের

সপ্তম বিধান, অপরটী ১৮১২ সালের পঞ্চম বিধান। সাধারণ প্রজার নিকট বিধান দুইটী পরিচিত ছিল হপ্তম ও পঞ্চম নামে। ইহা প্রয়োগ করিয়া জমিদার খাজানা বাকী রাখার জন্য যে কোন প্রজাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন ও তাহার জমি নিলাম করাইতে পারিতেন। যদি কোনও প্রজা খাজানা পরিশোধ করিবে না বলিয়া সন্দেহ হইত, তাহার সম্বন্ধেও এই বিধান বলবৎ ছিল। জমিদারগণ বিধান দুইটীর পূর্ণ সুযোগ লইতে ছাড়িলেন না। বহু স্থায়ী বাসিন্দা কৃষক জমি হারাইল। তাহাদের স্থলে বর্ধিত খাজানা দিবার স্বীকৃতি লইয়া নূতন অস্থায়ী কৃষক আমদানি করা হইল। জমিদারগণ স্বনামে ও বেনামীতে বহু প্রজাস্বত্ব ক্রয় করেন। এই ভাবে অনেক পুরাতন কৃষক-প্রজার উৎখাত হয় আর তাহারা হইল ভূমিহীন ও জীবিকাহীন। ইহাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, জেম্‌স্ মিল নামক একজনী ইংরেজ তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন যে জমিদারি প্রথাই দেশের ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধের কারণ।

হপ্তম ও পঞ্চম

ইহার উপর হইল নানাপ্রকার অতিরিক্ত আদায় বা আবওয়াবের চাপ। জমিদার দেয় খাজানা ভিন্নও প্রজার নিকট অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতেন। এই আদায় হইত কখনও বা নিয়মিত ভাবে আবার কখনও সাময়িক কোনও বিশেষ উপলক্ষ্যে, যেমন বিবাহ, উপনয়ন, দুর্গাপূজা, কালিপূজা ইত্যাদি। আবওয়াব ছিল বিভিন্ন পরিচয়ের—যেমন মাথট, পরবি, ভেট, বেগার, চাঁদা, পূজাখরচা, বাটা, সেলামি ইত্যাদি। এই আবওয়াবের পীড়নে সাধারণ প্রজা কিরূপ জর্জরিত ছিল তাহা বর্ধমানের বিশিষ্ট লেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত "বাংলার কৃষক জীবন" (Bengal Peasant Life) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আবওয়াব

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বহু ইংরেজ রাজপুরুষ মত প্রকাশ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অযৌক্তিক; ইহা লক্ষ লক্ষ কৃষকের সর্বনাশ আনিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস্ অভিমত দেন "আমাদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সমগ্র প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর প্রায় অধিকাংশই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত হইয়াছে। আইন এই নির্যাতনকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে

কারণ, যে-নীতি অনুসরণ করা হয় তাহাতে বিবদমান কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য প্রজার বিরুদ্ধে ও জমিদারের স্বপক্ষে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।”

খাজানা আইন, প্রজাস্বত্ব আইন

কৃষকের ভূমি হরণ

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

১৮৫৯ সালের খাজানা আইন কৃষককুলকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা কৃষকের বহু অধিকারকে স্বীকৃতি দান ও তাহার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য একটী সমস্যার উদ্ভব হয়, ইহা হইল নূতন এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এই সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে প্রধানতঃ ব্যবসায়ী, আইন ও চিকিৎসাজীবী এবং সরকারী কর্মচারীশ্রেণী হইতে। তখন বাঙ্গালী সমাজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস করিতেছিল। আমদানি-রপ্তানি, কয়লা, চা, জলযান প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যবসায়ে বহু বাঙ্গালী তখন অগ্রগামী। আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবার অনেকেই সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সুষ্ঠু, সহজ ও নিরাপদে নিয়োজিত করার প্রকৃত ক্ষেত্র হইল ভূমি। সুতরাং ভূমিতেই তাঁহারা মনোনিবেশ করিলেন। জমিদারি বা তাহার অংশ ক্রয়, তালুক বা পত্তনি বন্দোবস্ত লওয়া বা নিলামে ক্রয়, জমিদার বা সরকার হইতে খাস জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ, আবার প্রজার জমি নিলামে বা কবলায় হস্তগত করা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহারা প্রভূত জমি অর্জন করেন। ইহার সহিত মহাজনি ব্যবসায় বিনা আয়াসে ভূ-সম্পত্তি লাভের একটী পন্থা বলিয়া পরিগণিত হইল। এই ব্যবসায় যাবতীয় বিত্তশালী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ বণিকশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করে। কৃষককে তাহার অসময়ে অতিরিক্ত সুদে ঋণ দান ও পরিশোধের অক্ষমতায় তাহার জমি হস্তগত করা হইল এই শ্রেণীর মহাজনদের নীতি। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের নিকট টয়েনবি (Toynbi) নামক জনৈক জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বিবৃতি দেন যে ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ দেশের অধিকাংশ অর্থ হস্তগত করিয়া ইহা ভূ-সম্পত্তি অর্জনে নিয়োগ করিয়াছে এবং জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের সাধারণ প্রবৃত্তিই হইতেছে চিরস্থায়ী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষক-প্রজাকে অস্থায়ী প্রজা পর্য্যায়ে রূপান্তর করা। এইভাবে আবাদি জমি কৃষক-প্রজার

মহাজন

কমিশনে টয়েনবি সাহেবের বিবৃতি

হস্তচ্যুত হইয়া এমন এক শ্রেণীর নিকট আসিল যাহারা প্রকৃত চাষী নহে। ইহাদের অনেকে ছিল আবার বহিরাগত। ইহারা সকলেই চাষে অপারগ, সুতরাং বিস্তার লাভ করিল ভাগ ও অনুরূপ প্রথা। প্রথম প্রথম ভূতপূর্ব কৃষক-প্রজাই ভাগে অথবা উচ্চতর হারে খাজানা দিবার স্বীকৃতিতে অধস্তন প্রজা হিসাবে জমি পুনরায় বন্দোবস্ত লয়; কিন্তু তাহারা যখন ম্যালেরিয়া অথবা দারিদ্র্য নিবন্ধন চাষের পক্ষে অকর্মণ্য হইয়া পড়িল, তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সাঁওতাল চাষীর আমদানি হইল। এই সাঁওতাল বর্তমানে কৃষিকার্যের একটি একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে।

জমিদারি প্রথার অবসান

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই বহু মনীষীর স্থির অভিমত হয় যে, জমিদারি প্রথা যুগধর্মের অনুপযোগী, অকল্যাণকর ও উন্নতির পরিপন্থী। জমিদারগণও প্রতিপত্তি হারাইতেছিলেন, তাঁহাদের ও প্রজার মধ্যে সংযোগের অভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯৩৮ সালের ভূমি রাজস্ব কমিশন অনেক বিবেচনার পর সুপারিশ করেন যে, জমিদারি প্রথার বিলোপ হওয়া উচিত। কিন্তু পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য অনিবার্য্য কারণে এই সুপারিশ আশু কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৪ সালে যে আইন গৃহীত হয় তাহা দ্বারা মাত্র জমিদারি নহে, যাবতীয় মধ্যসত্বের বিলোপ সাধন সাব্যস্ত হয়। এই আইন কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব হয় নাই। এই ভাবে মধ্যযুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এক-নায়কত্বের স্মারক প্রাচীন প্রথার অবসান হইল।

দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে জমিদারি প্রথার অবদান

কিন্তু এই এক-নায়কত্বকে কেন্দ্র করিয়া এক সময় দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও এই প্রথা যুগোপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইবার পক্ষে বিশেষ কোনই অন্তরায় হয় নাই। জমিদারগণের সহিত গণসংযোগ ও সাধারণের স্বার্থের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি অব্যাহত ছিল। বিদ্যা-চর্চায় উৎসাহদান, সাধারণের আশা-আকাজ্ক্ষা সমর্থন, পাঁচালি, কবিগান, চণ্ডীগান, ভাসান, যাত্রাগান ও যাবতীয় লোক-ধর্ম ও লোক-সঙ্গীতের প্রতিপোষক হিসাবে ও বহু জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা যে গণসংযোগ রক্ষা করিতেন, তাহাতে স্বৈরাচারী হইয়াও তাঁহারা সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ধমানের

বিভিন্নস্থানে যে সকল প্রাচীন জলাশয় এখনও দৃষ্ট হয়, তাহাদের খনন এই স্বৈরাচারী জমিদারদেরই কীর্তি। জলাশয়ের মধ্যে অনেকগুলি খনন করা হইয়াছিল কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের উদ্দেশ্যে। গ্রামে গ্রামে বা পথিপার্শ্বে যে জ্ঞাত অজ্ঞাত বহু দেবদেবীর পুরাতন মন্দির বা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, তাহাদের নির্মাতা ছিলেন জমিদারগণ। ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান করিয়া তাঁহারা গুণীর সমাদর করিয়াছেন; দেবোত্তর সৃষ্টি করিয়া বহু উদাসী, সন্ন্যাসী এবং ফকিরের সাময়িক আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন; চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার করিয়া তাঁহারা সাধারণের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের সংস্কৃতিতে এই শ্রেণীর যে বিশেষ অবদান আছে তাহা পরে আলোচিত হইল।

তৃতীয় পর্ব

সংস্কৃতিতে বর্ধমান

"যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর
কল কল ভাষ নীরব তাহার
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন
তুমি তারে কোথা লও।"

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীনকাল হইতে প্রাক্-চৈতন্য-যুগ

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতায় বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও তন্ত্র-ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে এখানে। মুসলমান অভিযানের বন্যা ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু সংস্কৃতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সুদূর অতীত

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর পরিচয়ে বলিয়াছেন—

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়,
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।"

মনে হয়, মুকুন্দরামের সময় "রাঢ়" ও অস্পৃশ্যতা একই অর্থ ইঙ্গিত করিত। মুকুন্দরামের বহু শতাব্দী পূর্বের জৈন শাস্ত্র-গ্রন্থে রাঢ় বা লাঢ়াকে অশিষ্ট ও সংস্কৃতিবিহীন লোকের বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণের অভিমত যে প্রাক্-আর্য্য নিষাদ জাতিই (Pre Aryan astroloid) ছিল এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। তাহারা অরণ্য পরিষ্কার করিয়া ইতস্ততঃ বসতি স্থাপন করিত। সম্প্রতি দুর্গাপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান যে এই নিষাদ জাতির আদিবৃত্তি ছিল পশু-শিকার। এখনও সাঁওতাল, বাউরি, বাগদি, ডোম প্রভৃতি প্রাক্-আর্য্য নিষাদ জাতির বংশধরগণের সংখ্যা এখানে অন্যান্য জাতির তুলনায় প্রবল। তাহাদের সংস্কৃতির ধারা ও চিরাচরিত প্রথা এখনও বিদ্যমান। কালক্রমে এই নিষাদ জাতির কোনও শাখা পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি উন্নততর বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়। আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি উত্তর পশ্চিমদিক হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া রাঢ়ের প্রান্তদেশে এই নিষাদ জাতির সংস্পর্শেই প্রথম আসে। আর্য্য সভ্যতার অধিকারীদের নিকট তাহারা পরিচিত হইল কদাচারী ও অশিষ্ট সংজ্ঞায়। বহু শতাব্দী পরও মুকুন্দরামের সময় মনে হয় "রাঢ়" অর্থে ইহাই বোঝাইত।

প্রাক্-আর্য্য সভ্যতা

কিন্তু প্রাক্ আর্য্যযুগে রাঢ়ে একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার বাহক প্রাক্-আর্য্য নিষাদ জাতির কোনও শাখা বা দ্রবিড় ভাষাভাষী কোনও জাতি ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক যাঁহারাই হউন না কেন, তাঁহারা সমৃদ্ধিশালী কৃষিপল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন, নগর পত্তন করিয়াছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিলেন, আবার সমুদ্র বাণিজ্যেও নিপুণ ছিলেন। রাঢ়ের এই সংস্কৃতির বার্তা আর্য্য ভাষাভাষীদের নিকট পৌছায় বিলম্বে। রাঢ়ের এই প্রাক্-আর্য্য সভ্যতা গড়িয়া ওঠে নদ-নদীকে বেষ্টন করিয়া। পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ বর্ধমানের অজয় অববাহিকায় "রাজার ঢিবি" প্রভৃতি স্থান খনন করিয়া প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন, তাহার সহিত প্রাক্-আর্য্য সিন্ধু-সভ্যতার বহু সাদৃশ্য আছে। গঙ্গারাষ্ট্রের বা গঙ্গারিডির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন ঐতিহাসিক ও লেখকগণ এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে ও পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যে এদেশের সহিত সাগরপারের বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ ও নৌ-বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উপরোক্ত বিদেশী লেখক-গণেরই প্রতিধ্বনি। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দামোদর-তীরস্থ চম্পাই নগরী বা অজয়-তীরের উজানি, চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরের সমুদ্র যাত্রা এক পুরাতন যুগের কাহিনীর স্মৃতি বহন করিয়া আনে, যে-যুগে দামোদর-অজয় অববাহিকায় প্রাক্-আর্য্য বণিক সভ্যতা ও বণিক সমাজের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। আর্য্য-ভাবধারার অনুপ্রবেশের বহু পূর্বেই এই অঞ্চল কৃষি ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠে ও পরবর্তী-কালের উচ্চবর্ণীয় আর্য্য ধর্মাবলম্বিগণ যে এই দেশের উপর আকৃষ্ট হন তাহার মূলে ছিল এই সমৃদ্ধি।

আর্য্য-সভ্যতার অনুপ্রবেশ

সম্ভবতঃ খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্য সভ্যতা ও কৃষ্টি এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। আর্য্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ হয় তিনটী বিভিন্ন ধারায়—জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য। কোন্ ধারার অনুপ্রবেশ যে সঠিক কোন্ সময় হয় তাহার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর কিন্তু জৈন প্রভাব যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে তাহা অনুমান করার যুক্তিসঙ্গত

জৈন ধর্ম ও বর্ধমান মহাবীর

কারণ আছে। সংলগ্ন দক্ষিণ বিহার জৈন ধর্মের জন্মস্থান। এই স্থান হইতেই জৈন ধর্মের অনুপ্রবেশ হয়। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে যখন বর্ধমানের প্রত্যন্তভাগে উপস্থিত হন, তখন স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করে; আচারাঙ্গ সূত্ত নামক জৈন-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে রাঢ়বাসীরা তাঁহাকে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মহাবীরের মতবাদ, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতি গুণরাজি রাঢ়ের এক শ্রেণীর লোককে যে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাঢ়দেশে মহাবীরের প্রথম প্রচার স্থানকে তাঁহারই পূর্বনাম অনুসারে "বর্ধমান" নামে অভিহিত করা হয়। জৈনধর্ম এই অঞ্চলে এক সময় বিশেষ প্রসার লাভ করে বলিয়া মনে হয়। বর্ধমানের বহু স্থানে তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বরাকরের বেগুনিয়া মন্দিরগুলির একটিতে জৈন প্রভাব লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মত যে কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা প্রকৃত পক্ষে একজন জৈন দেবতা ও মনসার পদ্মাবতী নামের উৎপত্তি ঐ নামীয় কোনও জৈন দেবতার নাম হইতে। আসানসোলের সালানপুর অঞ্চলে সরাক উপাধিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক আছে; তাহারা বহু পুরুষ যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করিতেছে ও নিজেদের জৈন বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৌদ্ধধর্ম ও মতবাদ

তারপর আসিল বৌদ্ধধর্মের প্লাবন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে এক বিশেষ প্রভাব স্থাপন করিয়া বর্তমান থাকে। বৌদ্ধ মতবাদ স্থানীয় প্রচলিত লৌকিক ধর্ম ও ভাবধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব সংস্কৃতি ধারার সৃষ্টি করে এবং এই সংস্কৃতি হয় জনগণের সংস্কৃতি। অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধ মতবাদ এই অঞ্চলে একরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণীয়গণ ইহার পূর্বেই এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন কিন্তু গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিশেষ বিস্তার হয় বলিয়া মনে হয় না।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পোষকতা অথবা তৎপরবর্তী মহাসামন্ত শশাঙ্কের ব্রাহ্মণ্য প্রীতি, ইহার কোনটিই বদ্ধমূল বৌদ্ধ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তারপর পালরাজগণের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মই হইল জন-সাধারণের অধিকাংশের ধর্ম। জৈন মতবাদের অতি

জন সাধারণের উপর বৌদ্ধ প্রভাব

উচ্চ আদর্শ সাধারণের নিকট গ্রহণীয় না হওয়ায়, ইহার প্রভাব বহু পূর্বেই ক্ষীণ হয় ; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সীমাবদ্ধ রহিল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের ভিতর, আর দেশের প্রায় অবশিষ্ট জনগণ হইল বৌদ্ধবাদী। তখন সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ও কাহ্নপাদের ছিল বিশেষ প্রভাব। আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের বাগদি রাজা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়া হেরুক, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদকে বিহার উৎসর্গ করেন।

মহাযান মতবাদ

এই যে বৌদ্ধ মতবাদ ও তাহার প্রভাব, ইহাদের মূলভিত্তি হইল মহাযানবাদ। মহাযানবাদের সহিত তথাগত বুদ্ধের মূল মতবাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানবাদী ; তাঁহার বাণীতে তিনি জ্ঞানবাদেরই মহিমা প্রকাশ করিয়া ইহাই যে নির্বাণ লাভের পরম পথ তাহা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু মহাযানবাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে ভক্তি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন (১) যে, তাঁহার ধারণা, মহাযানবাদ ভগবদ্ গীতা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে ও এই প্রেরণা মূল বৌদ্ধ ধর্মের কর্মত্যাগ ও জ্ঞান মার্গকে যে-ধ্যান-ভক্তি ও করুণা বিধায়ক ধর্মে রূপান্তর করিল তাহা সমগ্র এশিয়ার কৃষ্টির উপর এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। মহাযানবাদে স্থান পায় অসংখ্য দেবদেবী। বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া মহাযানবাদ তথাকার বহু দেবদেবীকেও গ্রহণ করে। সকল দেবদেবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন ভগবান বুদ্ধদেব ; তাঁহার অধিষ্ঠান স্বর্গলোকের পরম স্থানে। পাল রাজগণের প্রথম আবির্ভাবের সময় প্রচলন ছিল মহাযান মার্গের ; তারপর তন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বজ্রযান, তন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতি তন্ত্রবিধি বৌদ্ধধর্ম ও মতবাদের ভিতর প্রবেশ করে।

তন্ত্র

তন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন (২) "তারপর আছে তন্ত্রবাদ। যদিও তন্ত্রে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম, গীতোক্ত সমন্বয় হইতে ইহা অধিকতর সাহসী ও প্রভাবশালী; কারণ, সাধনার পরিপন্থী বাধাবিঘ্নকে ইহা ত্যাগ না করিয়া আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে আর তাহাদিগকে আরও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হইতে বাধ্য করিয়া সমগ্র জীবনই যে ভগবানের লীলা তাহা উপলব্ধি

(১, ২) Arabinda--Essays on the Gita

করায়। ....তন্ত্র বিশ্বাস করে যে, মানুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা আছে। এই সম্পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন বৈদিক ঋষিগণ। কালক্রমে এই ভাবধারা পরিত্যক্ত হয়।" প্রখ্যাত পণ্ডিত উডরফ (Sir John Woodroffe) বলেন (১) যে, বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান ও মহাযানবাদের ভিত্তিতে তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত যুক্ত হয় বাংলার আদিম অধিবাসী পরিকল্পিত শক্তিবাদ। মতভেদে মহাযানবাদ পূর্ব প্রচলিত তন্ত্রবাদ গ্রহণ করে। বহু মনীষীদের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে তন্ত্র-মতের আবির্ভাব হয়। শক্তিবাদ প্রচলন বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল; ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই এখানে শক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। গুপ্ত-যুগে শাক্ত ধর্ম প্রসার লাভ করে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে রচিত দেবী-পুরাণ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি বামাচারী শাক্তগণের আবাসস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কালক্রমে আদিম তন্ত্রবাদ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কর্তৃক গৃহীত হয়; ইহার কারণ বৌদ্ধমত প্লাবিত দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পূর্বে বলা হইয়াছে যে বৈদিক ধর্ম পুন-প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এদেশে আনাইয়া ছিলেন; তাঁহার এই প্রচেষ্টা জনসাধারণকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। উদার বৌদ্ধ মতবাদের সংস্পর্শে আসায় তাহাদের হৃদয়ে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এরূপ কোনই প্রচেষ্টা সফল না হইবার সম্ভাবনা। তখন সুখ-সাধ্য তন্ত্রমত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ প্লাবন হইতে আত্ম-ধর্ম রক্ষা করার চেষ্টা করেন। খাদ্যের উপর কঠোর অনুশাসন শিথিল হইল; তান্ত্রিক ধর্ম-সঙ্গত আচার ব্যবহার প্রবর্তিত হইল; সকল জাতির সকল বর্ণের নরনারী তন্ত্রমতে উপাসনা করার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এই ভাবে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। পালযুগের মহাযানবাদ তৎকাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের মূল সূত্র গ্রহণ করে।

তন্ত্র ও শক্তিবাদ

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র

বজ্রযান, তন্ত্রযান প্রভৃতি যে সকল বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচলন পরবর্তীকালে

তন্ত্রে বৈদেশিক প্রভাব

(১) Sir John Woodroffe--Principles of Tantra.

দেখা যায় তাহাদের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব বর্তমান বলিয়া অনেকের অনুমান। বঙ্গদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ যে, কোনও কোনও তন্ত্রের সূত্র তিব্বত হইতে গ্রহণ করেন তাহার নিদর্শন আছে। তন্ত্রমতে আর্য্য নাগার্জুন ভুটান হইতে তারাদেবীর পূজা এই দেশে প্রচার করেন। রুদ্রজামলে বর্ণিত আছে যে তারাদেবীর উপাসনা চীন দেশ হইতে আগত; তন্ত্রমতে "চৈনাচার" তারা উপাসনায় প্রশস্ত। আবার বশিষ্ঠ কাহিনীতে আছে যে বীরভূমের তারাপীঠে যে তারা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা তিব্বত হইতে আনিত। বিক্রমশীলা-মহাবিহারের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তন্ত্র-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার নিকট তন্ত্রমত শিক্ষা লাভের জন্য বহু বৈদেশিক পণ্ডিতগণ এই মহা-বিহারে আগমণ করিতেন ও তাঁহাদের মাধ্যমে বৈদেশিক প্রভাব তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও স্বাভাবিক মনে হয়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সংমিশ্রণ

পাল যুগের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্ম ও বৌদ্ধ মতবাদ পরস্পর পরস্পর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধ, সকলেই তারা দেবীর আরাধনা ও তন্ত্রোক্ত সাধনার পক্ষপাতী হন। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্ম রাজ সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আবার বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতির আচারানুষ্ঠান ও সাধন পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি স্পর্শ করে। বহু বৌদ্ধ দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্মে স্থান পায়; বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গৃহীত হন, বৌদ্ধস্তূপ ধর্ম-ঠাকুররূপে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে প্রবেশ করে, বৌদ্ধ গাজন ধর্মের গাজনে রূপান্তরিত হয়।

তন্ত্রের প্রসার

তৎকালে উচ্চশ্রেণীর সকলেই, তিনি বৌদ্বই হউন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীই হউন, তন্ত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আবার শৈবতন্ত্র ও শিবশক্তির আরাধনার প্রসার ছিল। নিম্ন শ্রেণীর ভিতর চণ্ডী, মনসা, বাসুলী ধর্ম-ঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবী পূজা পাইতেন, তাঁহাদের অনেকেই মহাযান-বাদ কর্তৃক পূর্বেই গৃহীত হইয়াছেন। বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সংমিশ্রণে রাঢ় ক্রমে তন্ত্র-সাধনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কুব্জিকা তন্ত্রে রাঢ় দেশে যে নয়টি ডাকার্ণব পীঠের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে ক্ষীরগ্রাম, অশ্বতীর্থ (অগ্রদ্বীপ), মঙ্গলকোট ও অট্টহাস বর্ধমান জিলার মধ্যে অবস্থিত। এই সকল স্থান অতি প্রাচীন পীঠ; যে সকল প্রস্তর নির্মিত

দেবীমূর্তি এখানে আছে সেগুলি তন্ত্রোক্ত দেবী। তন্ত্রোক্ত সাধনার ফলে যে সকল দেবীর আবির্ভাব দেখা যায় তাহাদের মধ্যে বক্রাকরের কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাসের ফুল্লরা, মঙ্গল-কোট-উজানির মঙ্গলচণ্ডী, মণ্ডল গ্রামের জগৎগৌরী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কল্যাণেশ্বরী, যোগাদ্যা ও মঙ্গলচণ্ডীর সম্মুখে পূর্বকালে নরবলি দেওয়া হইত বলিয়া কিংবদন্তি আছে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বলাই দেব শর্মা বলেন :

"রাঢ়ের অপূর্ব প্রতিভায় অনেক ধর্ম-ঠাকুর হইয়াছেন শিব; বজ্র-যোগিনী ও প্রজ্ঞাপরিমিতা হইয়াছেন সিদ্ধেশ্বরী, যোগাদ্যা, সর্বমঙ্গলা, ভবানী; বুদ্ধ—ধর্ম, শঙ্খ, জগন্নাথ, বলরাম হইয়াছেন।...ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা জলতলবাসিনী বৌদ্ধ দেবী। বর্ধমানের বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার আদি-মূর্তি বলিয়া যাহা পূজিত ও প্রদর্শিত হয় তাহা বর্তুলাকার বুদ্ধ মূর্তি—রামাই পণ্ডিতের ধর্ম পুরাণে যাহাকে "বর্তুলাকারং" বলিয়া ধ্যান করা হইয়াছে।"

চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির উদ্ভব

চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির পূজা প্রচলনের যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাদের প্রাক্-আর্য্যযুগ উদ্ভূত বলিয়াই নির্দেশ করে। আর্য্যেতর কোনও সমাজ হইতে যে চণ্ডী দেবী পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করিয়াছেন ইহা বহু পণ্ডিতেরই ধারণা। তাঁহাদের মতে "চণ্ডী" শব্দটিই অনার্য্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করে। পুরাণে যে চণ্ডী দেবীকে কান্তার-বাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, কোকামুখী প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচয় দেয়, তাহাও এই দেবীর উদ্ভব আর্য্য-সংস্কৃতির গণ্ডির বাহিরে বলিয়া নির্দেশ করে। কেহ কেহ মনে করেন যে যখন বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল, কোনও কোনও তান্ত্রিক দেবী চণ্ডীর মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করে। মানিক দত্তের চণ্ডী মঙ্গলে আদিদেব ধর্মের শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছে।

চণ্ডী

মনসা

মনসা হইয়েছেন প্রাক্-আর্য্য-জাতির সর্পদেবতা জাঙ্গুলি বা জাগুলি। আমাদের বৌদ্ধ তন্ত্রে জাঙ্গুলি দেবীর পরিচয় এই যে, এই দেবী অতি প্রাচীনা। দেবীর পূজা প্রকরণ ও মন্ত্রের সম্বন্ধেও বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

এই দেবীর রূপান্তর হয় মনসা, বিষহরি বা জগৎগৌরী প্রভৃতি নামে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির পূজার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রথমে নিম্নশ্রেণীর ভিতরই ইহাদের পূজার প্রচলন ছিল। মঙ্গল গ্রামের জগৎগৌরী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে আদিতে মৎসজীবী বাগ্‌দিরাই দেবীর দর্শন পায়। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার পূজা প্রথম প্রচলিত হয় চুনুরিদের মধ্যে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে ধামাসের ঘাটে জনৈক শাঁখারির নিকট তিনি প্রথম দর্শন দেন। মহিলা কবি তরুদত্ত তাঁহার সুললিত ছন্দে ইংরাজীতে এই কাহিনী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অনুবাদ করিয়াছেন সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :

যোগাদ্যার কাহিনী

"সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে—
শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটী গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চলে
ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে।"

পথের প্রান্তে বিপুলা দীঘি, আর তাহার ঘাটে বসিয়াছিল আয়ত লোচনা যুবতী। শাঁখারির কণ্ঠ শুনিয়া সে উৎসুকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর

"শাঁখা চাই ! ভাল শাঁখা নেবে ? ওগো মেয়ে
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা।
কৌতুক ভরে হস্ত বাড়াল নারী ;
'ঠিকটি হয়েছে, মিলে গেছে সাথে সাথ
যেমন হাত, মা শাঁখাও যোগ্য তারি'"

শাঁখার মূল্য চাহিলে যুবতী দেবীর পুরোহিতের বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন "পাবে বাছা দাম, যাও আমাদের বাড়ী। শাঁখারির নিকট পুরোহিত শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা দুই গাছি শাঁখা পরিয়াছে আর তাহার দাম লইতে বলিয়াছে বাড়ী হইতে। শুনিয়া পুরোহিত বিস্মিত

হইলেন ; তাঁহার তো কন্যা নাই ! শাঁখারিকে নিশ্চয়ই কেহ ফাঁকি দিয়াছে। শুনিয়া শাঁখারি বলিল :

"বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
ঠকাবার মত চেহারা ত তার নয় ;
তোমাকে যে চেনে, আর সে যে ব'লে দেছে
বলিস বাবাকে টাকা যদি কম হয়
ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে।"

পুরোহিত ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলিয়া দেখেন যে শাঁখার যাহা দাম তাহাই সেখানে আছে। আশ্চর্য্য হইয়া ধামাসের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় সেই যুবতী ? ঘাট শূন্য ! তখন

"করে নিবেদন দেবল মৃদুল স্বরে
'জননি ! জননি ! দেখা দে মা একবার'
সহসা শঙ্খ বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্মদীঘির বুকে
তারপর ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত, চক্ষেরি সম্মুখে।"

কালী

কালিকা বা কালী দেবী যে প্রাক্-আর্য্য সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান্ লাভ করিয়াছেন ইহাও বহু মনীষীর অভিমত। তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে কালী শক্তি দেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। তন্ত্রের ভিতর দিয়া এই দেবী ক্রমে পৌরাণিক উপাখ্যানে প্রবেশ করেন। তন্ত্রসারে কালীর যে ধ্যান আছে—

"ক্ষুৎকামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তি
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি"

অথবা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে কালীর যে রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে—

"অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা"

তাহাতে তাঁহার বিশিষ্ট প্রাক্-আর্য্য প্রকৃতিই ইঙ্গিত করে। বহুশতাব্দী পরে রাঢ়ের সাধকগণ কালীতে মাতৃরূপ আরোপ করিয়া

একটী বিশিষ্ট ভাবধারার প্রবর্তন করেন। কালী মৃত্যুরূপা হইলেও মাতৃরূপা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়

"করালী! করাল তোর নাম
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী
আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ—
মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্পর্শে আসিয়া মূল কালী পরিকল্পনা কালক্রমে বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রকৃতির কালী পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়। কালী আবার দস্যু তস্করের দেবতা হিসাবেও স্থান পান। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভেও যখন বর্ধমানের বহুস্থানে ব্যাপক দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের প্রাদুর্ভাব ছিল, বহু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই দেবতার পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। বড় বেলুন প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক কালী পূজার বীভৎস সমারোহ কালীর আদিম রূপ ও কল্পনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শিবঠাকুর

শিব ঠাকুরের পূজার প্রচলন যে কোন্ সময় হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে শিব যে একজন প্রাচীন দেবতা তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরম শৈব মহাসামন্ত শশাঙ্কের মুদ্রা ও লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই দেবতা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল বা চণ্ডী-মঙ্গলের কাহিনী যদি প্রাক্-আর্য্য বণিক সভ্যতার স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে দেখা যায় যে, সেই সুদূর অতীতে শিব বণিক কুলেরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। শিব ঠাকুরের পরিকল্পনার ভিতর জৈন, বৌদ্ধ, অনার্য্য, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের উপকরণ সমাবেশ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ভাবধারার অভিব্যক্তি হইয়াছে শিব-ঠাকুরের মধ্যে। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণোক্ত গাজন

অনুষ্ঠানে শিবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী সময়ের লৌকিক শিবঠাকুরেরই পরিকল্পনা।

"যখন আছেন গোসাঞি হয়্যা দিগম্বর
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর।
রজনীর পরভাতে ভিক্‌থার লাগি যাই
কুথাএ পাই কুথায়এ না পাই।"

গোপজাতি ও শিবঠাকুর

বর্ধমানে শিবঠাকুরের পূজা প্রসারের সহিত গোপজাতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। গোপালপুরের নিকটবর্তী আররায় যে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির আছে তাহার সহিত অমরার গড়ের সদ্‌গোপ রাজবংশের সম্বন্ধের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কাঁকসার কঙ্কেশ্বর শিব মন্দিরও তাহাদের কীর্তি। অট্টহাসের দেবী ফুল্লরার ভৈরব "বিশ্বেশ" বা বিশ্বেশ্বর শিব, নিগনের "লিঙ্গেশ্বর", রায়না থানার নাড়ুগ্রামের "নাড়েশ্বর", পূর্বস্থলী থানার জামালপুরের "বুড়োরাজ", কাটোয়া থানার ঘোষ হাটের "ঘোষেশ্বর" প্রভৃতি শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তাহাতে গোপজাতিকে শৈবধর্ম প্রসারের পোষক ও উদ্যোক্তা বলিয়া ইঙ্গিত করে।

ধর্ম-ঠাকুর

চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির পূজা ভিন্ন সাধারণের নিকট সমাদৃত হইতে থাকে ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ও গাজন। ধর্ম-ঠাকুরের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ অনিশ্চয়তা বর্তমান যে, তাঁহাকে কোথায়ও বিষ্ণু, কোথায়ও শিব আবার কোথায়ও বা সূর্য্য বলিয়া ধ্যান করা হইয়া থাকে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্ম-পূজা বৌদ্ধ ধর্ম-প্রসূত, বৌদ্ধ ধর্মের শেষ বিকৃতি। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে "ধর্ম" শব্দটী কূর্ম বাচক অনার্য্য অট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা বরুণের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। কাহারও মত আবার যে, ধর্মপূজা কোনও আদিম জাতির সূর্য্য পূজা ব্যতিত আর কিছুই নহে; ইহার সহিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্পর্ক পরবর্তীকালে স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন বলেন :

"ধর্ম-ঠাকুরের পূজা বাংলাদেশের একটী প্রাচীনতম অনুষ্ঠান।

প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে—বর্ধমান বিভাগে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদা যে এই পূজা সমগ্র বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে দেল ও পাট পূজা হয় তাহা ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠান বিশেষের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। ধর্ম পূজার মৌলিক রূপ এ দেশে অষ্ট্রিক জাতি দ্বারাই আমদানি হইয়াছিল—পরে ভারত-বর্ষের এই পূর্ব প্রান্তে ধর্ম অনুষ্ঠানের মিশ্রণে এই ক্ষীণ অনার্য্য বীজ ধর্ম-ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে ও গাজনের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।"

ধর্ম-ঠাকুর আদিতে যাহাই থাকুন না কেন তাঁহাব ভিতর যে বৌদ্ধ ছাপ আছে তাহা তাঁহার প্রচলিত ধ্যান মন্ত্রই আভাস দেয়। এই ধ্যান মন্ত্র হইতেছে—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তি ন কায়ো ন নাদঃ
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য।"

রামাই পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম পূজা বিধানে বলিয়াছেন

"পূজা শ্রী নির্বিকার
শূন্য মূর্তি ধ্যান করি।"

ধ্যান-মন্ত্রে ও রামাই পণ্ডিতের উক্তিতে যে বৌদ্ধ প্রভাব বর্তমান তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। ধ্যানমন্ত্রে যাঁহাকে বলা হইয়াছে করচরণ-হীন, নিরাকার, অনাদি অব্যয়, রামাই তাঁহাকে বলিয়াছেন শূন্য মূর্তি নির্বিকার।

ধর্ম পূজার আদি কথা

ধর্ম-পূজা আদিতে সমাজের নিম্নস্তরেই প্রচলিত ছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাল যুগে তখনকার সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সহিত মিশিয়া যাইতেছিলেন। বৌদ্ধ আচার, অনুষ্ঠান, সাধন পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিকে স্পর্শ করিতেছিল। পরযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের অধিকাংশই পড়িল শূদ্র পর্য্যায়ে। সে যুগের প্রবল ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন দেশের প্রত্যন্ত ভাগের নিম্নশ্রেণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহারাই ছিল ধর্ম পূজার প্রথম উপাসক

ও পৃষ্ঠপোষক। ধর্ম-উপাসক ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তাহাদের অন্যতম। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে বলিয়াছেন—

"তবে আগু পূজা দিল আসোয়া চণ্ডাল,
মন্তের পুষ্কর্ণি দিল মাংসের জাঙ্গাল।"

তন্ত্রানুমোদিত শিব-শক্তি প্রভৃতির পূজা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিলেও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্য-মূর্তির রূপান্তর ধর্মপূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

রামাই পণ্ডিত

ধর্ম মঙ্গলে রামাই পণ্ডিত ধর্ম পূজার প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করা আছে। ধর্ম মঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা ঘনরামের মতে রামাই পণ্ডিত ছিলেন পালরাজ ধর্মপালের সম-সাময়িক। তিনি ছিলেন জাতিতে ডোম; তাঁহার বাসস্থান ছিল বল্লুকা নদীর তীরে। এই বল্লুকা তীরেই ধর্ম পূজার প্রথম প্রচলন হয় বলিয়া কথিত আছে। বল্লুকা নদী এখন লুপ্ত প্রায় কিন্তু বর্ধমান সদর মহকুমার পূর্বাংশে ও কালনা মহকুমায় ইহার ক্ষীণ ধারা এখনও বর্তমান, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রাম বরেঁায়া ও বাগনাপাড়ার নিম্নে। এই বল্লুকা নদী ধর্ম মঙ্গলে এক পবিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। রামাই পণ্ডিত ধর্ম পূজার যে পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাকে "শূন্য পুরাণ" নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু "শূন্য পুরাণ" একজন লেখকের রচনা নহে বলিয়া অনুমান এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম পূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আর তাহার সমগ্রই রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত তাঁহার রচনাকে "পঞ্চমবেদ" আখ্যা দিয়াছেন। আবার কোথায়ও বা ইহাকে বলিয়াছেন "আগম পুরাণ।"

কালক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্ভূত দেব-দেবীর ন্যায় ধর্ম-ঠাকুরও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গৃহীত হইলেন। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনী, ধর্ম পূজা প্রবর্তন ও ইহার সম্প্রসার এক অতীত যুগের পরিচয় দেয়, যখন গণদেবতা ধর্ম নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হইতেছিলেন। পরবর্তী কালে আমরা তাঁহাকে যে ভাবে পাই তাহাতে তিনি বিষ্ণু অথবা শিবের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমানে ধর্ম-ঠাকুর বিবিধ নামে পূজিত হন, যেমন কালুরায়, ক্ষুদিরায়, বুড়ারায়, চাঁদরায়,

ধর্ম-ঠাকুরের বিভিন্নরূপ ও পূজা

রূপনারায়ণ, স্বরূপ নারায়ণ, যাত্রাসিদ্ধি ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামের নিজস্ব ধর্মঠাকুর আছেন। কোথায়ও মন্দির আছে, কোথায়ও বা নাই। ধর্মঠাকুরের কোনই মূর্তি নাই। কূর্মাকৃতি শিলা বা প্রস্তরখণ্ড ধর্মঠাকুরের পরিচায়ক। ধর্মঠাকুরের সহিত পূজিতা হন তাঁহার শক্তি চণ্ডী ও মনসা। প্রধান পুরোহিত বা দেয়াশীন নীচ জাতীয় হাড়ী বা ডোম। ধর্মঠাকুরের গাজন জাতি নির্বিশেষে সকলেরই দায়িত্ব। চৈত্র বা বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন জনসাধারণের মধ্যে অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

তন্ত্রের অবনতি

তন্ত্র-ধর্মের অবনতির সূত্রপাত পালযুগের শেষ পর্যায়েই আরম্ভ হয়। এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট তন্ত্র আবির্ভূত হইয়া দৈহিক ভোগ-লালসা নিবৃত্তিই জীবনের কাম্য বলিয়া নির্দেশ দিল এবং তাহা পরিপূরণের জন্য নানাবিধ গুহ্যসাধনা ও প্রক্রিয়ার বিধান দিল। এই শ্রেণীর তন্ত্র দেশের সাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বিষময় ফলের সৃষ্টি করিল। এই বিষয়ে বর্ধমানের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন (১) :

"যে তান্ত্রিক উপাসনায় পরাৎপর জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় 'সর্বশাস্ত্রপরোদক্ষ…জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ' গুরুদেবের সন্ধান করা আবশ্যক এই নির্দেশ আছে, যাহাতে 'উত্তমা মানসী পূজা বাহ্যপূজা কণীয়সী' বলিয়া সাধকের উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে, এবং সিদ্ধি লাভের কামনায় শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম সর্বথা বিহীত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই আবার কালবশে বামাচার পঞ্চতত্ত্বে (পঞ্চমকারে) আরম্ভ করিয়া কৌলাচারের অপব্যবহারে সাধকের রাক্ষস ভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। কৌল, দণ্ডী, প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া ম-কার সাধন করিতেন এবং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাবিদ্যা'। শেষে অর্থাদি লোলুপ গৃহীও বামাচারীর সাহায্যে সাংসারিক ফল লাভের আশায় অভিচার-ক্রিয়াদি করাইয়া লইত।"

পাল যুগোত্তর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও সমাজ ন্যাস

পাল রাজগণের পর বৌদ্ধ ধর্ম আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা তৎকাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

(১) কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগের বাংলা

এই সময় যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ অনুশাসনের সূচনা হয় তাহার আদিগুরু ছিলেন ভবদেব ভট্ট। তাঁহার আদিবাস ছিল রাঢ়দেশে,—কাহারও বা মতে বর্ধমান। তিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য বর্ণ সংস্কার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বর্মণ রাজবংশের মন্ত্রী ও ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। সমগ্র দেশে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার কাম্য। কথিত আছে যে সপ্তগ্রামের বৌদ্ধ বাগ্দি রাজত্বের অবসান তাঁহার বুদ্ধি বলেই সম্ভবপর হয়। সেন রাজগণও ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উৎকট পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের রাজত্বের প্রারম্ভে দেশে যে শ্রেণী-বিন্যাস ছিল তাহা এইরূপ :

১। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণ যাহারা বৌদ্ধ প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন।

২। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ যাঁহারা বৌদ্ধমত বা বৌদ্ধ-তন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন।

৩। নিম্নস্তরের জন-সাধারণ, তাহাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বাহিরে।

সেনরাজগণের সমাজ ন্যাসের কুফল

সেন-রাজগণ যে শ্রেণী-বিন্যাস করেন, তাহাতে শেষোক্ত দুই শ্রেণী পড়িল শূদ্র পর্য্যায়ে। এই শ্রেণী-বিন্যাসের ফলে তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরের বহু জাতি "পতিত" হইয়া শূদ্র-পর্য্যায়ে পড়িল। ইহার মধ্যে বণিক শ্রেণীও ছিল। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত "বল্লাল-চরিত" গ্রন্থে কথিত আছে যে সুবর্ণ বণিক প্রমুখ বহু সমাজ "পতিত" হয়। বাংলার অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাহার ফল হয় অশুভ। সেন-রাজগণের সমাজ সংস্কার সমাজ জীবনের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া ওঠে এবং কৌলিন্য প্রভৃতি দ্বারা যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয় তাহা পরবর্তী সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে দুরূহ সমস্যার বিষয় হয়।

সেন-রাজগণের শেষের দিক নৈতিক অবনতি

সেন-রাজগণ যে গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু নিকৃষ্ট তন্ত্রের প্রভাব তাঁহাদের সময়েই এরূপ বিস্তার লাভ করে যে, তন্ত্র-সাধনের গুহ্য প্রক্রিয়া ও তৎসম্পর্কীয় আতিশয্য নানাভাবে সমাজ জীবনকে অভিভূত করে। সেন রাজগণের শেষ পর্য্যায়ের কাব্য, লিপি মালা ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ প্রভৃতি হইতে

বোঝা যায় যে লালসাতৃপ্তির এই আতিশয্য সর্ব শ্রেণীকে ও সমাজকে কি পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

মুসলমান বিজয়ের প্রথম পর্ব

মুসলমান বিজয়ের প্রথম ভাগ বর্ধমানের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। ব্যাপক ধর্মান্তর না হইলেও বহু সমৃদ্ধিশালী পল্লী ধ্বংস হয়, বহু দেব-মন্দির চূর্ণ হয়। যে সকল দেব-মন্দির বিনষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে ছিল কাইগ্রামের সু-প্রসিদ্ধ আদি-বরাহের মন্দির। সমসাময়িক সাহিত্যে এই অত্যাচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিত বলেন:

"ধর্ম হইলা যবনরূপী মাথা এত কাল টুপি
হাতে শোভে তিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিরা যায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল!"

কিন্তু মুসলমানযুগেই বাংলার সংস্কৃতিতে বর্ধমানের দান বেশী। এই যুগেই কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থান বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই যুগে আমরা সাক্ষাৎ পাই বহু কবি, ভক্ত ও মনীষীর—যাহাদের অবদান সারা বাংলার গৌরব। আবার এই যুগেই স্থাপিত হয় বহু মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র ও আবির্ভাব হয় বহু মুসলমান পীর, সাধু ও সাহিত্যিক যাঁহারা এদেশের সংস্কৃতির ওপর গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন।

পাঠান যুগ

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের অনেকেই উদার-পন্থী ছিলেন। তাঁহারা দেশের সংস্কৃতির উৎসাহ দান করিতেন। সুলতান হুসেন শাহ হিন্দু সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন ও হিন্দু পণ্ডিতদের সম্মান করিতেন। তাঁহার সময় কুলিন গ্রামের মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" পুঁথি রচনা করিয়া গৌড় দরবার হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। এই সময় রূপ ও সমাতন গোস্বামী নামে দুই ভ্রাতা হুসেন শাহের দরবারে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল কাটোয়ার ভাগীরথী তীরে নৈহাটি। রূপ ও সনাতনের সহায়তায় শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব

কবিগণ গৌড়ে পরিচিত হন ও তাঁহাদের একজন—মহাকবি দামোদর—সুলতানের নিকট "যশোরাজ" উপাধি লাভ করেন। হুসেন শাহের আমল হইতেই কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হয়। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করান।

মুসলমান সংস্কৃতির ধারা

পাঠান আমলে মঙ্গল কোট, কালনা, বোহার প্রভৃতি স্থান মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া ওঠে। আরবি ও ফার্সি পণ্ডিত হাজি দানেশমন্দ ও মৌলানা হামিদ বাঙ্গালা মঙ্গলকোটে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বোহারে একটী আবাসিক মুসলমান শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। বহুদূর দেশ হইতে মুসলমান ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়নের জন্য আসিত। এই সময় মঙ্গলকোট, কালনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল মসজিদ নির্মিত হয়, তাহাদের চিহ্ন এখনও বর্তমান। পাঠান সুলতানগণ বহু দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের বিশেষত্ব হইল রাজপথের পার্শ্বে পথিকদের সুবিধার জন্য কয়েক ক্রোশ অন্তর বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও সরাইখানা স্থাপন। উদারপন্থী সুলতানগণ রাজস্ব আদায় ও প্রজাগণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব বহু পরিমাণে হিন্দু কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিতেন। ইহাদের পদবী ছিল আমিন, শিকদার, কারকুন, কানুনগো প্রভৃতি। রাজস্ব নির্ধারণের জন্য প্রথম জমি পরিমাপও হয় পাঠান আমলে।

পাঠান যুগে সাধারণের ধর্ম বিশ্বাস

উচ্চবর্ণের মধ্যে বিষ্ণু, শিব ও শক্তি পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ ইতিপূর্বেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ সমাদৃত ছিল ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডী পূজা। ধর্মের গাজন জনসাধারণের মধ্যে এক বিশেষ উন্মাদনার সৃষ্টি করিত ও ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনী আখ্যান বা পুঁথি হিসাবে প্রচারিত হইত। ইহাই মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপাদান সৃষ্টি করে। চণ্ডী ও মনসাদেবী এইরূপ প্রভাব স্থাপন করেন যে এই দুই দেবীর পূজা ও তৎসম্পর্কীয় আচার ও অনুষ্ঠান সমাজ ও গৃহ প্রতিষ্ঠানে অভূতপূর্ব প্রেরণা দান করে। একথা সত্যই বলা হয় যে, চৈতন্য যুগের পূর্বে চণ্ডী ও মনসার পূজা বর্ধমানের তথা রাঢ়ের অন্যতম বিশেষ অবদান। বিশেষতঃ চণ্ডী পূজার আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি এইরূপ

বদ্ধমূল হইয়া যায় যে ব্রত, নিয়ম, অর্চনা, গৃহ-জীবন প্রভৃতি সব কিছুই প্রসার লাভ করিল চণ্ডী দেবীকে উপলক্ষ করিয়া। এই সব কারণে চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগকে অনেকে অভিহিত করেন "চণ্ডীযুগ" নামে। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল এ যুগের রাঢ় দেশের সামাজিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

শাক্ত, বৈষ্ণব সকলের জন্যই তন্ত্রমন্ত্রের বিধান ছিল। কিন্তু সহজ পূজা উৎকট ভাব ধারণ করিতেছিল। ইহার প্রমান পাওয়া যায় তৎসময়ের বৈষ্ণব কবিগণের রচনা হইতে। তন্ত্রাচারীদের সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলেন :

> "মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণ
> বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করে।
> দেবতা জাগেন সভে চণ্ডী বিষহরি
> তা-ও যে পূজেন সে হো মহা দম্ভ করি।"

আর বলেন নরোত্তম দাস :

> "করয়ে কুক্রিয়া জত কে কহিতে পারে
> ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর-দ্বারে।
> কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া
> খড়্গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্য-যুগ

চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের আদি-ভূমি বর্ধমান

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে রাঢ়ের এই অঞ্চল শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের আদিভূমি বলিয়া গৌরব লাভ করে। এই বৈষ্ণব যুগ এক অপূর্ব সম্পদ্। ইহাকে নব চেতনার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অধ্যাত্ম সাধনার চরম উৎকর্ষ ছাড়াও এই যুগ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও কৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছে। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও মনুষ্যত্বের মহিমায় এইযুগ সমুজ্জ্বল। সমগ্রদেশের সংস্কৃতির উপর ইহা যে প্রভাব বিস্তার করে তাহাতে বর্ধমানের অবদান অবিস্মরণীয়।

চৈতন্য ধর্মের মূল সূত্র

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জনসাধারণের ধর্মভাব উৎকট রূপ ধারণ করিতেছিল। নিম্নস্তরের তন্ত্রের প্রভাব দ্বারা ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান হইতেছিল "কুক্রিয়ায়" আচ্ছন্ন। চৈতন্যের বাণী আনিল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক অভিনব বিপ্লব। ইহা মনুষ্যত্ব লাভের যে পথ নির্দেশ করিল তাহা হইল জীবে দয়া ও নামে রুচি, বাহ্যিক অন্ধ-আচার অনুষ্ঠানে নহে। বিনয় ও ভক্তির এই পথ—দম্ভের নহে। চণ্ডালও যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয়, সে পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান, কিন্তু দাম্ভিক ভগবৎ-প্রেম-হীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ যখন প্রবলভাবে দেশের ভিতর প্রসার লাভ করিতেছিল, তখন চৈতন্য-ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে কেন্দ্র করিয়া এক সুস্পষ্ট একেশ্বর বাদ গড়িয়া তুলিল।

চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব কবি ও গোস্বামিগণ

যদিও জয়দেব প্রথম বৈষ্ণব কবি, তাঁহার রচনায় আদি-রসাত্মক ভাবের অবতারণা দেখা যায়। অনুমান এই যে ইহা তৎকাল প্রচলিত সহজিয়া-তন্ত্রপ্রসূত। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বর্ধমানের অন্তর্গত কুলিন গ্রামের মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" পুঁথি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চৈতন্য এই পুঁথির সমাদর করিয়া বলিয়াছেন—

> "কুলিন গ্রামের মধ্যে যে হয় কুকুর
> সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহ দূর।"

মালাধর বসুর প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন গোস্বামী। তাঁহাদের পিতৃভূমি ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত নৈহাটি। মহাকবি দামোদরপ্রমুখ শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদেরই মাধ্যমে গৌড় দরবারে পরিচিত হন। এই সময় হইতেই অগ্রদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া ও শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যের কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ ও পরে কালনা ও শ্রীখণ্ডে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকৃতি নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হয়। চৈতন্যযুগে এই সকল স্থান উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র

কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের ন্যায় কালনা মহকুমার বাগনাপাড়া চৈতন্য-কালেই বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র বলিয়া গন্য হয়। বংশীবদন গোস্বামী ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ, একান্ত অনুগত। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন ও দীক্ষা দেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী বাগনাপাড়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। বাগনা-পাড়ার গোস্বামী বংশে বহু মনীষী ও ভগবৎ প্রেমিক জন্মগ্রহণ করেন। বংশীবদন বাগনাপাড়ায় শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, রামচন্দ্র গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে বিগ্রহ আনাইয়া এখানে স্থাপন করেন।

চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব কবি ও ভাগবতগণ

কেশব ভারতী

চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব কবি ও ভাগবতগণের ভিতর বর্ধমানের সন্তান ছিলেন বহু। চৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত দেনুর (মতান্তরে আউরিয়া)। গোবিন্দ দাসের কড়চা চৈতন্যযুগের এক অনুপম ইতিহাস। গোবিন্দ দাস জাতিতে ছিলেন কর্মকার, তিনি ছিলেন কাঞ্চন নগরের আধিবাসী। চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে সেবকরূপে তিনি তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিলেন ও যাহা কিছু দেখিয়াছেন কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চৈতন্য-যুগের বেদব্যাস "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাসও দেনুরের অধিবাসী। চৈতন্য ভাগবত শুধু মাত্র বৈষ্ণবগণের নিকট আদরণীয় নহে; তথ্য জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের নিকটও ইহা বিশেষ মূল্যবান, কারণ চৈতন্য লীলা ছাড়াও তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব আলেখ্য ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গোবিন্দ দাস

বৃন্দাবন দাস

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

"শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাটোয়ার নিকট ঝামাটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যের জীবন

কাহিনী যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, লেখকের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে মানবতার স্পর্শ দিয়া কৃষ্ণদাস ইহাকে আরও মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। সন্ন্যাস জীবনেও চৈতন্য মাতার কথা বিস্মৃত হন নাই। শেষ দিকে বলিতেছেন ঃ

> "তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস
> বাতুল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ।
> এই অপরাধ তুমি না লইও আমার
> তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার।"

লোচন দাস

"চৈতন্য-মঙ্গল" প্রণেতা লোচন দাসের জন্মভূমি কোগ্রাম-উজানি। লোচন দাস ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর পদকর্তা। তাঁহার ভাষা, ছন্দ ও ভাবের বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

> "তোমায় যখন পড়ে মনে ধাই বৃন্দাবন পানে
> এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
> রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
> ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
> কাজর করিয়া যদি নয়নেতে রাখি গো
> তাহে পরিজন পরিবাদ
> বাজন নুপূর হয়ে চরণে রহিব গো
> লোচন দাসের এই সাধ।"

এই বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্য যুগের এক বিশেষ অবদান। ইহার পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-লীলা পদাবলীতে প্রকাশ করিয়া জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্য লীলা বিষয়ক পদাবলীর রচনার প্রবর্তক লোচন দাস। তাঁহার সাধনা ছিল নাগরী ভাবের আর এই সাধনায় তাঁহার পথ প্রদর্শক ছিলেন ঠাকুর নরহরি সরকার। ঠাকুর নরহরি ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। চৈতন্যের একজন পার্শ্বচর হিসাবে তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও "মধুমতী" রূপে তাঁহার সেবা করিতেন। নরহরির ছিল মধুর ভাব। তাঁহার পদাবলীতে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

ঠাকুর নরহরি

"শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী
কিশোরী নয়ন তারা
জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী
কিশোরী গলার হারা।
কিশোরী বিহনে না জীয়ে পরাণে
কিশোরী করিলাম সার
কিশোরী ভজিয়া জনম যাইতে
কিছু না চাহিয়ে আর।"

জ্ঞানদাস

আর একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন জ্ঞানদাস। কাটোয়া মহকুমার কাঁদরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদাসের পদাবলী চণ্ডীদাসের পদের ন্যায় করুণ, মর্মস্পর্শী ও ভাব-সমৃদ্ধ :

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলই গরল ভেল।
সখি কি মোর করমে লিখি ...."

জয়ানন্দ

এই সময় আর একখানি "চৈতন্যমঙ্গল" রচিত হয় ; লেখকের নাম জয়ানন্দ, নিবাস ছিল আমাইপুর।

এ যুগের বৈষ্ণব কবিদের রচনা শুধু যে বৈষ্ণব ধর্মের অপরিমেয় সেবা করিয়াছে তাহা নহে, দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহার দান অপরিসীম। পদাবলী কীর্তনের দুইটী বিশেষ ঢং বা বৈশিষ্ট্যের রূপ দিয়াছেন বর্ধমানের পদকর্তাগণ। বর্ধমানের যে পরগণায় ইহাদের সৃষ্টি তাহাদের নামানুসারে এই দুইটী ঢং-এর নাম রেণেটি (রাণীহাটী পরগণা) ও মনোহর শাহী (মনোহরশাহী পরগণা)।

নবন্যায় ও রঘুনাথ শিরোমণি

চৈতন্য-যুগের প্রতিভা মাত্র বৈষ্ণব ধর্ম, কাব্য ও পদাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই প্রতিভা প্রতিফলিত দেখা যায়। এই যুগেই আবির্ভাব হয় নবন্যায়। নবন্যায়ের স্রষ্টা রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন চৈতন্যের সম-সাময়িক ও নবদ্বীপে প্রতিপালিত। কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি বর্ধমানের অন্তর্গত কোটা গ্রাম। নবন্যায়

তৎকালীন বাঙালী জাতির বুদ্ধিবত্তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আবার এই যুগেই জন্মলাভ করে মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তৎকালীন সমাজের মধ্যে যে-উপদ্রব, পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেব মর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ, অবমাননা ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। দেশের অনিশ্চিত অবস্থা, অরাজকতা, ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাত প্রভৃতি কারণে জনসাধারণ যখন অসহায় বোধ করিতেছিল, তখন লৌকিক কাহিনীর মধ্যে অলৌকিক দৈব-শক্তির কল্পনা করিয়া জীবনের দুঃখ ক্লেশ তাহারই ইচ্ছাধীন এই প্রয়াস দেখা দিল। সাহিত্যের উপর এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার ফলে মঙ্গলকাব্যের জন্ম।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মঙ্গলকাব্যগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও তাহারা যে-যুগে রচিত তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের কাহিনী ইঙ্গিত করে এক বিস্মৃত প্রায় অর্ধ-ঐতিহাসিক পুরাতন যুগের। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল বণিক-তান্ত্রিক। চম্পাই নগরী বা উজানীর সদাগরগণের ভারতীয় উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া ধনৈশ্বর্য্য লাভ করিবার যে পরিচয় পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক দিক দিয়া তাহা এ যুগের বহু শতাব্দী পূর্বের ঘটনা। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী যে-যুগের নির্দেশ দেয়, তাহাও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের। মঙ্গলকাব্যের অন্য একটী বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে আর্য্য-সভ্যতা স্থাপিত হইবার পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম বিশ্বাস ছিল তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এই কাব্যে পরিস্ফুট। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যের দেবতা একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের নিকট হইতে এক প্রকার জোর করিয়া পূজা আদায় করিয়াছেন।

মনসা মঙ্গল

মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মনসাদেবীর পূজা প্রথম প্রচলিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধ দেবদেবীগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে প্রবেশ লাভ করিতেছিল, তখন বৌদ্ধ জাঙ্গুলি তারা মনসা নামে প্রকাশ পান;

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনী মঙ্গলগানের পালারূপে প্রথম প্রচারিত হয়। মনসামঙ্গলের জন্মভূমি রাঢ়দেশ। পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর সেনরাজগণ যখন পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান, তখন মনসা-মঙ্গল কাব্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিও রাঢ়দেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে বাস করেন। তাঁহারাই সেখানে গিয়া মনসামঙ্গল কাহিনী প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় কবি নারায়ণ দেব ও ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে তাঁহারা যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্তের (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) রচনায় রাঢ় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রাঢ়ে প্রণীত যে মনসামঙ্গল পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা বিখ্যাত। ক্ষেমানন্দের সময় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী। তাঁহার নিবাস ছিল দামোদরের অপর তীরে, দক্ষিণ রাঢ়। এই সময়ের আর একজন মনসামঙ্গল লেখকের নাম পাওয়া যায়। তিনি হইতেছেন কালিদাস। নিবাস ছিল সম্ভবতঃ বর্ধমান অথবা বর্ধমান সংলগ্ন বীরভূম জিলা।

মনসামঙ্গলের কাহিনী যে প্রাচীন এক বণিকতান্ত্রিক যুগের ইঙ্গিত করে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কাহিনীর নায়ক বৈশ্য—চাঁদ সদাগর, পরম শৈব।

মনসা মঙ্গলের কাহিনী

মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ: চম্পাই নগরের বণিকরাজ চাঁদ সদাগর ছিলেন পরম শৈব। শিবের আদেশ ছিল যে চাঁদ সদাগর মনসাদেবীর পূজা না করিলে মনসার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে না। কিন্তু চাঁদ দেবীকে পূজা করিবেন না; মনসারও বহু চেষ্টা, আবেদন, চাঁদকে পূজায় প্রবৃত্ত করাইতে সক্ষম হইল না। চাঁদের স্ত্রী সনকা মঙ্গলকামনায় গোপনে মনসা পূজার আয়োজন করিলেন; কিন্তু সদাগর ইহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ও পদাঘাতে পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাতে মনসা রুষ্টা হইয়া নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। সদাগরের পরম বন্ধু শঙ্কর গাড়ুরি ছিলেন বিশিষ্ট সর্পবিষ চিকিৎসক; মনসা তাঁহার জীবন নাশ করিলেন। সদাগরের "মহাজ্ঞান" নামে এক শক্তি ছিল যাহা দ্বারা তিনি সর্পদংশনে মৃত

লোকের জীবন ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন ; মনসা কৌশলে এই "মহাজ্ঞান" হরণ করিলেন। তারপর সদাগরের ছয় পুত্রের প্রাণনাশ করিলেন। কিন্তু সদাগর তবুও অটল। নিদারুণ পুত্রশোকও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না, তিনি কিছুতেই "কানি-চেংমুড়ির" পূজা করিবেন না। কিন্তু শোকদুঃখে ম্রিয়মান সনকার সহ্যশক্তি লোপ পাইল। গোপনে মনসাপূজা করিয়া পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। মনসা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন কিন্তু বলিলেন যে পুত্রের মৃত্যু হইবে বাসরঘরে, সর্পদংশনে।

গৃহের অশান্তি হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে চাঁদ "চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর" লইয়া বিদেশে বাণিজ্যে বাহির হইলেন। সমুদ্রের মধ্যে মনসার আদেশে প্রবল ঝড় উঠিল। চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল, মধুকর নামে যে বলিষ্ঠ পোতে চাঁদ নিজে ছিলেন তাহাও নিস্তার পাইল না। চাঁদ সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হইলেন কিন্তু মনসার ইচ্ছায় মরিলেন না। কারণ তাঁহার মৃত্যু হইলে মনসার পূজার প্রচার হইবে না। তিনি রক্ষা পাইলেন ও বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে চাঁদের এক পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে, নাম রাখা হইল লক্ষীন্দর। যৌবন প্রাপ্ত হইলে উজানির বণিকরাজ সায়বেনের পরমা-সুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না কন্যা বেহুলার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল। মনসার কথা স্মরণ করিয়া চাঁদ সাতালি পাহাড়ের উপর নিচ্ছিদ্র লৌহ-বাসর নির্মাণ করিলেন। বিবাহ হইল ; নব দম্পতীকে লৌহ-বাসরে রাখা হইল। কিন্তু নিয়তিকে রোধ করা গেল না। এই লৌহ-বাসরেই লক্ষীন্দর সর্প দংশনে প্রাণ হারাইল।

লক্ষীন্দরের মৃতদেহ গাঙ্গুরের জলে ভেলায় ভাসান হইল। বেহুলা ভেলায় স্বামীর অনুগামিনী হইল, আশা—মৃত স্বামীকে কোনদিন বাঁচাইতে পারিবে। ভাসিতে ভাসিতে বহু বিপদ, বাধা, বিপত্তি, প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া বেহুলা উপস্থিত হইল সেই ঘাটে যেখানে স্বর্গের ধোপানী নেতা দেবতাদের কাপড় কাচে। সেই ঘাটে থাকিতে বেহুলা লক্ষ্য করে যে,নেতা প্রত্যহ একটি শিশু সন্তানসহ কাপড় কাচিতে আসে কিন্তু শিশুটি যখন দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে তখন নেতা তাহাকে আছড়াইয়া মারে, আবার ফিরিবার সময় বাঁচায়। এই ঘটনায় বেহুলার

মনে বিশ্বাস জন্মে যে লখীন্দরের প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার উপায় নেতা জানে। বেহুলা নেতার পদতলে পড়িয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। বেহুলার কাহিনী শুনিয়া তাহার হৃদয় গলিল ও পরে তাহারই পরামর্শে বেহুলা স্বর্গের দেবসমাজে নৃত্যকলা দেখাইয়া দেবতাদের হৃদয় টলাইতে সক্ষম হইল এবং তাঁহাদের বরে স্বামীসহ চাঁদের সাত পুত্রের জীবন ও চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর ফিরিয়া পাইল। তারপর বেহুলা সকলকে লইয়া যখন চম্পাই নগরে শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইল তখন সদাগরের মন গলিল, তিনি মনসাদেবীর পূজা করিতে আর দ্বিধা করিলেন না। এই ভাবে মনসা পূজার প্রচলন হয়।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীপূজা যে চৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত লেখক বৃন্দাবন দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের সময় এই পূজা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীপূজা সংক্রান্ত উৎকট তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান বৈষ্ণব কবিগণ "কুক্রিয়া" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চণ্ডীপূজার রূপ দিয়াছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে। কবিকঙ্কণ চৈতন্য-যুগের লোক। তাঁহার নিবাস ছিল রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যা। কবি তাঁহার কাব্যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :

মুকুন্দরামের পরিচয়

"সহর সিলিমবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

দেশের তৎ-কালীন অরাজকতা

তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। পাঠান শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মোগল শাসন সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন অবস্থায় স্থানীয় ক্ষুদ্র জমিদারগণ হইল প্রবল। প্রজাপীড়ন হইল তাহাদের ধর্ম। এইরূপ একজন জমিদার বা ডিহিদার ছিলেন মামুদ শরিফ। তাঁহার অত্যাচারে মুকুন্দরাম সাত পুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের শিলাই নদীর অপর তীরে আড়রায় বাঁকুরা রায়ের

আশ্রয় লইলেন। তখনকার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেন :

"উজীর হইল রায়জাদা বেপারীরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হৈলা অরি
কোণে কোণে দিয়ে দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শোনে প্রজার গোহারি।
সরকার হইলা কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনি উপকারে লিখায় ধুতি
পোদ্দার হইল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি।
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।
পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়াব চাপিয়া দেয় থানা
প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুডালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।"

বাঁকুড়া রায় অল্প দিনেব মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের সভাসদরূপে বাসকালীন মুকুন্দবাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিব এক বিস্তৃত ইতিহাস। ইহাতে আছে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে আছে কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, এই উপাখ্যানে চণ্ডী পশু-কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আবার অস্পৃশ্য ব্যাধ-সমাজ তাঁহার অনুগৃহীত। দ্বিতীয় কাহিনীতে আছে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের কথা; চণ্ডী এখানে মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যান মনসা মঙ্গলের ন্যায় বণিক-তান্ত্রিক যুগ ইঙ্গিত করে।

চণ্ডীমঙ্গলের রূপ

ব্যাধ কালকেতু শৈশব হইতেই বীর ও শক্তিশালী। সে বনের পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া বনের যাবতীয় পশু চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হয়। চণ্ডী তাহাদের অভয়

কালকেতুর উপাখ্যান

দান করেন ও একদিন ছল করিয়া যাবতীয় পশু লুকাইয়া রাখেন। সে দিন কালকেতুর কোন শিকার মিলিল না। পরদিন কালকেতু আবার শিকারে বাহির হইল কিন্তু পথে অমঙ্গল সূচক এক গোধিকা দেখিয়া বুঝিল যে, সে-দিনও শিকার মিলিবে না। কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া গোধিকাকে বাঁধিয়া লইল; যদি কোন শিকার না মেলে তবে ইহাকেই পোড়াইয়া খাইবে; সমস্ত বন ঘুরিয়া যখন সত্যই কোন শিকার মিলিল না, সে গোধিকা লইয়াই বাড়ী ফিরিল। গোধিকার ছাল ছাড়াইয়া স্ত্রী ফুল্লরাকে রাঁধিতে বলিল ও নিজে বাসী মাংসের পসরা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে বাহির হইল।

ফুল্লরা এক প্রতিবাসিনীর নিকট কিছু ক্ষুদ ধার করিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে এক পরমা সুন্দরী যুবতী গৃহের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যুবতী বলিল যে, কালকেতুই তাহাকে আনিয়াছে। ফুল্লরা স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা বশতঃ তাহাকে বহু নীতি বাক্যে পরগৃহবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল; সংসারের দারিদ্র্যের কথাও শুনাইল। কিন্তু যুবতীকে স্থান ত্যাগ করাইতে পারিল না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট ছুটিল। কালকেতু গৃহে আসিয়া যুবতীর লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। যুবতীকে পরগৃহ বাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু উপদেশ দিল কিন্তু তাহার যাবতীয় চেষ্টা যখন নিষ্ফল হইল তখন ধনুতে শর জুড়িল। যুবতী তখন চণ্ডী-মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

চণ্ডীর অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা উভয়েই মুগ্ধ হইল। চণ্ডী তাহাদের সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরী দিলেন ও কালকেতুকে নগর পত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কালকেতু বন কাটাইয়া গুজরাট নগর পত্তন করিল। কলিঙ্গের রাজা গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করিয়া কালকেতুকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ করে। কারাগৃহে কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিল। স্বপ্নে কলিঙ্গরাজের উপর আদেশ হইল অবিলম্বে কালকেতুকে মুক্তি দিতে। কালকেতু মুক্তি লাভ করিল ও কলিঙ্গরাজের সাহায্যে সুদৃঢ় ভাবে রাজ্য স্থাপনা করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্ত কাহিনী

পরম শৈব ধনপতি সদাগরের বাস ছিল উজানি নগর। তাঁহার পত্নীর নাম লহনা। লহনার খুড়তুতো বোন ছিল খুল্লনা। খুল্লনার

রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া ধনপতি তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। লহনা জানিতে পারিয়া দারুণ অভিমান করিয়া বসিল। ধনপতির অনুরোধ ও প্রবোধ সবই ব্যর্থ হইল। অবশেষে লহনা একখানি পাট-শাড়ী ও চুড়ী গড়াইবার জন্য পাঁচ তোলা সোনা পাইয়া বিবাহে সম্মতি দিল।

বিবাহের পর রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড়ে যাইতে হয়। লহনা প্রথমে খুল্লনাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, কিন্তু শীঘ্রই দুই সতীনের মধ্যে ভাবান্তর হইল। সদাগরের এক জাল পত্র দেখাইয়া লহনা খুল্লনাকে ছাগল চড়াইতে, ঢেঁকিশালে শয়ন করিতে ও খুঁয়া বস্ত্র পড়িতে বাধ্য করিল। একদিন ক্লান্ত হইয়া খুল্লনা যখন বনমধ্যে শয়ন করিয়া আছে, চণ্ডী তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন যে, তাহার সর্বশী ছাগল শৃগালে খাইয়াছে। খুল্লনা জাগ্রত হইয়া দেখিল যে, সত্যই সর্বশী ছাগল নাই। লহনার তিরস্কারের ভয়ে সে ছাগল অন্বেষণে বাহির হইল। পথে পঞ্চ দেবকন্যার সাক্ষাৎ মিলিল, তাহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করিতে শিক্ষা দিল। খুল্লনা বনমধ্যে চণ্ডীর পূজা করিল, চণ্ডী প্রসন্না হইলেন।

স্বপ্নে লহনার প্রতি আদেশ হইল, খুল্লনাকে পূর্বের ন্যায় আদর যত্ন করিতে। গৌড়ে ধনপতিকে চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইলেন যে, খুল্লনার প্রতি লহনা দুর্ব্যবহার করিতেছে। ধনপতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ধনপতির গৃহে বহু আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হইল। তাঁহার আদেশে খুল্লনা রন্ধন করিল। চণ্ডীর প্রসাদে রন্ধন হইল উৎকৃষ্ট; সকলেই ইহার সুখ্যাতি করিল। কিন্তু খুল্লনা যে বনে বনে ছাগল চড়াইত এই কাহিনী লইয়া বহু অপ্রীতিকর আলোচনা হয় ও ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের সময় আলোচনা চরমে ওঠে ও ইহার ফলে খুল্লনাকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। সব পরীক্ষায়ই তাহার জয় লাভ হয়।

কিছুকাল পর রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় ধনপতি সিংহল গমনের আয়োজন করিলেন। খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনায় চণ্ডী পূজা করিতে বসিল। লহনার নিকট এই সংবাদ জানিতে পারিয়া শৈব ধনপতি ক্রোধান্ধ হইলেন ও "ডাকিনী দেবতা"র ঘটে পদাঘাত

করিয়া সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্য যাত্রা করিলেন। চণ্ডী ইহার প্রতিশোধ লইলেন। সমুদ্রে সদাগরের ছয়খানি ডিঙ্গা ডুবিল। একমাত্র মধুকর ডিঙ্গা লইয়া তিনি অতিক্লেশে সিংহল উপস্থিত হইলেন। পথে সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার দর্শন হইল "কমলে কামিনী" মূর্তি। সিংহলরাজ ধনপতিকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন কিন্তু "কমলে কামিনী"র কাহিনী বিশ্বাস করিলেন না। সদাগর কিন্তু বারংবার ইহার উল্লেখ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সিংহলরাজ তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য করিলেন যে, যদি রাজাকে এই "কমলে কামিনী" দেখাইতে পারেন তবে অর্ধেক রাজ্য পাইবেন, অন্যথায় যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। ধনপতি রাজাকে "কমলে কামিনী" দেখাইতে পারিলেন না, ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইল।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র সন্তান জন্মিল, নাম রাখা হইল শ্রীমন্ত। বড় হইয়া শিশু পাঠশালায় গেল। একদিন গুরু মহাশয় তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করায় শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাইতে স্থির সঙ্কল্প করিল। সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা করিল। পিতার ন্যায় সেও সমুদ্রবক্ষে "কমলে কামিনী" প্রত্যক্ষ কবিল ও পরে সিংহলে রাজসন্দর্শনে উপস্থিত হইয়া সিংহলরাজকে এই কথা বলিল। পূর্বের ন্যায় এবারেও রাজা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে তিনি বলিলেন যে, শ্রীমন্ত যদি তাঁহাকে "কমলে কামিনী" দেখাইতে পারে তবে তাহাকে অর্ধেক রাজ্য দিবেন ও তাঁহার কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিবেন; অন্যথায় দক্ষিণ মশানে তাহাব শিরচ্ছেদ হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে "কমলে কামিনী" দেখাইতে অপাবগ হইল। রাজার লোকজন শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গেল। মশানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে লাগিল। দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। পবে তাঁহার কৃপায় সিংহল রাজের "কমলে কামিনী" দর্শন হইল। তারপর পিতাপুত্রের মিলন হইল, রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহও হইল। পিতাপুত্র উজানি ফিবিয়া আসিলেন, পথে ধনপতির ছয় ডিঙ্গাও ফিরিয়া পাইলেন।

ধর্মমঙ্গল

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করিয়া ধর্মমঙ্গল নামে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া

ওঠে। ধর্মমঙ্গলের কবিগণের যে পরিচয় জানা যায় তাহা হইতে অনুমান যে, এই কাব্য একই অঞ্চলে উৎপত্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যে কবি কল্পনা স্থান লাভ করিয়া ইহাকে মনোরম ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। আবার এই ধর্মমঙ্গলের ভিতর রাঢ়ের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের আলেখ্যও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীর ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাঢের ডোম সমাজের চরিত্র মহিমা। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মতান্তরে ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন ডোমজাতির সর্বোত্তম দেবতা ; বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয়গণ এই অঞ্চলে যখন নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করেন, এই দেবতার মধ্যে নিজস্ব ধর্মের উপাদান মিশ্রিত করিয়া স্বধর্মের দেবতা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম-মঙ্গলের রচয়িতাগণ

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় উনিশ জন ধর্ম-মঙ্গল কবির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ :

শ্যাম পণ্ডিত	বীরভূম	খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী
খেলারাম চক্রবর্তী	আরামবাগ হুগলি	ঐ
রূপরাম চক্রবর্তী	কাইতি-শ্রীরামপুর বর্ধমান	ঐ
রামদাস আদক	ভুবশুট, হুগলি	সপ্তদশ শতাব্দী
সীতারাম দাস	ইন্দাস, বাঁকুড়া	ঐ
ধর্মদাস	বীরভূম	অষ্টাদশ শতাব্দী
ঘনরাম চক্রবর্তী	কৈয়ড, বর্ধমান	ঐ
নরসিংহ বসু	শাঁখারি, ঐ	ঐ
হৃদয়রাম সাউ	বনপাশ, ঐ	ঐ
প্রভুরাম মুখুটি	মল্লভূম (বাঁকুড়া)	ঐ
গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	·	ঐ
মানিকরাম গাঙ্গুলি	আরামবাগ, হুগলি	ঐ
রামনারায়ণ	.. ..	ঐ
নিধিরাম গাঙ্গুলি	...	ঐ
ক্ষেত্রনাথ	... .	ঐ

রামকান্ত রায়	লেহারা, বর্ধমান	ঐ
ভবানন্দ রায়	দুর্গাপুর, ঐ	ঐ
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া	উনবিংশ শতাব্দী
শঙ্কর চক্রবর্তী	... .	ঐ

বর্ধমানের ধর্মমঙ্গল লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন রূপরাম ও ঘনরাম। ঘনরামের কাব্যে হরিশ্চন্দ্র পালায় রাণী রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র বলিদানের কাহিনী শুনাইতে গিয়া "পণ্ডিত গোঁসাই" রচিত কোনও পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, এই গোঁসাই পণ্ডিত শূন্য-পুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর স্রষ্টা। ধর্ম-মঙ্গলে আর একজন প্রাচীন কবির উল্লেখ আছে—ময়ূরভট্ট। তিনি ছিলেন অনেকের মতে লাউসেন কাহিনীর আদি রচয়িতা। তাঁহার রচনার সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী।

ধর্ম-মঙ্গলে ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয়

ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরকে যে ভাবে পাওয়া যায় তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একজন দেবতা। তাঁহার পূজা পৃথিবীতে পূর্বে প্রচারিত হয় নাই এবং কিভাবে এই পূজা প্রচারিত হয় তাহাই ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনী।

"সকল দেবতা পূজা পায় সব ঠাঞি
না হল্য আমার পূজা চিন্তিল গোঁসাঞি
কলিযুগে নাই হোল পূজার বিধান
সাধিবে আমার পূজা কোন্ ভাগ্যবান।
কে বা দিবে পুষ্প-দল যাব কার ঠাঞি
পূজার কারণে বড় চিন্তিত গোসাঞি।" (১)

রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মকে নারায়ণ রূপেই বন্দনা করিয়াছেন:

"এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপ গুণ কথা হরিহর ইন্দ্র ধাতা
যত কিছু আপনি গোসাঞি।
কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ
পাণ্ডব বংশের যদুমণি
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বাহুবল
যোগরূপে জন্মিলা আপনি।"

(১) রূপরাম—ধর্মমঙ্গল

রূপরামের বন্দনায় বৈষ্ণব ভাব পরিস্ফুট এবং তিনি তৎকালীন বৈষ্ণব আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অপরদিকে ঘনরামের রচনায় পাণ্ডিত্যেরই বিশেষ বিকাশ।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ :

ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনী

তখন ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে। গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিল তাঁহার শ্যালক মহামদ। মহামদ রাজার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী সোম ঘোষকে অকারণে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা তাহাকে মুক্তি দেন ও অজয় তীরে ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ পিতার সহিত ঢেকুরে আগমন করেন। কর্ণসেন ছিলেন ঢেকুরে গৌড়রাজের অধীনস্থ সামন্ত। ইছাই ছিলেন শক্তি উপাসক। ভবানীর অনুগ্রহে তিনি ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া কর্ণসেনকে ঢেকুর হইতে বিতাড়িত করেন। কর্ণসেন গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইছাই আরও শক্তিশালী হইয়া রাজকর দেওয়া বন্ধ করেন। ফলে গৌড়েশ্বর নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ঢেকুর আক্রমণ করেন কিন্তু অজয়ের বন্যায় তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়। শোকে তাঁহার স্ত্রী দেহত্যাগ করেন।

গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়েশ্বর মহামদের মতের বিরুদ্ধে তাঁহার শ্যালিকা অর্থাৎ মহামদের ভগ্নি রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দেন ও তাঁহাকে ময়নার সামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ময়নায় পাঠাইয়া দেন। কর্ণসেন সস্ত্রীক ময়নায় আসেন কিন্তু বহুদিন তাঁহাদের কোন সন্তান হয় না। রাজকার্য উপলক্ষে কর্ণসেন সস্ত্রীক গৌড়ে গমন করিলে মহামদ একদিন প্রকাশ্য রাজসভায় কর্ণসেনকে আটকুঁড়া ও রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলিয়া অপমান করে। রঞ্জাবতী এই অপমানে অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন ও ময়নায় ফিরিয়া কি উপায়ে সন্তান হয় তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ধর্মের পুরোহিত রামাই পণ্ডিত গাজন লইয়া ময়নায় উপস্থিত হন। রঞ্জাবতী তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বিধান দিলেন যে "শালে ভর" দিলে রঞ্জাবতীর পুত্র সন্তান হইবে। বিধান মতে রঞ্জাবতী চাঁপাই নদীর ঘাটে "শালে ভর" দিলেন। ধর্ম ঠাকুরের প্রসাদে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়, নাম রাখা হইল লাউসেন। পরে

তাঁহার কর্পূর সেন নামে আর এক পুত্র জন্মে। লাউসেন বাল্যকাল হইতেই মহা পরাক্রমশালী হইয়া ওঠেন। বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কর্পূর সেনকে লইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করেন ও পথে বহু বিপদ ও প্রলোভন জয় করিয়া গৌড়ে উপস্থিত হন। পরিচয় লইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করেন। কিন্তু মহামদ ইহা পছন্দ করিল না। গৌড়রাজকে পরামর্শ দিয়া মহামদ লাউসেনকে কামরূপ জয় করিতে পাঠায়, লাউসেন কামরূপের রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন ও গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। সিমুলার রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানাড়াকেও লাউসেন নিজ বীর্য্যবলে বিবাহ করেন।

এদিকে ইছাই ঘোষ মহাপরাক্রান্ত হইযা উঠিতে ছিলেন। মহামদের প্ররোচণায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ঢেকুর জয় কবিতে পাঠান। ধর্ম-ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঢেকুর অধিকার করেন।

কিন্তু ইহাতেও মহামদ নিরস্ত হইলেন না। তাহার প্রবোচনায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে আদেশ করিলেন যে, পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে। এই অসাধ্য সাধন করিতে লাউসেন ধর্মঠাবুরেব পীঠস্থান হাকন্দে গিযা কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। নিজের দেহ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, ধর্ম ঠাকুর প্রসন্ন হইলেন, পশ্চিমে সূর্যোদয হইল। ধর্মের কৃপায় লাউসেনও প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

লাউসেন যখন তপস্যারত, মহামদ সসৈন্যে ময়না আক্রমণ করে কিন্তু কালু ডোম ও তাহাব পত্নী লখাই-এর বীরত্বে ময়না রক্ষা পায়। ধর্মের কোপে মহামদ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু লাউসেনের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে। ইহার পরে লাউসেন পরম গৌরবে ময়নায় রাজত্ব করিতে থাকেন। ধর্ম ঠাকুরের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার হয়।

সাধারণের উপর মঙ্গল-কাব্যের ভাব

মঙ্গল কাব্যের কাহিনী এক সময় জনসাধারণের অন্তস্তল পর্যন্ত পৌঁছিয়া এক অপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। চাঁদ সদাগরের চরিত্র ও মহিমময় পুরুষকার, অশেষ দুঃখ, ক্লেশ, বিপদ ও অশান্তির

মধ্যেও বহু মানুষকে মানসিক শক্তি বজায় রাখিতে উৎসাহ দিয়াছে। চাঁদ সদাগরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায় বলিয়াছেন :

"শিখাইলে এই সত্য তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব
দেব নয় মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার পরে
করে দেব মহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী হইতে চাহনি ভোগী
সত্য ব্রহ্মে করি সঙ্কোচন
সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাতীত পান করি চিদমৃত
জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।"

চাঁদ সদাগরের চরিত্র সাধারণকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছে আবার তাঁহার পরাজয়ে প্রবোধ দিয়াছে এই ভাবে যে, মানুষের জীবনে দৈব অতি প্রবল। পুত্রশোক সন্তপ্তা সনকার অশ্রুবারি, বেহুলার বেদনাময় জীবন বহু দুঃখ শোক জর্জরিত প্রাণে সান্ত্বনা দিয়াছে। বেহুলার একনিষ্ঠা পতিভক্তি বহু নারীকে যে প্রেরণা দিয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি আমরা পাই ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের এই উক্তিতে—

"সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি করতল
পতিপদে ভক্তি বল যার
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধুলায় আর
আমি কি মহিমা কব তার।"

ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের চরিত্র একটি বিস্ময়। কালু ডোম ও তাহার সহধর্মিনী লখাই ডোমনির চরিত্র ও প্রভুভক্তি অতুলনীয়। মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে সমাজের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অতি পরিচিত চিরন্তন কাহিনী। ফুল্লরার দুঃখের কাহিনীর সহিত বহু নারীজীবনের সাদৃশ্য ও সমবেদনা বিদ্যমান আর সমাজে "মুরারী শীল" ও "ভাঁড়ু দত্তের" প্রভাব এখনও ক্ষুন্ন হয় নাই।

মধ্যযুগের জীবন যাত্রা

চৈতন্য-যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে তৎকালীন জীবন যাত্রা প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। তখন পল্লীই ছিল কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। সমাজ জীবনে যাহাদের নিত্য প্রয়োজন, এইরূপ সব শ্রেণীই পল্লীগ্রামে

বিভিন্ন নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করিতেন। নূতন বসতি স্থাপনের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নগর বা গ্রাম পত্তন করিতেন ও এই জন্য নানাজাতীয় লোকদের আমন্ত্রণ করিতেন; ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি ও বাড়ী দান করিতেন। খড়ের চালার বাংলাঘর সম্পন্ন গৃহস্থের প্রিয় ছিল। তাঁহারা তসর বা নেতের বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেহের শোভা বর্ধন করিতেন। সাধারণ লোকের পরিধেয় ছিল তাঁতের ধুতি; উৎসবের সময় ইহার সহিত যোগ হইত চাদর। দরিদ্র নরনারীর পরিধেয় ছিল "খুঞা" ধুতি বা শাড়ী। ধনবানের গৃহিণী হার, কেয়ূর, কঙ্কন ও নাকে বেসর ব্যবহার করিতেন; পাটী শাড়ী ও কনকের চুড়ি ছিল তাঁহাদের প্রিয়। কর্পূর সুবাসিত পান স্ত্রীপুরুষ সকলেরই ছিল আদরণীয়। বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যস্থলে শিব অথবা বিষ্ণু মন্দির স্থাপিত হইত; বৈশাখ, কার্তিক, মাঘ মাসে স্নান, দান, নিরামিষ আহার, উপবাস প্রভৃতি পুণ্য কার্য বলিয়া গণিত হইত। আশ্বিন মাসে মহা সমারোহে অম্বিকার পূজার প্রচলন ছিল। মাঙ্গলিক কার্য্যে রম্ভাতরু রোপণ, গীত, নাট্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ সেবা, ব্রহ্মোত্তর দান দ্বারা ব্রাহ্মণকে সম্মান, বহু-বিবাহ প্রথা, বিবাহ ও উৎসবে বিশেষ আড়ম্বর সমাজ জীবনের অঙ্গ ছিল। সতীনে সতীনে বিবাদ ও হিংসা, গ্রাম্য ও সমাজগত দলাদলি প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। ভোজনের ব্যাপারে বিলাসিতা ও আতিশয্য ছিল। আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকারেরই অন্নব্যঞ্জনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তালিকা অতি বিস্তৃত।

এই যুগে বর্ধমানের শিল্প ও বাণিজ্য

মঙ্গলকাব্যের ভিতর যে যুগের পরিচয় পাওয়া যায় সেই যুগে বর্ধমানে নৌ-বাণিজ্যের ও নৌ-শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। বিশিষ্ট বণিকগণ ডিঙ্গা আরোহণ করিয়া দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিতেন। ডিঙ্গাগুলি তৈয়ার হইত সমুদ্র যাত্রার উপযোগী করিয়া। চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা নির্মাণ করিয়াছিল ষোল শত সূত্রধর, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া; ইহা হইতেই ডিঙ্গার আকৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ধমানের একজন প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন ধুসদত্ত। তাঁহার কাহিনী মুকুন্দ-রামের সময় প্রচলিত ছিল—

"বর্ধমানে ধুসদত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেন্যার প্রধান
বাহুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বরষ বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান।"

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও ধুসদত্তের কথা বলিয়াছেন—

"বর্ধমান হৈতে আল্য ধুসদত্ত বান্যা।"

মুকুন্দরাম পাটী শাড়ী ও কনকের চুড়ির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় এগুলি বর্ধমানেই প্রস্তুত হইত। এই অঞ্চলে বহু শিল্পী ও বণিকের প্রাধান্য ছিল।

সংস্কৃতির উপর মুসলমান কৃষ্টির প্রভাব

মুসলমান-যুগ এ অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর এক গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাঠান আমলেই মঙ্গলকোট, কালনা প্রভৃতি স্থান মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া ওঠে। মঙ্গলকোটের প্রসিদ্ধ মসজিদের মধ্যে একটী নির্মিত হয় সুলতান হুসেন শাহের সময়, একটী তাঁহার পুত্র নসরত শাহের সময় ও অন্য একটী বাদশাহ সাজাহানের রাজত্বকালে। মুসলমান সংস্কৃতির বহু নিদর্শন কালনায় বর্তমান। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে বহু মসজিদ নির্মিত হয়। মজলিস্‌শাহ্‌ নামক মসজিদ্‌টী এইরূপ বিস্তৃত ও বৃহৎ ছিল যে শোনা যায় বাৎসরিক ইদ্‌ নমাজের সময় চতুষ্পার্শ্বের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের প্রায় সাত আট শত শিবিকা ইহার প্রাঙ্গণে জমা হইত। বর্ধমান শহরের পুরাতন চক মহল্লার বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ্‌ নির্মাণ করেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উ-সান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে জাহানদার শাহের উজির সৈয়দ শা আলম খাঁ নিরুদ্বেগ জীবন যাপনের জন্য কাটোয়ায় বাস করেন। তাঁহার নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। বহু মুসলমান সাধক, পীর ও ফকির বর্ধমান অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্ধমানের পীর বহরান, কালনার বজর সাহেব, কাঙ্গালি দেওয়ান, সিলিমপুরের বড খাঁ গাজী, রাইগ্রামের দরবেশ গোরাচাঁদ সাহেব, মঙ্গলকোটের পীর পাঞ্জাতন ও দানেশমন্দ ইত্যাদি। বর্ধমানের রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত খকড়র সাহেব হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় কর্তৃক এখনও পূজিত হন। বোহার ছিল মুসলমান সংস্কৃতির একটী

প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। আবাসিক শিক্ষা নিকেতন ভিন্নও এখানে ছিল আরবী ও ফারসী সাহিত্যের একটী গ্রন্থালয়। কুসুম গ্রাম, চৌঘরিয়া, চুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান মুসলমান আয়মাদারগণের প্রভাব-কেন্দ্র হইয়া উঠে।

মুসলমান পীরগণ যে হিন্দু সম্প্রদায়েরও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়া ওঠেন, তাহার নিদর্শন সত্য-নারায়ণ। মুসলমান সত্য-পীরের হিন্দু সংস্করণ হইলেন সত্য-নারায়ণ। সত্য-নারায়ণের পূজা হইতে তাঁহার পাঁচালির সৃষ্টি। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল মনে হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-মঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার রচনার প্রারম্ভে হিন্দু দেবদেবীগণের সহিত মুসলমান পীর ও গাজীর বন্দনা গাহিয়াছেন :

"মান্দারণ গড়ে বন্দি পীর ইস্‌মাইলি।
পীর ইস্‌মাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।
বন্দিব বড় খাঁ গাজী রিসিবাটী গাঁ
নিজবাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ।
ত্রিপর্ণির ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী
তাঁহার মোকামে বন্দো ষোলশত কাজী।
পীর ও পাথাম্বর বন্দো আছে যতগুলি
মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীর ইস্‌মাইলি।"

তৃতীয় অধ্যায়

চৈতন্যোত্তর-যুগ

চৈতন্য-যুগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তৎকালীন ও পরবর্তী সমাজ, সাহিত্য ও লোক ধর্মের উপর প্রতিফলিত হইলেও সনাতন প্রতিভা ম্লান করে নাই। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অপর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন কনাদ ভট্টাচার্য্য—চৈতন্য যুগেরই লোক। তাঁহার বাসস্থান ছিল জৌগ্রাম এবং তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে বিদ্যার্থীগণ সমবেত হইতেন। সমুদ্রগড়ের রমানাথ ছিলেন আর একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তাঁহার সরলতা, পাণ্ডিত্য ও ত্যাগ-ব্রত ছিল অনন্যসাধারণ। লোকসমাজের বাহিরে থাকিয়া একান্ত-চিত্তে বিদ্যাচর্চায় মগ্ন থাকিতেন বলিয়া তাঁহার পরিচয় ছিল "বুনো রমানাথ" নামে। কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে আমরা এইরূপ আরও বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিতের সন্ধান পাই। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঘুনন্দন গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গুরুচরণ তর্ক-পঞ্চানন, কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি। রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা বিদুষীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বর্ধমানের সনাতন প্রতিভা

দেশের সংস্কৃতির উপর ও পরবর্তী কালের সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির উপর বৈষ্ণব ধর্ম যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কাশিরাম দাসের মহাভারতে। কাশিরাম যে বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ:

এই যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব

কাশিরাম দাস

"পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশিরাম দাস
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।"

কাশিরাম দাসের আদি নিবাস ছিল কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি। তিনি তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন:

"ইন্দ্রানি নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম·· ···"

কোনও অনিবার্য্য কারণে কাশিরাম দেশত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার আউস্গড়ের রাজার আশ্রয়ে আসিয়া শিক্ষকতা করেন। রাজবাড়ীতে মহাভারতের কথকতা হইত, প্রতিদিন তাহা শুনিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার মহাভারত রচনা করেন। বৈষ্ণবযুগের ভাব ও ভাষা বৈষ্ণব-ধর্ম বহির্ভূত কাব্যকেও স্পর্শ করে। বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে শাক্ত আখ্যানমূলক কাব্যগুলিতেও বৈষ্ণব গীতি-কাব্যের প্রভাব অনুভূত হয় ও ইহার ফলে সৃষ্ট হয় শাক্ত পদাবলি। শাক্ত পদাবলির দুই ধারা; একটিতে চণ্ডী কন্যারূপিনী উমাতে পরিণত হইয়াছেন এবং অপরটিতে তিনি হইয়াছেন মাতৃরূপিনী কালিকা। প্রথমটি আগমনী গান ও দ্বিতীয় শ্যামাসঙ্গীত। ভয় কিম্বা ভক্তি-মিশ্রিত ভয় দেবতার সহিত সেবকের যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়া প্রেমের সম্পর্ক, আত্ম-সম্পর্ক স্থাপিত হইল। শাক্ত পদাবলির আদি রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না, তবে রাম-প্রসাদের ন্যায় বর্ধমানের কমলাকান্তও যে ইহাকে অভূতপূর্ব রূপ দিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাক্ত পদাবলী

কমলাকান্ত

কমলাকান্ত ছিলেন একাধারে কবি, সাধক ও ভাবুক। তাঁহার নিবাস ছিল অম্বিকা কালনা কিন্তু সাধনার ক্ষেত্র ছিল বর্ধমান। মহারাজা তেজচন্দ্র ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক। কমলাকান্ত বহু আগমনী গান রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতই হইতেছে উচ্চাঙ্গের ও উদার আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচায়ক। শক্তিস্বরূপা শ্যামাই পরম ব্রহ্ম; তিনি সগুণা আবার নির্গুণা; কখনও বা শূন্যরূপা, আবার কখনও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। শ্যামা ও কৃষ্ণ একই—কোনই ভেদ নাই।

"জাননারে মন পরম কারণ—
শ্যামা শুধুই মেয়ে নয়;
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখনো কখনো পুরুষ হয়।"

আবার পরম সম্পদ্ ভগবান দূরে নাই, হৃদয়েই আছেন। হৃদয়ের অন্তস্তলেই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। তখন—

"পরম ধন এই পরশমণি
যা চাহ তা দিতে পারে
কত রতন পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

নবাই ময়রা

ধর্ম সম্বন্ধীয় এই উদার দৃষ্টি ও সমন্বয় এ সময়ের বহু কবির গীতিতে প্রচার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাই ময়রা। নবাই ছিলেন শাক্ত কিন্তু তাঁহার শক্তি ও বৈষ্ণবের কৃষ্ণের ভিতর কোনও পার্থক্য নাই। নবাই গাহিয়াছেন:

"হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
(একবার) হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।"

পাঁচালি ও পাঁচালি গান

বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণব সমাজ বহির্ভূত তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা হইতে উদ্ভূত হয় সর্ত্য-নারায়ণের পূজা ও পাঁচালি। সত্যনারায়ণের পাঁচালির অনুরূপ বহু কবি বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচালি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন দাশরথী বায়। দাশরথী রায় কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পাঁচালি এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। পাঁচালির বহু গীত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচায়ক। দাশরথী বায় ছিলেন একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব। তিনি একদিকে যেমন গাহিয়াছেন

দাশরথী রায়

"হৃদি কমলাসনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্ত প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।"

অন্যদিকে আবার গাহিয়াছেন

"দোষ কারও নয় গো মা
(আমি) স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

পাঁচালিতে সাধারণতঃ থাকিত রামায়ণ, ভাগবত, পুরাণ কাহিনী। পরে ইহাতে সমাজরীতির সমালোচনাও প্রবেশ করে।

যাত্রাগান

আনন্দদানের সহিত সাধারণের মনে ধর্মভাব সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে যাত্রা গানের প্রচলন পূর্বেও ছিল। চৈতন্যের পূর্বে এ দেশে যে নাট্য-গীতির প্রচলন ছিল তাহার বিষয়বস্তু ছিল শিবশক্তির মাহাত্ম্য অথবা

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। চৈতন্য-যুগের পর ইহার সহিত যোগ হয় কৃষ্ণলীলা। এই সব নাট্যগীত প্রথমে ছিল সঙ্গীত-প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার রূপান্তর হয়। ক্রমে বাঁধা পালা রচিত হয় ও বহুলোক যাত্রার দল বাঁধিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

কোম্পানির আমলের প্রাক্‌-কালে বর্ধমান

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমান ছিল শস্য, শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। বর্ধমানের রেশম ও কার্পাস শিল্প দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মানকরে সূক্ষ্ম রেশমের চেলি তৈয়ার হইত, তাহার চাহিদা ছিল প্রচুর। দাঁইহাটের ধুতি ও শাড়ী যথেষ্ট সমাদৃত হইত। কাঞ্চননগরে চমৎকার ছুরী ও কাঁচি প্রস্তুত হইত। কামারপাড়ার তরবারি বিখ্যাত ছিল। কাঞ্চননগর ও কামারপাড়ার স্বর্ণ, রৌপ্য শিল্পও বিখ্যাত ছিল। দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণের জন্য বহু ভাস্কর ছিল এবং ভাস্করপ্রধান গ্রামগুলির মধ্যে পাতুন ও দাঁইহাট ছিল অন্যতম। করজোনা, সাঁকো, উজানি, কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি স্থান ছিল ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন প্রথম কুঠি স্থাপন করেন, তখন বাণিজ্য ও শিল্পপ্রধান স্থানগুলি এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয়। কোম্পানির নিকট বর্ধমান তখন

> "বিস্তীর্ণ, সুসংবদ্ধ, উর্বর জমিদারি, নানা জাতীয়
> শস্য, রেশম, তুলা ও ইক্ষুতে সমৃদ্ধ।"

বরগির হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বর্ধমান দুইটী উল্লেখযোগ্য বিপর্য্যয় দ্বারা অভিভূত হয়,—বরগির হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ইহাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বরগির হাঙ্গামায় বহু সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল বিনষ্ট হয়, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়; গঙ্গারাম দত্ত তাঁহার মহারাষ্ট্র পুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাব উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। বরগির হাঙ্গামার ফলে নানা শ্রেণীর বহু পরিবার বর্ধমান ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর অপর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন কলিকাতা সুদৃঢ় করিতেছিলেন, বহু পরিবার তথায় আশ্রয় লইয়া নূতন সমাজ-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। কৃষির দিক দিয়া যে গুরুতর ক্ষতি হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করে।

কোম্পানির শাসন প্রবর্তনের প্রথম প্রতিক্রিয়া বর্ধমানের পক্ষে

কোম্পানির শাসনের প্রতিক্রিয়া

কল্যাণকর হয় নাই। কোম্পানির এক চেটিয়া ব্যবসায় ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যানচেষ্টর ও শেফিল্ডজাত পণ্য দ্রব্য এ দেশে প্রচলন, বংশ পরম্পরানুসৃত বহু শিল্পকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়। বলপ্রয়োগে নীলচাষ প্রচলন কৃষক ও কৃষির অনিষ্ট সাধন করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধানানুযায়ী জমিদার-শ্রেণী আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কর্মহীন হইয়া পড়িল বহু সহস্র নিম্নশ্রেণী যাহারা ইতিপূর্বে জমিদারের পাইক বা সৈন্যবাহিনীভুক্ত ছিল। এই শ্রেণী উপায়ান্তর না থাকায় দস্যুদলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় ও বহুকাল যাবৎ জনসাধারণের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কোম্পানির কর্মচারিগণ ভূমিরাজস্ব বিষয়ে শাসন পরিচালনায় ছিলেন অজ্ঞ, অথচ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া বাধার সৃষ্টি করিতেন, পুলবন্দি বিষয়ক দায়িত্ব হইতে জমিদারকে অব্যাহতি দিলেন অথচ এ সম্বন্ধে হইলেন উদাসীন আর ইহার ফলে দামোদর প্রমুখ নদনদী হইয়া দাঁড়াইল বিধাতার অভিশাপ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কৃষককুলের স্বার্থহানির আরও অবনতি হয়, আর ইহার কারণ হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদার-শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে

নূতন অভিজাত সম্প্রদায় ও কৃষ্টি

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তৎপরসৃষ্ট পত্তনি প্রভৃতি বিধান ও তৎসম্পর্কীয় আইন ও বিধিব্যবস্থা অভিজাত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন সাধন করিল তাহাতে শিল্প ও ব্যবসায় অপেক্ষা ভূসম্পত্তি অর্জন ও ইহাতে অর্থলগ্নি করা অধিকতর নিরাপদ ও লাভজনক বলিয়া গণিত হইল। স্বল্পায়াস অথবা বিনায়াস-লব্ধ ভূ-সম্পত্তির সম্প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তদ্‌জনিত সমৃদ্ধি অবিরোধে উপভোগ করা হইল তাঁহাদের ধর্ম। প্রশাসন বিষয়ে তাঁহারা হইলেন স্বৈরাচারী কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে তাঁহারা ছিলেন গুণগ্রাহী। এ বিষয়ে বর্ধমানের রাজপরিবারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই রাজ-পরিবার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে মহারাজা কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।"

ইহার কারণ কীর্তিচন্দ্র কবির প্রতিপালক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। কমলাকান্তও এই রাজপরিবারের শ্রদ্ধা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বহু ভাবুক ও পণ্ডিত তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মহারাজা মহতাব চাঁদ বহু প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া পণ্ডিত সমাজের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন। এই শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষণের পক্ষে প্রভূত সাহায্য করেন। বর্ধমান সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ্ সঙ্গীত, যাত্রা গান, পাঁচালি প্রভৃতি ইহাদের পোষকতায় শ্রীলাভ করে এবং এই যুগে আমরা যে সকল শিল্পীর সাক্ষাৎ পাই তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দাশরথী রায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ রায় ও নবাই ময়রা। দাশরথী রায়ের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। নীলাম্বর মেমারী থানার দেবীপুরের অদূরবর্তী আলিপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় চারিশত সঙ্গীত রচনা করেন। নবাই ময়রা ছিলেন মন্তেশ্বরের লোক; প্রথম জীবনে করিতেন ময়রার কাজ, পরে চণ্ডী গানের দল করেন। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত ছিল বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। নীলকণ্ঠ বৈষ্ণব-সঙ্গীত রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত মনোরম, হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয়। এই সব শিল্পীর রচিত গীত এখনও পল্লী অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে নিজেরাই ছিলেন শিল্পী; এ সম্বন্ধে চুপিব দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত কবি ও সঙ্গীত-শিল্পী ছাড়াও আমরা সাক্ষাৎ পাই গোবিন্দ অধিকারী, মতি রায়, পীতাম্বর অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালা কবিদের। তাঁহাদের বচনামান কেবল বর্ধমানবাসীকে নহে, সমগ্র বাংলাদেশকে মুগ্ধ কবিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে ও সাধারণের প্রাণ ধর্মভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া মিশনবী প্রচলিত খৃষ্টধর্মের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

এই অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে গড়িয়া উঠিল নবীন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী। এই শ্রেণী কায়িক কৃষিকার্য না কবিয়াও ভূমির সহিত সংযুক্ত থাকিলেন। মাত্র বর্ধমান নহে, সমগ্র দেশের বহুমুখী উন্নতি সাধনের প্রয়াসে এই শ্রেণীর প্রতিভা ও দান অবিস্মরণীয়। ইহাদের মধ্যে

আছেন রাসবিহারী বসুর ন্যায় বিপ্লবী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ মিশ্র, যোগেন্দ্রনাথ বসু, লালবিহারী দে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী, ভাবুক, সাহিত্যিক, সমাজ-সেবী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক দরদি কবি। এই সব সাহিত্যিক ও কবির লেখনী দ্বারা শুধু যে বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে তাহা নহে, দেশাত্মবোধ-জাগরণও অদ্ভুত প্রেরণা পাইয়াছে।

বর্ধমান পরিচিতি

দ্বিতীয় ভাগ

"কথা"

প্রথম পর্ব

প্রকৃতি পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ভূপৃষ্ঠের গঠন ও প্রকৃতি

ভূপৃষ্ঠের গঠন, উৎপত্তি ও আকৃতি অনুসারে বর্ধমানকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চল। সমগ্র আসানসোল মহকুমা ও বর্ধমান মহকুমার পশ্চিমাংশ হইল পশ্চিম অঞ্চল, আর জিলার অবশিষ্ট ভূভাগ পূর্ব অঞ্চল। পশ্চিম অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ উন্নত-নত। ছোটনাগপুর মালভূমির দূরবিক্ষিপ্ত শৈলশ্রেণী হইতে এই অঞ্চলের উৎপত্তি। ভূমি কাঁকর অথবা লাল রঙের বালুকা মিশ্রিত। কোথায়ও বা নিম্নস্থ শিলা হইতে মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলের যে স্থানে কয়লার খনি দেখা যায় সেখানে গণ্ডোয়ানা শিলা (Gondwana rocks) বর্তমান। ভূ-পৃষ্ঠের উপরি ভাগ কর্কশ প্রস্তর মিশ্রিত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কখনও বা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমতল ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে আবার পরেই উন্নত হইয়া নাতিবৃহৎ পাহাড় অথবা টিলার আকার ধারন করিয়াছে। দুই পার্শ্বের উন্নত ভূমির মধ্যস্থিত অপেক্ষাকৃত সমতল ভূখণ্ড কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠের ঢালের দিকে কৃত্রিম উপায়ে স্তর সৃষ্টি করিয়াও ভূমি কৃষিযোগ্য করা হয়। দুই শ্রেণী উন্নত ভূস্তরের মধ্যের নিম্নতম ভূমিকে বলা হয় সোল, এখানে ধান জন্মে। তাহার উপরের কৃষিযোগ্য জমিকে বলা হয় কানালি, এখানেও ধান জন্মে। কালানির উপরের স্তরের জমিকে বলা হয় বাইদ অথবা ডাঙ্গা। এখানে আক ও অন্যান্য রবিশস্য চাষ হয়। কানালি ও বাইদ জমিতে শস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জল সঞ্চয় প্রয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ইহাদের নিম্নভাগে মোটা আইল বা বাঁধ নির্মিত হয়। কৃষির জন্য কৃষককে বৃষ্টির উপর নিভর করিতে হয় কিন্তু বাইদ জমিতে জল সেচনেরও প্রয়োজন হয়।

পশ্চিম অঞ্চল

সোল কানালি, বাইদ

অরণ্য

পশ্চিম অঞ্চলের যে স্থানে ভূপৃষ্ঠ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে সেখানে পূর্বে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি বর্তমান থাকিয়া অরণ্যের সৃষ্টি করিত। এই অরণ্য এখন লুপ্তপ্রায় কিন্তু দুর্গাপুরের সন্নিকট ও কাঁকসা, ফরিদপুর এবং আউশগ্রাম থানায় ইহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। এখনও এই অঞ্চলে অজস্র পলাশ ও ক্ষুদ্রকায় শালগাছ পুরাতন অরণ্যের স্মৃতি বহন

করে। বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে যদৃচ্ছ ভাবে এই অরণ্যের উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

পূর্ব অঞ্চল

দামোদর ও অজয় নদ-বাহিত ছোটনাগপুর মালভূমির মিশ্রিত মৃত্তিকা পূর্ব অঞ্চলের পশ্চিম ভাগ সৃষ্টি করিয়াছে; মাটির বর্ণ রক্তাভ, ইহাতে কাঁকরের আধিক্য দেখা যায়। ভাগীরথী প্রবাহিত পলিমাটি সৃষ্টি করিয়াছে পূর্ব ভাগ। ইহার মাটি কোথায়ও বা অতি সহজেই কর্দমে পরিণত হয়, আবার কোথায়ও বা পলি মিশ্রিত। এই ভূ-ভাগ একটি বিরাট উর্বর সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব-দক্ষিণে ঢালু। দামোদর নদের খাল বা ক্যানাল সমষ্টি ইহার মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া এই ভূভাগকে অধিকতর উর্বর ও শস্য শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। প্রধান শস্য ধান; ধান-চাষের উপযুক্ত জমির নাম শালি, কৃষি-উপযোগী ভূমির মধ্যে নিম্নতম। শালি জমির উপরিস্তরের জমিকে বলা হয় শুনা, ইহাতে ধান, পাট, মেস্তা প্রভৃতি জন্মে। গ্রাম সন্নিকট দোঁয়াস্ মাটিতে জন্মে আক, আলু ও নানারূপ রবিশস্য। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য শালি ও শুনা জমিতে আইল বা নিম্ন বাঁধের প্রয়োজন হয়। দামোদর ও ভাগীরথী সংলগ্ন চর জমিতে নানা প্রকার রবিশস্য জন্মে।

শালি, শুনা, দো

পশ্চিম অঞ্চলের মৃত্তিকায় কাঁকর ও শিলা সমূহের প্রাচুর্য্য। মধ্য-ভারতের উত্তপ্ত পশ্চিম বাতাস এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপ মাত্রা সৃষ্টি করে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের দিনের তাপ সাধারণতঃ ৭৬ হইতে ৮০ ডিগ্রির মধ্যে থাকে। তারপর তাপ মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া মে মাসের শেষ ভাগে অতিশয় তীব্র হয়। ১১৫ডিগ্রি, কখনও বা ইহার উপরে ওঠে। ইং ১৮৮৯ সালের মে মাসে সর্বাধিক উচ্চ তাপ অনুভূত হইয়াছিল। ইহা ছিল ১১৮·৭ ডিগ্রি। কালবৈশাখী বা সাময়িক বৃষ্টিপাতে এই উত্তাপ নিম্নগামী হয়। বর্ষা আরম্ভ হইবার পর উত্তাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে ও ইহার পর অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত গড় দৈনিক তাপ হয় সাধারণতঃ ৯০ ডিগ্রি। রাত্রির উত্তাপ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ৪৫ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামে, মে ও জুন মাসে ইহা হয় গড়ে ৭৯ ডিগ্রি এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এই ভাবেই থাকে। তারপর হয় ইহার নিম্নগতি। পূর্ব অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রাখর্য্য পশ্চিম অঞ্চল হইতে কম, ভাগীরথী সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও কম। কিন্তু গ্রীষ্মকালে

জলবায়ু

শুষ্ক উত্তপ্ত পশ্চিম বাতাস বর্ধমান শহর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। বর্ষাকালের আবহাওয়া অনেকাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় হইলেও পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টিপাতেব তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিম অঞ্চলের শুষ্ক জলবায়ু পূর্ব অঞ্চল হইতে স্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নদ, নদী ও অরণ্য

নদ-নদী

নদ-নদীর ভিতর প্রধান হইতেছে দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী। ক্ষুদ্রকায়া কয়েকটি নদীও আছে, যেমন খুনিয়া, সিঙ্গারণ, তামলা, কুমুর, বাঁকা, খড়ি ইত্যাদি। এগুলি প্রধানতঃ উপরের নদ-নদীর উপনদী।

ভাগীরথী

নদ-নদীর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভাগীরথী। ভাগীরথী মাত্র যে, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে তাহা নহে, ইহার সমগ্র প্রবাহই পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়।

প্রাচীনকালে ভাগীরথীই ছিল গঙ্গানদীর মূল প্রবাহ। রাজমহল পাহাড়-শ্রেণী অতিক্রম করার পর গঙ্গাস্রোত কঠিন শিলারাশিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম ভূভাগে প্রসারিত হইতে পারে নাই। ফলে সন্নিকট নিম্নভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ গতিতে সাগরে পড়ে। এই প্রবাহই আদিম গঙ্গা-প্রবাহ। এই প্রবাহ ও তৎসংলগ্ন নিম্নভূমি ক্রমশঃ ভরাট হয়, গঙ্গাও ক্রমাগত পূর্ব ভাগের নিম্নভূমির দিকে গতি পরিবর্তন করে এবং এইভাবে শিলাময় মালভূমির উপকণ্ঠ হইতে পূর্বে আরও পূর্বে সরিয়া যায়। বর্তমান ভাগীরথী এখন প্রাচীন গঙ্গার একটি ক্ষীণ-প্রবাহ। ভাগীরথী পূর্বের ন্যায় এখন ভূমি সৃষ্টি করিতে পারে না বটে কিন্তু এখনও পূণ্য তিথিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী পাপ স্খালন করিবার জন্য ইহার অসংখ্য ঘাটে সমবেত হয়। পশ্চিম তীরের নবদ্বীপ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান ছাড়িয়া দিলে ভাগীরথীই মুখ্যতঃ বর্ধমানের পূর্ব সীমা। পলাশি রণক্ষেত্রের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথী এই জিলায় প্রবেশ করিয়াছে; তারপর কাটোয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী হইয়া অজয় নদের জলধারাকে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পর অত্যন্ত কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপের কিছু উপরে নদীয়া জিলায় প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তারপরই আবার শান্তিপুর পর্য্যন্ত নদীয়া জিলাকে বর্ধমান হইতে পৃথক করিয়াছে। কালনার কিছু উপরে সমুদ্রগড়ে খড়িনদীর জলধারা ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী

প্রবাহিত পলিমাটি নূতন নূতন ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগীরথী প্রবাহেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে বহু এবং পরিত্যক্ত গতির সাক্ষ্যস্বরূপ বহু বদ্ধ-জলস্রোত ও বিল বর্তমান প্রবাহের সহিত সমান্তরাল হইয়া বিদ্যমান।

দামোদর

প্রাচীন ধর্ম-কাব্যে দামোদরকে বলা হইয়াছে আদ্যের গঙ্গা বা সত্যের গঙ্গা।

প্রখ্যাত ইন্‌জিনিয়ার উইলিয়ম উইলকক্‌স্ (William Willcocks) প্রভৃতি বহু মনীষীর মত যে, গঙ্গার প্রবাহ দামোদর, অজয় প্রভৃতি পার্বত্য নদের প্রবাহ হইতে অপেক্ষাকৃত নবীন। সুদূর অতীতে এই সকল নদ পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে সোজা সাগরে পড়িত। নিম্ন-বাংলায় ইহাদের মোহনায় বহু ডেল্‌টা বা "ব"" দ্বীপের সৃষ্টি হয়। বহুযুগ পর যখন গঙ্গাপ্রবাহের আবির্ভাব হয়, তখন গঙ্গা বাংলার সমতল-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দামোদর-অজয়ের কঠিন ও উচ্চ "ব" দ্বীপ অঞ্চলে বাধা প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে ইহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে "ব" দ্বীপ হয় খণ্ডিত এবং দামোদর-অজয় প্রমুখ নদ হয় গঙ্গার উপনদ।

এই তথ্যের সত্যতা যাহাই হউক না কেন, ইহা স্বীকার্য্য যে দামোদর নদ অতি প্রাচীন। ভাগীরথীর ন্যায় দামোদরও এক সময় পূত সলিল বলিয়া গণ্য হইত। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীর নিকট ইহা এখনও পবিত্র। এই বিশাল নদের উৎস হাজারিবাগ জিলার পাহাড়-শ্রেণী। উৎপত্তিস্থল হইতে ইহা পূর্ব-গতিতে প্রবাহিত হইয়া ছোটনাগপুর মালভূমির এক বিস্তীর্ণ ভাগ ধৌত করিয়াছে ও দিশের-গড়ের নিকট বরাকর নদের সহিত মিশিয়াছে। তারপর প্রায় ৪৫ মাইল যাবৎ পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে প্রবাহিত হইয়া বর্ধমান জিলাকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জিলা হইতে পৃথক করিয়াছে। খণ্ডঘোষের নিকট দামোদর একেবারে বর্ধমানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তারপর কিছুদূর প্রবাহিত হইয়া বর্ধমান শহরের নিম্নে হঠাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে এবং এইভাবে জিলার ভিতর কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া জামালপুর থানার মোহনপুরের নিকট হুগলি জিলায় প্রবেশ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগে দামোদরের গতিপথের বহু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।

ডি. ব্যারোস (De Barros) সাহেব ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায় যে মানচিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে দামোদরের যে গতি-পথ দেখান হইয়াছে তাহা হইতেছে বর্তমান শীর্ণা কানানদীর প্রবাহ। সেলিমাবাদ হইতে বাহির হইয়া এই প্রবাহ উলুবেড়িয়ার নিকট হুগলি অর্থাৎ গঙ্গা নদীতে পড়িত। ইং ১৬৬০ সালের ভ্যানডিন ব্রুস (Vandeen Bruche) নামক অপর একজন য়ুরোপীয় সাহেবের মানচিত্রে দেখা যায় যে, দামোদরের একটী প্রধান স্রোতধারা বর্ধমান শহর হইতে পূর্বগতিতে কালনার নিকট ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। এই ধারাই বর্তমান গাঙ্গুর-বেহুলার খাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল লক্ষীন্দরের শবদেহ লইয়া বেহুলার যে যাত্রাপথ ইঙ্গিত করে তাহা গাঙ্গুরের এই পুবাতন প্রবাহ। তারপর দামোদর এই প্রবাহ পরিত্যাগ করে ও বর্ধমান শহরের নিম্ন হইতে পূর্বগতিতে হুগলি জিলার নও-সেরাইয়েব নিকট ভাগীরথীতে পড়ে। ইহা হইল বর্তমান কুন্তি নদীর খাত। ইং ১৭৭৬ সালেব রেনেল (Major Rennel) সাহেবের মানচিত্রে এই প্রবাহকে দামোদবের পুরাতন পরিত্যক্ত খাত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই মানচিত্রে দেখা যায় যে দামোদরের মূল প্রবাহ ফলতাব নিকট গঙ্গায় পডিয়াছে। বধমান শহরের মধ্য দিয়া যে বাঁকা নদী প্রবাহিত, ইহাও দামোদরের একটী পরিত্যক্ত প্রবাহ। বাঁকা, গাঙ্গুর, বেহুলা প্রভৃতি বর্তমান শীর্ণ ও লুপ্তপ্রায় নদী দামোদরের গতিপথ পরিবর্তনেব পরও বহুকাল ধরিয়া ইহার প্লাবন বহন করিত। দামোদবের শেষ উল্লেখযোগ্য গতি পরিবর্তন হয় ইং ১৯৪৩ সালের বন্যায়। তখন দামোদর জামালপুরের নিম্নে পূর্বপ্রবাহ ত্যাগ করে ও পুরাতন একটী পবিত্যক্ত প্রবাহ অনুসরণ কবিয়া দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এই প্রবাহ সাধারণের নিকট "বেগোর হানা" নামে পরিচিত।

মাইথন, পাচেট প্রভৃতি বাঁধ নির্মাণের পূর্বে শীত বর্ষায় দামোদর বিপরীত রূপ ধারণ করিত। শীতকালে দামোদর হইত কুঞ্চিত ও ক্ষীণস্রোত, যেন বিস্তীর্ণ বালুকা শয্যায় একটী বিরাট দানব নিদ্রামগ্ন কিন্তু বর্ষায় দামোদর ধরিত অন্যরূপ। তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত বিশাল, জলরাশি অবাধ ভীম গতিতে ধাবিত হইয়া দুই তীর প্লাবিত করিত ও

নিম্নভাগের গ্রাম ও জনপদ গ্রাস করিয়া অশেষ দুর্দশার সৃষ্টি করিত। এইজন্য দামোদরকে "বাংলার অভিশাপ" (Sorrows of Bengal) আখ্যা পায়। দামোদরের এই ধ্বংসাত্মক লীলা কথায় দাঁড়াইয়াছে—

"ওরে মোর দামোদর
তোরে লয়ে আতান্তর।"

বর্তমানে দামোদর প্রবাহের উপরিভাগে কয়েকটি ড্যাম বা বিশাল বাঁধ নির্মিত হইবার পর বর্ষার দামোদরকে কিছু পরিমাণে বশীভূত করা হইয়াছে। দুর্গাপুরে যে ব্যারাজ নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা দামোদরের উদ্‌বৃত্ত জলকে সেচন ও জলপথের উদ্দেশ্যে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

অজয়

অজয় নদের উৎপত্তিস্থল জশিডির পশ্চিমে মুঙ্গের জিলার জামুই মহকুমার পাহাড়। উৎপত্তিস্থল হইতে নির্গত হইয়া ইহা দক্ষিণ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে ও চিত্তরঞ্জনের নিকট বধমান জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। তারপর ইহা সোজা পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বর্ধমানকে বীরভূম জিলা হইতে পৃথক করিয়াছে। কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার প্রান্তে অজয় বর্ধমান জিলার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে ও পরে কাটোয়া শহরের উপকণ্ঠে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। দামোদরের ন্যায় অজয়ও পার্বত্য নদ। ইহাতেও সাময়িক জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা উপস্থিত হইয়া বহুব্যাপী ক্ষতি সাধন করে। পূর্বে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারা অজয়ের উদ্‌বৃত্ত জলপ্লাবন বহন করিত, বর্তমানে সেগুলি লুপ্ত কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যস্বরূপ আছে বহু "কাঁদর" বা বদ্ধ জলস্রোত।

দামোদর ও অজয় এক সময় বহুদূর পর্যন্ত নৌ-চলাচলের উপযুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লাবাহী নৌকা কলিকাতায় যাতায়াত করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউ বীরভূম কোল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা আরস্কিন (Erskine) পরিবারের কুঠি ছিল অজয় তীরে ইলামবাজার। ইলামবাজার কুঠি হইতে নীল, কয়লা ও অন্যান্য মালপত্র নৌকাযোগে কলিকাতায় পাঠান হইত। বর্তমানে নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে দুই নদই একরূপ অনুপযোগী। অববাহিকা অঞ্চলে নির্বিবাদে বনরাজির যথেচ্ছ ধ্বংসই ইহার একটি মূল কারণ। বনরাজির ধ্বংস সাধন মাত্র নৌ-বাণিজ্যের

পক্ষেই ক্ষতিকর হয় নাই; পূর্বে বৃষ্টির জলরাশি এই বন সমূহের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া কোনও অতর্কিত জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার সৃষ্টি করিতে দিত না, কিন্তু বর্তমানে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। আবার এই দুই নদের চিরন্তন প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় নিম্নে ভাগীরথী বা গঙ্গা-বক্ষে পলি জমিতেছে ও রূপনারায়ণ মুখে বালুকা চড়ার সৃষ্টি হইতেছে।

নুনিয়া

নুনিয়া একটি ছোট নদী। ইহার জন্ম সাঁওতাল পরগণায়। জিলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে নুনিয়া আসানসোল মহকুমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং সীতারামপুর ও আসানসোলের উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাণীগঞ্জের নিকট দামোদরে পড়িয়াছে। নুনিয়ার উভয় পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ কয়লা ক্ষেত্র ও শিল্পাঞ্চল।

সিঙ্গারণ

আসানসোল মহকুমার ইকরা রেল স্টেশনের কিছু উত্তরে সিঙ্গারণের উৎপত্তি। ইহাও একটি ক্ষুদ্র জলধারা। উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সিঙ্গারণ অণ্ডালের নিম্নে দামোদরে মিশিয়াছে। ইহারও উভয় পার্শ্বে শিল্পাঞ্চল।

তামলা

আসানসোল মহকুমার আর একটি ছোট নদী হইতেছে তামলা। উৎপত্তিস্থান উখরার কিছু পশ্চিমে। তারপর ইহা পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে দামোদরে পড়িয়াছে। এই নদীর গতিপথও শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া।

এই তিনটি নদী জলনিকাশি স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রীষ্মকালে তিনটিই শুকাইয়া যায়।

খড়ি

খড়ি নদীর উৎপত্তি বর্ধমান সদর মহকুমার মানকরের নিকট। উৎপত্তি স্থান হইতে গলসি ও ভাতার থানার মধ্য দিয়া প্রায় ৩০ মাইল অতিক্রম করার পর খড়ি মন্তেশ্বরের কিছু উপরে কালনা মহকুমায় প্রবেশ করিয়াছে ও তারপর অত্যন্ত বক্র-গতিতে প্রবাহিত হইয়া নাদনঘাটের কিছু নিম্নে বাঁকা নদীর জলধারা গ্রহণ করিয়াছে। সমুদ্রগড়ের নিকট খড়ি ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। ভাগীরথী হইতে নাদনঘাট পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই খড়ি নৌকা চলাচলের পক্ষে উপযোগী। বর্ষাকালে বৃহদাকারের মালবাহী নৌকা ভাতার পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে।

বাঁকা

বাঁকার উৎপত্তিস্থান গলসি থানার অন্তর্গত সিল্লা, দামোদর

প্রবাহের সন্নিকট। উৎপত্তিস্থান হইতে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত বাঁকার গতিপথ সোজা পূর্বমুখী, দামোদরের সহিত সমান্তরাল। বর্ধমান শহর অতিক্রম করার পর শক্তিগড় পর্য্যন্ত বাঁকা পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী; তারপর উত্তর পূর্বমুখী গতিতে প্রবাহিত হইয়া নাদনঘাটের নিকট খড়ির সহিত মিশিয়াছে। বাঁকা যে দামোদরের একটি প্রাচীন প্রবাহ একথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

কুনুর

আসানসোল মহকুমার কাঁকসা থানার বনরাজি কুনুরের জন্মস্থান। উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় ৫০ মাইল পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া, আউশগ্রাম ও গুসকরাকে পার্শ্বে রাখিয়া কুনুর মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামে অজয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। যদিও কুনুর একটি অপরিসর স্রোতধারা, বর্ষায় ইহাতে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। তখন কুনুরের জলরাশি দুই কুল প্লাবিত করিয়া নদীতীরস্থ গ্রামগুলির অনিষ্ট সাধন করে।

আরও কয়েকটি ছোট নদী এই জিলায় আছে—ব্রহ্মাণী, বাবলা, গাঙ্গুর, বেহুলা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে গাঙ্গুর ও বেহুলার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

অরণ্য

অতি প্রাচীনকালে বর্ধমানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে অরণ্যাবৃত ছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগেও এই অরণ্যের পরিচয় মেলে। মোগল সেনাপতি মানসিংহ যখন বর্ধমান অভিযান করেন, তখন তাঁহাকে বিশাল অরণ্য-ভূমি অতিক্রম করিতে হয়; আবার মারাঠাগণ যখন বর্ধমান আক্রমণ করে, তাহাদেরও বিস্তীর্ণ অরণ্যের সম্মুখীন হইতে হয়। এই অরণ্য ছিল শাল, হরিতকি, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন; আর ইহাতে বাস করিত বরাহ, বাঘ প্রভৃতি জন্তু। বর্তমানে বরাবনি, বন নবগ্রাম, বনবিষ্ণুপুর, বনপাশ প্রভৃতি নাম এই অতীত অরণ্যের স্মৃতি বহন করে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও কাঁকসা ও আউশগ্রাম থানার অংশ-বিশেষ জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল।

কালক্রমে এই অরণ্য লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। বিগত ইং ১৯২৭-৩৪ সালের জিলা-জরিপে এই অরণ্যের আয়তন নিরূপিত হয় প্রায় ৪৬হাজার একর; বর্তমান আয়তন মাত্র কয়েক হাজার একর। কৃষির বিস্তার,

জ্বালানি কাঠ আহরণ ও বাহিরে প্রেরণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি প্রয়োজন মিটাইতে প্রথমতঃ অরণ্যকুল যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করা হয়। তারপর নূতন নূতন শিল্প প্রসার, রেলপথের সম্প্রসার ও বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বিমানক্ষেত্র ও সামরিক কেন্দ্র স্থাপন ও অন্যান্য সামরিক উদ্দেশ্যে বহু বনভূমি লুপ্ত হয়। ইহার উপর আসিল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ এবং ইহার ফলে দুর্গাপুরের প্রাচীন বনভূমি হইয়াছে লুপ্তপ্রায়। বনভূমির অবলোপ বর্ধমানকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; বন্যার প্রকোপের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আবার পশ্চিমের উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ জিলায় সর্বত্র প্রসারিত হওয়ার বাধা অপসারিত হইয়াছে। বনভূমির এই ধ্বংস নিবারণ করিবার কোন ব্যবস্থাই ইং ১৯৪৯ সালের পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ বে-সরকারী অরণ্য রক্ষা আইন প্রবর্তিত হয় এবং তাহাতে লুপ্তপ্রায় বনরাজির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্দিষ্ট হয়। ইং ১৯৫৪ সালের জমিদারি গ্রহণ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে যাবতীয় বনভূমি এখন সরকারের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। অরণ্য রক্ষা ও নূতন বন স্থাপনের দায়িত্ব এখন রাজ্য সরকারের।

তৃতীয় অধ্যায়

সংযোগ ব্যবস্থা

দামোদর ও অজয় যে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও প্রবাহের বহুদূর পর্যন্ত নৌ-চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা বলা যায় যে অতীতে এই দুই নদই অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। মনসামঙ্গল বর্ণিত চাঁপাই নগরী দামোদর তীরে অবস্থিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস এবং পানাগড়ের অদূরে কসবা-চম্পাই নগরীই যে চাঁদ সদাগরের চাঁপাই নগরী ইহাই জনমত। এই স্থান ছিল বণিক সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল। চাঁদ সদাগরের "সপ্ত-ডিঙ্গা মধুকর" চাঁপাই নগরী হইতে দামোদর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া সুদূর সাগর পাড়ে বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। উজানী ছিল বণিক সম্প্রদায়ের অপর একটি কেন্দ্রস্থল, অবস্থান ছিল মঙ্গলকোটের অদূরে অজয়-তীরে, কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পল্লীআবাস কোগ্রামের নিকট। ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে উজানীর সদাগর ধনপতির উল্লেখ আছে "সাধু ধনপতি বৈসে উজানী নগর।" চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানেও উজানীর ধনপতি সদাগর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর ও তাঁহাদের সমুদ্র যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

জলপথ

দামোদর ও অজয়

বর্তমানে এই দুই নদেরই ধারা বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় থাকে ক্ষীণ—নৌ-চলাচলের অনুপযুক্ত। বর্ষার সময় প্রবাহের দূর অভ্যন্তর পর্যন্ত নৌ-বাণিজ্যের উপযুক্ত হয় ও ধান, পাট প্রভৃতি রপ্তানির সহায়তা করে।

যদিও ভাগীরথী প্রবাহ এখন পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ, বৎসরের সর্বঋতুতেই সাধারণ নৌকা চলাচলের বিশেষ কোনই ব্যাঘাত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথী বিশালকায় জলযান ও নৌ-বহর পরিচালনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। তখন বিত্তশালী সম্প্রদায় বিশাল বজরায় আরোহণ করিয়া ভাগীরথী স্রোত বাহিয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাতায়াত

ভাগীরথী

করিতেন। পলাশির যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ইংরেজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন্‌ কলিকাতা হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত নৌবহর চালনা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভাগীরথীর স্রোতধারা ক্ষীণ হয়, কলিকাতা হইতে উত্তর প্রদেশের মীরাট জিলার গড় মুক্তেশ্বর পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করিত ও ইহাতে যাত্রী ও সরকারী কোষ বহন করা হইত। পরে নদীয়া জিলার নদী-প্রবাহের অবনতি এবং পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার খাল সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই জলপথের অবনতি হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে ভাগীরথী বহু পণ্য-সম্ভার বহন করিত এবং বৎসরের সব সময় নানাজাতীয় পণ্যবাহী নৌকা ও ষ্টীমার কাটোয়া পর্য্যন্ত অবাধে যাতায়াত করিতে পারিত। বর্তমানে এই পণ্য-পথ লুপ্তপ্রায়; মাত্র বর্ষাকালে ষ্টীমার ও পণ্যবাহী নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। যাত্রীবাহী ছোট নৌকা অবশ্য এখনও সারা বৎসর ভাগীরথীতে চলাচল করে।

খড়ি

ভাগীরথী ভিন্ন আর একটি নদীস্রোত আছে যাহার নিম্নাংশ বৎসরের প্রায় সর্বকাল নৌ-চলাচলের উপযুক্ত থাকে। নদীর নাম খড়ি। ভাগীরথীর সহিত খড়ির সংযোগস্থল হইতে প্রায় দশমাইল দূরবর্তী নাদনঘাট পর্য্যন্ত এই নদীতে নৌকা যাতায়াতের উপযুক্ত জল থাকে এবং গ্রীষ্মের সময়ও যাত্রী ও মধ্যমাকৃতি পণ্যবাহী নৌকার পক্ষে বিশেষ কোনই বাধার সৃষ্টি হয় না। বর্ষায় এই নদী ভাতার পর্য্যন্ত সর্ব প্রকার নৌকার উপযোগী হয় ও তখন নদীর দুই পার্শ্বের গ্রাম হইতে ধান, পাট প্রভৃতি রপ্তানির পথ সুগম হয়।

স্থলপথ

প্রাচীন রাজপথ

প্রাচীন কালে রাঢ়দেশের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপনের উপযোগী কয়েকটি রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চ্যাঙ্গ তীর্থ পর্যটন উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি বারাণসী হইতে পাটলিপুত্র, বোধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি স্থান হইয়া কোজঙ্গল আসিয়াছিলেন। অনেকের অনুমান যে এই কোজঙ্গল অবস্থিত ছিল রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে। তাঁহারা বলেন যে, বর্তমান সিউড়ি হইতে যে-রাজপথ রাণীগঞ্জ ও বাঁকুড়া হইয়া বিষ্ণুপুরের দিকে গিয়াছে, তাহা প্রাচীনকালে রাজমহল পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যদিয়া

ভাগলপুরের দিকে প্রসারিত ছিল, আর এই রাজপথই ছিল ইয়ুয়ান চ্যাঙের পথ। কোজঙ্গল হইতে আর একটি রাজপথ বিস্তৃত ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর বঙ্গ পর্য্যন্ত। চৈনিক পরিব্রাজক ইত্‌সিঙ্গ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ) তাম্রলিপ্ত হইতে গয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজপথের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহার কোনও অংশ বর্ধমানের মধ্যদিয়া অতিক্রম করিত না বলিয়া অনুমান।

প্রাচীন রাঢ় দেশের যোগাযোগের জন্য যে কয়টি রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতেছে নিম্নরূপ—

রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর

কাঁকসা হইতে সোনামুখী—বিষ্ণুপুর

বর্ধমান হইতে উচালন—গড়বেতা

বর্ধমান হইতে উচালন—শ্যামবাজার—ক্ষীরপাই—মেদিনীপুর।

মধ্যযুগের রাজপথ

মধ্যযুগে কয়েকটি বিশিষ্ট রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল হুগলি হইতে পেশওয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজপথ, যাহার বর্তমান নাম "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।" ইতিহাস বলে যে, এই রাজপথটি প্রস্তুত করেন শের শাহ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সম্রাট্ অশোকই ইহার নির্মাতা, শের শাহের সময় ইহার সংস্কৃতি হয়, কিন্তু এই অনুমানের মূলে কোনই ভিত্তি নাই। "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্" ভিন্নও মুসলমান যুগের বহু রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের একটি বিস্তৃত ছিল মুঙ্গের হইতে রাজমহল হইয়া বর্ধমান ও তাহার পর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত। মঙ্গলকোটে এই রাজপথ বর্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। এই রাজপথটির চিহ্ন মঙ্গলকোট হইতে বধমান কাটোয়া রাস্তার অষ্টম মাইল পর্য্যন্ত এখনও দৃষ্ট হয়; এইস্থান হইতে বর্ধমান শহর পর্য্যন্ত রাজপথ কাটোয়া রাস্তার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান রাস্তা এই রাজপথের গতি অনুসরণ করিয়াছে। ইং সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত ভ্যালেনটাইন (Valentyne) সাহেবের মানচিত্রে এই রাজপথের উল্লেখ আছে। মোগল আমলে এই রাজপথ সৈন্য চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। ইং ১৬৯৬ সালে সুভাউদ্দিনের বিদ্রোহে ও পরে নবাব আলিবরদি খাঁ-এর সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে এই রাজপথ ব্যবহৃত হয়। রাজপথ প্রশস্ত ছিল

পথ ; দুই পার্শ্বে ছিল নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী ; প্রতি আট মাইল অন্তর স্থাপিত ছিল সরাইখানা, মসজিদ ও প্রশস্ত জলাশয়।

হুগলি হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজপথ ছিল। ইহার গতিপথ ছিল হুগলি হইতে ভাগীরথী প্রবাহের সমান্তরাল হইয়া কাটোয়া, পরে অজয় অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এই রাজপথের উল্লেখ আছে। পলাশি যুদ্ধের সময় ক্লাইভ এই পথ ধরিয়া কাটোয়ায় সৈন্য পরিচালনা করেন। কাটোয়া পর্যন্ত এই রাজপথ এখনও সুস্পষ্টভাবে বর্তমান।

অন্য একটি রাজপথ ছিল সাতগাছিয়া হইতে জামালপুর পর্যন্ত। "তকৃতি খাঁ-এর জাঙ্গাল" নামে ইহা এখনও পরিচিত। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে জোগ্রাম পর্যন্ত বর্তমান রাস্তা এই রাজপথেরই অংশ।

বর্তমান রাজপথ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জিলায় যে সকল রাস্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মাত্র ১৮টি ছিল পাকা রাস্তার পর্যায়ে। ইহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড	৬৮ মাইল	
বর্ধমান—কাটোয়া	৩৬ ,,	
মেমারি—মণিরামবাটী	১৬ ,,	
পাণ্ডুয়া—কালনা	৪ ,,	(বর্ধমান জিলায়)
থানা জংশন—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড	১ ,,	৫ ফাঃ
বর্ধমান—কালনা	৯ ,,	(মোট দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল)
কাটোয়া—দাঁইহাট	৫ ,,	
গুসকরা—নিত্যানন্দপুর	১৪ ,,	
গুসকরা মানকর	১৪ ,,	৬ ফাঃ
মানকর—বুদবুদ	২ ,,	
পানাগড—ইলামবাজার	৪ ,,	
পানাগড়—রণডিহা	৩ ,,	
রাজবাঁধ গোপালপুর	২ ,,	৩ ফাঃ
রাণীগঞ্জ—মঙ্গলপুর	২ ,,	
রাণীগঞ্জ—অজয়	১৬ ,,	
সীতারামপুর—নিয়ামতপুর	১ ,,	৪ ফাঃ
রাধানগর—শাঁকতোড়িয়া	২ ,,	৭ ,,
রাণীগঞ্জ—দামোদর	৩ ,,	২ ,,

সর্বমোট দূরত্ব ২০৫ মাইল ৩ ফার্লং।

গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড ছিল পিচ-ঢালা ; অবশিষ্টগুলি ছিল মাত্র খোয়া বিছানো। বর্ধমান-কালনা রাস্তায় প্রথম ৫ মাইল ও শেষ ৫ মাইল ছিল খোয়া বিছানো। কাটোয়া-কালনা রাস্তার প্রথম ৫ মাইল, দাঁইহাট পর্য্যন্ত ছিল খোয়া বিছানো।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জিলার রাস্তা সমূহের যথেষ্ট উন্নতি বিধান হইয়াছে। বহু কাঁচা রাস্তা পাকা করা হইয়াছে, বহু পুরাতন তথা-কথিত পাকা রাস্তা আধুনিক পদ্ধতির রাস্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে আবার বহু আধুনিক পর্য্যায়ের নূতন নূতন রাস্তার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে এই জাতীয় রাস্তার সংখ্যা ৪৫ ও তাহাদের মোট দূরত্ব প্রায় ৫০০ মাইল। বিশিষ্ট রাস্তাগুলির পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের কথা

রাজপথ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড। সমগ্র উত্তর ভারতের সংযোগ ব্যবস্থার ধমনি এই রাজপথ। রাজপথ বহু প্রাচীন হইলেও সামরিক উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এই রাজপথ দেখান আছে কিন্তু নামের কোনই উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সেই সময় ইহার কোনই সামরিক গুরুত্ব ছিল না। ইং ১৭৬০ সালে যখন কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পাইলেন, তখন এই রাজপথের অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার উপরিভাগের বিস্তৃতি ছিল মাত্র ২০ ফুট। রাজপথ মেরামতের অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, আর কোথায়ও সেতু ছিল না। ইং ১৭৯০ সালে ইহার উপরিভাগের বিস্তৃতি ১০ ফুট বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু প্রাথমিক বৃদ্ধি হয় নাই। মহারাজার সহিত কোম্পানির বিবাদ যখন চরমে পৌঁছে, কোম্পানির সিপাহী সৈন্য কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ রাস্তা ধরিয়া কালনার ঘাট ও কালনা হইতে বর্ধমান উপস্থিত হয়।

কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড বরাবর বর্ধমানের দূরত্ব কম বিবেচনা করিয়া কোম্পানি শীঘ্রই এই রাজপথটির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ইং ১৮৩৬ সালে হুগলি হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত অংশ পাকা করা হয় ও যেখানে সম্ভব সেতু নির্মিত হয়। ইং ১৮৫০ সালে ইহার আরও উন্নতি সাধন করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজপথটির কর্তৃত্ব

পূর্বেই গ্রহণ করেন ও এই কর্তৃত্ব ইং ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকে। ইং ১৮৫৪ সাল হইতে ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট ইহার তত্ত্বাবধান করে কিন্তু ইং ১৮৮৭ সালে রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি রাজস্ব-আদায় উদ্দেশ্যে জিলার কলেকটরের উপর ন্যস্ত হয় এবং মাত্র রাস্তার ভাগটি থাকে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের হাতে। এই ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক উদ্দেশ্যে এই রাজপথের সংস্কার হয়; মধ্যস্থলের পাকা অংশ বিস্তার লাভ করে। যুদ্ধোত্তর কালে এই উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এই রাজপথ মোটর-চালিত যানবাহনের অত্যধিক ভারবহন করে। সাধারণ যাত্রীগাড়ী ভিন্নও মাল বোঝাই লরী, ট্রাক, দশটন বা তাহারও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল ট্রাক ও অত্যন্ত ভারী ওজনের যন্ত্রপাতি অবিরাম স্রোতে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করে। যানবাহনের সংখ্যা এত অধিক যে, রাজপথের বিশেষ কোনও অংশ দিয়া দৈনিক গড়ে প্রায় ৮,০০০ হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর যান যাতায়াত করে। মালবাহী মোটর-যানের যাতায়াত সাধারণতঃ রাত্রিকালেই হয়। সুদীর্ঘ লরীর বহর রাণীগঞ্জ অঞ্চল হইতে কয়লা, আসানসোল শিল্পাঞ্চল হইতে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্য, বিহার হইতে আলু, পেয়াজ, লঙ্কা ও মসলাপাতি, উত্তর প্রদেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় ডাল, সরিষা ও নানাবিধ ফল বহন করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অথবা কলিকাতা ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল হইতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দ্রব্যসামগ্রী অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়া পশ্চিমাভিমুখে তীব্র বেগে ধাবিত হয়। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুর্ঘটনার সংখ্যা কম নহে; বর্ষাকালে ইহার হয় আতিশয্য। রাত্রিতে এই রাজপথের রূপ হয় উদ্দাম, ভয়াল। মোটর-যান সমূহের অবিরাম স্রোত, ইহাদের তীব্র আলো ও বিকট গর্জন, সামান্য ত্রুটি কিম্বা অসতর্কতাজনিত বিপদ বা মৃত্যু—একটি অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে। শ্রান্ত লরী-চালকের সাময়িক বিশ্রাম স্থল হয় পথিপার্শ্বস্থ সরাইখানা; যেখানে জ্বলে তীব্র আলো। আলোর নীচে বসিয়া দীর্ঘশ্মশ্রুধারী শিখ চালক থাকে পান ভোজনে মত্ত আর ক্লান্তি বিনোদনের জন্য পান করে উগ্র মদ। সুরা পানের আতিশয্য হইতে বিলম্ব হয় না আর ইহারই

ফলে দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পরে লরী খানি আছে পথিপার্শ্বে বিপরীত ভাবে পড়িয়া আর লরী চালক ও তাহার সহচরগণ হইয়াছে পিষ্ট অথবা দূর-বিক্ষিপ্ত। দিনের বেলায় বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে দৃশ্য হয় কিছু শান্ত। তখন দেখা যায় লরীর শ্রেণী কোনও জলাশয়ের নিকট স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, লরীচালক হয় তো অবগাহন স্নান করিতেছে আর তাহার সহকারী জলাশয় হইতে জল আনিয়া লরী ধৌত করিতেছে। যাত্রীবাহী বাস উপরে নানাপ্রকার মালের বোঝা বহন করিয়া বর্ধমান হইতে আসানসোল বা কলিকাতা অথবা বিপরীত দিকে তীরবেগে ছুটিতেছে আর বাসের কনডাক্টর যেন ইচ্ছা-শক্তির বলেই পার্শ্বে ঝুলিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে যাত্রীবাহী বাসের দুর্ঘটনা হয় কম।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বর্তমান রূপ দেখিয়া মনে হয় যে পুরাতন দিনের সদ্য কর্তিত ধান ও খড় বোঝাই শান্ত গোযানের কাল গত হইয়াছে আর ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে আকাশচুম্বি মালবাহী লরী। লরীর চঞ্চল, অশান্ত গতি তিক্ততা ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে, শান্তির নহে। ভাগীরথী প্রবাহ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে যেমন পশ্চিম বাংলার পল্লীজীবনের আভাস পাওয়া যায়, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে সেইরূপ দেশের ক্রমশঃ পরিবর্তমান রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পানাগড়ের পূর্ব পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বের দৃশ্য প্রায় একরূপ—বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র, দূরে পল্লী সীমান্তের বনরেখা, স্থানে স্থানে বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বাজার বা চাউলকল। দামোদর খাল-অঞ্চল ছাড়িয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যখন পানাগড়ের সামরিক কেন্দ্রে প্রবেশ করিল, তখন হইতেই আরম্ভ হইল দৃশ্যপটের পরিবর্তন। উন্নত-নত পথে ইহা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া দুর্গাপুর অঞ্চলে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, দুর্গাপুরের প্রাচীন বনভূমি লুপ্তপ্রায়; এখানে বনভূমি ধ্বংস করিয়া ইস্পাত নগরী ও তাহার সহরতলি স্থাপিত। তার পরই দেখা যাইবে ইস্পাত নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য যাহাদের বাস্তুচ্যুত করা হইয়াছে, তাহাদের নূতন বসতিস্থল বেনাচিতি। তারপর অণ্ডাল বিমানক্ষেত্র অতিক্রম করিলেই সাক্ষাৎ মিলিবে সমৃদ্ধ কয়লা ক্ষেত্রের ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির পরিচায়ক রাণীগঞ্জ-আসানসোলের বিস্তৃত শিল্পাঞ্চলের।

জিলার কাচা উল্লেখযোগ্য রাস্তার সংখ্যা ২৬৪ ; ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯১১ মাইল।

রেলপথ

পূর্ব রেলপথের চারটি বিশেষ শাখা ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের একটি শাখা বর্ধমান জিলার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহাদের পরিচয় এইরূপ ঃ

১। পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখা।

হাওড়া হইতে ইহা বর্ধমান গিয়া পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আসানসোলের পর ইহা আবার দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, একটি গিয়াছে ধানবাদের দিকে, অন্যটি চিত্তরঞ্জন হইয়া পাটনার দিকে। প্রথমটির নাম গ্রাণ্ড কর্ড আর দ্বিতীয়টির নাম মেন লাইন অর্থাৎ প্রধান পথ।

২। হাওড়া—বর্ধমান কর্ড শাখা।

ইহা মেন লাইন বা প্রধান শাখা হইতে নির্গত হইয়াছে বালি রেলস্টেশনের পূর্বেই ; তারপর সোজা শক্তিগড পর্যন্ত গিয়া মেন লাইনের সহিত মিশিয়াছে। শক্তিগড পর্যন্ত দুই শাখার দূরত্বের ব্যবধান প্রায় দশ মাইল।

৩। হাওড়া—বারহারোয়া শাখা।

ইহার পথ হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত মেন লাইন অর্থাৎ প্রধান শাখার সহিত অভিন্ন। ব্যাণ্ডেল হইতে ইহা পৃথক হইয়া কালনা, কাটোয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া উত্তরে বারহারোয়ার দিকে গিয়াছে।

৪। হাওড়া—কিউল শাখা।

হাওড়া হইতে মেন লাইনের খানা জংশন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ইহা উত্তর দিকে প্রসারিত হইয়াছে ও বীরভূম জিলার মধ্য দিয়া কিউল পর্যন্ত গিয়াছে।

৫। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আসানসোল—আদ্রা শাখা।

আসানসোল হইতে বাহির হইয়া ইহা দক্ষিণ পশ্চিমে আদ্রায় পৌছিয়াছে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের এক প্রধান শাখার সহিত মিশিয়াছে।

এইগুলি ভিন্ন আরও কয়েকটি রেলপথ আছে :

১। অণ্ডাল—সাঁইথিয়া রেলপথ।

পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখার উপর অবস্থিত অণ্ডাল হইতে

বাহির হইয়া ইহা সিউরি হইয়া সাঁইথিয়ায় হাওড়া-কিউল শাখার সহিত মিশিয়াছে।

২। অণ্ডাল—সীতারামপুর রেলপথ।

অণ্ডাল হইতে বাহির হইয়া ইহা বরাবনি হইয়া সীতারামপুরে পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখার সহিত মিশিয়াছে।

৩। অণ্ডাল—গৌরাঙ্গডি রেলপথ।

অণ্ডাল হইতে গৌরাঙ্গডি পর্য্যন্ত গিয়াছে।

উপরোক্ত রেলপথগুলি সবই প্রশস্ত পথযুক্ত (Broad Gauge)। কয়েকটি অপ্রশস্ত রেলপথও এই জিলায় আছে :

বর্ধমান হইতে কাটোয়া
কাটোয়া হইতে আহমদপুর
বাঁকুড়া হইতে রায়না।

উপরোক্ত প্রশস্ত রেলপথগুলি বহু সংখ্যক যাত্রী ও প্রচুর পরিমাণে মাল বহন করে। সম্প্রতি হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত প্রধান পথ বৈদ্যুতিকরণ হইয়াছে ও ইস্পাত প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় মাল বহনের সুবিধার জন্য দুর্গাপুর হইতে ভিলাই পর্য্যন্ত শাখা উন্মুক্ত হইয়াছে।

আকাশ পথ

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে চারটি বিমান ক্ষেত্র নির্মিত হয়। তাহাদের অবস্থান এইরূপ

আসানসোলের নিকট নিঙ্গা
অণ্ডাল
উখরার নিকট মাধাইগঞ্জ
পানাগড়ের নিকট বিরুডিহা।

বর্তমানে মাত্র নিঙ্গা ও বিরুডিহা বিমানক্ষেত্রই নিয়মিত ব্যবহারের উপযোগী। নিঙ্গা সাধারণতঃ মালবাহী বিমান অবতরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আসাম, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে তামাক, চা, কমলালেবু ইত্যাদি বিমান মাধ্যমে এখানে প্রেরিত হইয়া শিল্পাঞ্চলের [illegible] করে। কদাচিৎ যাত্রীবাহী বিমানও অবতরণ করে। বিরুডিহা বিমানক্ষেত্র বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিগণের জন্যই উন্মুক্ত।

আসানসোলে মার্টিন বার্ণস্ এর একটি নিজস্ব বিমানক্ষেত্র আছে।

দ্বিতীয় পর্ব

লোক-তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

লোক পরিচয়

লোক-সংখ্যা

বিগত ইং ১৯৬১ সালের লোক গণনা বা সেন্সাস্ অনুসারে বর্ধমান জিলার লোক সংখ্যা ৩০,৮৩,৫৬৫। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে জনসংখ্যার পরিবর্তন বিভিন্ন সেন্সাসে যেরূপ প্রকাশ পায় তাহার বিবরণ মহকুমা ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হইল :

মহকুমা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বর্ধমান সদর	৬৮২৩৮১	৬৬৩২৩৯	৫৮৯৮৪৯	৬২৫২৯৫	৭৩৭৬৫১	৮০২০৫৭	১১৪৭১৪১
কালনা	২২৬৪১৭	২২৫২২৫	২০৫৯৫৪	২১৮৭৩৭	২৪৭৬৭২	৩০৫৭৫১	৪১৬০৪৬
কাটোয়া	২৪৮৫০৪	২৫৬৮২৮	২৩৫০০৪	২৬৮৫৮৭	২৯৯৫২০	৩১৪৫৯৪	৪২৭০০৬
আসানসোল	৩৭০৯৮৮	৩৮৮৫৮২	৪০৩৯৬৪	৪৬৩০৮০	৬০৫৬৮৯	৭৬৯২৬৫	১০৯৩৩৭১
সর্বমোট	১৫২৮২৯০	১৫৩৩৮৭৪	১৪৩৪৭৭১	১৫৭৫৬৯৯	১৮৯০৫০২	২১৯১৬৬৭	৩০৮৩৫৬৪

লক্ষ্য করা যায় যে আসানসোল মহকুমা বাদ দিলে অন্য তিনটী মহকুমায় ১৯০১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত মাত্র যে অপেক্ষাকৃত কম তাহা নহে, কোথায়ও আবার, যেমন ১৯২১ সালে, অবনতির দিকে। নিদারুণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে ইহার একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর সরকারী লোক গণনার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও অভাব ছিল, লোক গণনার তাৎপর্য্যও সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। ইং ১৯৪০ সাল হইতে সকল মহকুমায়ই জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ইং ১৯০১ সাল হইতে বিভিন্ন মহকুমার জনসংখ্যার পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইল হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল :

মহকুমা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বর্ধমান সদর	৫৩২	৫১৬	৪৫৯	৪৮৭	৫৭৫	৬২৪	৮৯৩
কালনা	৫৮৮	৫৮২	৫৩৫	৫৬৮	৬৪৩	৭৯৩	১০৮০
কাটোয়া	৬০৬	৬২৬	৫৭২	৬৫৫	৭৩০	৭৬৭	১০৪১
আসানসোল	৫৯৬	৬২৫	৬৪৯	৭৪৪	৯৭৩	১২৩৬	১৭৬৬

আসানসোল মহকুমার আশ্চর্য্যজনক লোক বৃদ্ধি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলাবাহুল্য যে নানাবিধ শিল্প ও কারখানার প্রসারই ইহার মূল কারণ।

নগরী ও উপনগরী

জিলায় মোট গ্রাম সংখ্যা ২৬৪৯। ইহার অনুপাতে নগরী ও উপনগরীর সংখ্যা মাত্র ১৪ আর তাহাদের মধ্যে দশটীর অবস্থান আসানসোল অঞ্চলে। এই সকল নগরী ও উপনগরীর জনসংখ্যা বিভিন্ন সেন্সাস্ অনুসারে নিম্নে দেওয়া হইল :

নগরী বা উপনগরী	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বর্ধমান	৩০৫২২	৩৫৯২১	৩৪৬১৬	৩৯৬১৮	৬২৯১০	৭৫৩৭৬	১০৭৮৮১
আসানসোল	১৪৯০৬	২১৯১৯	২৬৪৯৯	৩১২৮৬	৫৫৭৯৭	৭৬২৭৭	১০৩৬৫৯
রাণীগঞ্জ	১৫৮৪১	১৫৪৯৭	১৪৫৩৬	১৬৩৭৩	২২৮৩৯	২৫৯৩৯	২৯৭১৩
বার্ণপুর				৫৭৪০	১৩৬৭৮	১৮৪৮৭	২১০৪৯
অণ্ডাল				৩১১০	৯৮৫৬	১৪২৮৮	১৭২৫৪
কুলটি				১১৫০৪	১৯৪২৩	৩১৩৬৩	৩৪২৩৩
নিয়ামতপুর						১১৭৫৬	১২৬১৫
বরাকর					৯৭৭১	১০৪৪০	১৩৯৮৩
চিত্তরঞ্জন						১৬১৬২	২৮৯৭৩
দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী							৩৫৩৩৯
ঐ কোকচুল্লি							৬৩৬০
কালনা	৮১২১	৮৬০৩	৮৪২৪	৯৫৬৭	১২৫৬২	১৭৩২৪	২২৫২৯
কাটোয়া	৭২২০	৬৯০৪	৬৮২৩	৭৭৭২	১১২৮৩	১৫৫৩৩	২০৫৬৮
দাঁইহাট	৫৬১৮	৫৩৪২	৪৮৪৩	৪৮৪৫	৫০৩৬	৮১৪৯	১০৫১৪

বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাট ব্যতীত ইহাদের সকলেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। বর্ধমান জিলার যাবতীয় সংযোগ

:।বস্থার কেন্দ্রস্থল ও জিলার প্রধান শহর বিধায় ইহার লোক-বৃদ্ধি ।হজেই অনুমেয়। তারপর ইং ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু বাস্তুচ্যুত পরিবার এখানে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে। সেইরূপ কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাটেও বহু বাস্তুচ্যুত পরিবারের সমাগম হইয়াছে।

ভাষা

মাতৃভাষা অনুযায়ী জনসংখ্যার আভাস নিম্ন-প্রদত্ত ইং ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসের অঙ্কাবলী হইতে পাওয়া যাইবে:

বাংলা	১৭৭৯৬৫৬
হিন্দি	১৯৯৮৮৪
সাঁওতালি	১০৭৩১৩
উর্দু	৮২৯৫১
উড়িয়া	৯৯১৬
গুরুমুখী	৪৫৭৩
নেপালি	২৫৪৮
তেলুগু	১৫০৪
গুজরাটি	৭৫৬
তামিল	৫১৭
ইংরাজী	৭০৬
মারাঠি	২৮৮
কোল	১৭২
জারমান	১৫৫
চিনাম্যান	১১৬
সিন্ধি	৯
মুণ্ডারি	১৬৬
অসমীয়	২৩৫
কোরা	২০৭

বলাবাহুল্য যে জিলার সর্বত্রই বাংলাভাষাভাষীদের প্রাধান্য। [সাঁ]ওতালি ভিন্ন অন্য ভাষাভাষীগণের বাস সাধারণতঃ শিল্পাঞ্চলে বা [বি]শিষ্ট ব্যবসা কেন্দ্রে।

ধর্ম ও জাতি

জিলায় বহু ধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস। ইং ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসে তাহাদের যে সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতে বিভিন্ন ধর্মীয় লোকসংখ্যার অনুপাতের একটী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

হিন্দু	১৮৩৫১০৬
মুসলমান	৩৪১৮৭৮
শিখ	৫৩৭৫
খৃষ্টান	৬১৩৫
জৈন	১০০৩
বৌদ্ধ	২৭১
পার্শি	২
ইহুদি	৬৫
আদিবাসী	১৮৩২

বহু আদিবাসী হিন্দু পরিচয়ে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিল। হিন্দু পরিচয়ে লিখিত লোকসংখ্যার মধ্যে তপশিলভুক্ত আদিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৩৪৫৪৫ ও তপশিলি জাতির সংখ্যা ৫৮৪৮০৬। হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারপর স্থান মুসলমানের। অন্যান্য ধর্মীয়গণ সংখ্যায় নগণ্য মুসলমান সম্প্রদায় যদিও প্রায় সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত, মঙ্গলকোট মন্তেশ্বর, কাটোয়া, কালনা, কেতুগ্রাম, চুরুলিয়া, কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাক্তন মুসলমান সংস্কৃতি-কেন্দ্রে চতুষ্পার্শ্বেই ঘন সন্নিবিষ্ট মুসলমান বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আদিবাসী মধ্যে সাঁওতাল জিলার প্রায় সব স্থানেই আছে। মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতিকে দেখা যায় শিল্প কেন্দ্রে। তপশিলভুক্ত জাতির মধ্যে বাউরিদের প্রাধান্য জিলার পশ্চিমাঞ্চলেই দেখা যায় ; অন্যান্য জাতিগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে সংখায় প্রধান হইতেছে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, সদগোপ, গোয়ালা ও উগ্রক্ষত্রিয়। তাহাদের পরই স্থান মাহিষ্য বৈষ্ণব, তন্তুবায়, কামার, তিলি প্রভৃতির। তপশিলভুক্ত জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বাগদি, বাউরি, মুচি, ডোম, হাড়ী, তেলি, নমঃশূদ্র, ভুঁইয়া, জেলে, কৈবর্ত প্রভৃতি।

ক্ষয়িষ্ণু নিম্নশ্রেণী

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে সেন্‌সাস্ বিবরণীগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মুসলমান, সাঁওতাল বা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ

তুলনায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি বহু পরিমাণে কম অথবা নগণ্য ; কোথায়ও বা ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নোক্ত বিবরণী হইতে তাহা প্রকাশ পাইবে :

জাতি	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
বাগদি	১৯৭৬২৪	১৯৫৮৭৪	১৭৯৪৬৮	১৮৫১৭২	১৬৮০০৬	১৮৯৬৭১
বাউরি	১১৩৩৭৭	১১৪৩০২	১১৩৭৪৫	১২৩৮৬৪	১১২৫৬৩	১২৪১৬২
ডোম	৩৯৯৪৩	৩৯৩৯৬	৩৫৫৬৩	৩৪৯১০	২৯৬১৮	৩১৯৪৯
হাড়ী	২৩৮৯২	২৩২৪৮	২০৮২৫	২০১৩২	১৭৮৯৭	২০৭৪৬
মুচি	৫৭৯৬৬	৬২১২৫	৫৪৯২১	৬৩৮৮৫	৫১৬৭৭	৬৫৫২২
কোরা	১৩০৫১	১৩০২৯	১১৬৩৮	১৪৫৫৭	১৪২৬৯	১৬৬০১

ইহাদেরকে ক্ষয়িষ্ণু বলা যাইতে পারে। দারিদ্র্য, ব্যাধি, আর্থিক অবনতি প্রভৃতি ইহাদের ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তও ইহারা ছিল সজীব, প্রাণবান, সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহাদের অনেকেই ছিল কৃষির প্রধান অবলম্বন বা নিজেরাই কৃষক। কৃষির জমি ইহারা হারাইয়াছে বহুদিন, দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ও ম্যালেরিয়ায় ইহারাই মরিয়াছে প্রথম। কৃষির ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান এখন অধিকার করিয়াছে সাঁওতাল।

সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী

সাঁওতালদের সংখ্যাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য এবং নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল :

১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
৪৬৪৫৭	৬৫৯৭৯	৭৯০৯৯	১০১৫২২	১১৫৫৪৭	১২৭৪৪১

তাহাদের অনেকেই জিলার প্রাচীন অধিবাসী। জিলার পশ্চিমাঞ্চলেই ছিল তাহাদের সংখ্যাপ্রাধান্য। বহু সাঁওতাল আবার বাহির হইতে আসিয়া এই জিলায় বসবাস করিতেছে। কিছু সংখ্যক সাঁওতাল শিল্পাঞ্চলে কাজ করিলেও তাহাদের একটা প্রধান অংশ কৃষিজীবী ও ও কৃষির মেরুদণ্ড। সাঁওতাল ভিন্ন মুণ্ডা ও ওঁরাওদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে এইরূপ দেখা যায়

জাতি	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
মুণ্ডা	১১৪২	১৩০২	১৩০০	৪৯৪	৫৫৪	২৪৪৭
ওঁরাও	৭৫৯	৫১৫	১০৩২	১২৯০	৫৯৮	৪৫৫৫

ইহাদের আদিবাস ছোটনাগপুর অঞ্চল। শ্রমসংস্থায় কাজ করার জন্যই ইহারা এ জিলায় আসে আবার সময় সময় ফিরিয়া যায়। এই কারণে তাহাদের সংখ্যার সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

কয়েকটী নিম্ন-শ্রেণীর ঐতিহ্য

কয়েকটী ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন-শ্রেণীর কিন্তু মহান ঐতিহ্য আছে এবং নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইল :

বাগদি

বাগ্‌দি সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। কেহ কেহ মনে করেন যে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গারিডি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা বর্তমান বাগ্‌দি জাতির পূর্বপুরুষ। ঐতিহাসিক যুগে আমরা কয়েকটী বাগ্‌দি রাজ্যের পরিচয় পাই। সপ্তগ্রামের বৌদ্ধ বাগ্‌দি রাজ্য ও ভবদেব ভট্ট কর্তৃক তাহার ধ্বংসের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্ল-রাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে বাগ্‌দি সম্প্রদায় বিশেষ পরিচিত হয় এবং অনেকের মতে মল্লরাজগণ আদিতে ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী বহু পরের। বাগ্‌দি সম্প্রদায়ও এখন ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় ব্যগ্রক্ষত্রিয়। বিষ্ণুপুরের সৈন্য বাহিনীতে বাগ্‌দিগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। যোদ্ধা হিসাবে বিষ্ণুপুরের বাহিরেও ইহাদের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কোম্পানির অধিকারের পূর্বে দেশীয় রাজা বা সামন্তগণ যে ফৌজ বা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদারগণ আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যে পাইক সৈন্য পোষণ করিতেন, তাহার এক বিরাট অংশ ছিল বাগ্‌দি সম্প্রদায়ভুক্ত। পরবর্তীকালে বহু বাগ্‌দি জমিদারশ্রেণীর পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। গ্রাম-চৌকিদারের পদেও তাহাদের নিয়োগ করা হইত এবং বর্তমানেও বহু গ্রাম-চৌকিদার এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের দীর্ঘ সমুন্নত দেহ দারিদ্র্য ও রোগক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইঙ্গিত করে যে এক সময় সৈন্য-বাহিনীর পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী রহিলেন না। ফলে বহু বাগ্‌দি জীবিকাহীন হয়। বহু কর্মচ্যুত ফৌজ ডাকাইতের দলে যোগদান করিয়া পল্লীজীবনের আতঙ্কের কারণ হয়। "ঠ্যাঙ্গারে" নামে পরিচিত হইয়া ইহাদের দল দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে

যে ত্রাস ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে তাহার কাহিনী এখনও লোকমুখে শোনা যায়।

ডোম

পশ্চিম বাংলায় যখন বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল, তখন সমাজে ডোম সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। ধর্ম-কার্য্য, গীত-বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানে তাহারা ছিল অপরিহার্য্য। ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনীর সহিত ডোম সম্প্রদায়ের এক বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এবং কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্ম-ঠাকুর মূলে ছিলেন ডোমদের সর্বোচ্চ দেবতা। এখনও ধর্ম পূজায় ডোম পণ্ডিত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শূন্য-পুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিত ছিলেন জাতিতে ডোম। সামরিক বিদ্যায়ও ছিল তাহারা বিশেষ দক্ষ। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের সেনাবাহিনীর এক অংশ গঠিত ছিল ডোম সৈন্য দ্বারা এবং ডোম চতুরঙ্গ বাহিনীর স্মৃতি বহন করে শিশু ছড়া—

"আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম সাজে।"

বিষ্ণুপুরের অনুকরণে অন্যান্য স্বাধীন সামন্ত রাজগণও ডোম সৈন্য রাখিতেন। ধর্ম-মঙ্গলে বর্ণিত কালু ডোমের কাহিনী ডোম সৈন্যের বীরত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ ডোম সৈন্য রাখিতেন। পরে এই সৈন্যদল যখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন ইহারা হইল গ্রাম-চৌকিদার অথবা গ্রহণ করিল নীচ কর্ম। বর্তমান সমাজে ডোম পতিত, নিকৃষ্ট জাতি।

বাউরি

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়ের যে সংস্কৃতিবিহীন অধিবাসিগণ জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল তাহারা যে বাউরি জাতির পূর্ব-পুরুষ এ সম্বন্ধে অনেকেই একমত। কুকুর বাউরি সম্প্রদায়ের পরিচায়ক। জিলার পশ্চিম অংশ এই সম্প্রদায়ের আদি ভূমি। মহাবীর ধর্ম-প্রচারের জন্য দক্ষিণ বিহার হইতে এই অঞ্চলেই প্রথম পদার্পণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই সম্প্রদায়ের আর কোনই ইতিহাস পাওয়া যায় না। পুরুষ-পরম্পরা হইতে ইহাদের প্রধান জীবিকা হইয়া আসিয়াছে পাল্‌কি বেহারার কাজ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে তাহারা কয়লা উত্তোলনে অগ্রসর হয়। একথা পরে বলা যাইবে।

হাড়ী

ডোমদের ন্যায় হাড়ী সম্প্রদায়ও বৌদ্ধ যুগে সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল, বিশেষতঃ বৌদ্ধ-তন্ত্র যুগে। প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক তন্ত্রে চণ্ডীদেবীকে

বলা হয় "হাড়ীর ঝি"। মনে হয় যে, কোন হাড়ী জাতীয় কন্যা এক সময় তন্ত্র প্রভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হইয়া লোক-সমাজে চণ্ডীর সহিত অভিন্না হইয়া পড়েন। এই সম্প্রদায়েরও অনেকে দেশীয় সামন্ত বা জমিদারগণের সৈন্যদলভুক্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই সম্প্রদায়ের বহু লোক জমিদারের পাইক, বরকন্দাজ অথবা গ্রাম-চৌকিদার হিসাবে প্রতিপালিত হইত। এখনও গ্রাম-চৌকিদারের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা বহু। বর্তমান সমাজে ডোমদের ন্যায় হাড়ীও পতিত ও নিকৃষ্ট জাতি।

— - —

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবিকা ও নিয়োগ

জনসংখ্যার বিন্যাস

জীবিকা ও নিয়োগ অনুসারে জনসংখ্যাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,

(ক) কৃষিজীবী সম্প্রদায়

(খ) অকৃষি সম্প্রদায়

জন সাধারণের প্রায় শতকরা ৭৮ জন প্রথম শ্রেণীভুক্ত, অবশিষ্ট ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কৃষিজীবী সম্প্রদায়

অকৃষি সম্প্রদায়ের এক বিশাল অংশ আসানসোল মহকুমায় বাস করে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে এই মহকুমায় কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রতি শতকে প্রায় ৬০ জন। জিলার অবশিষ্ট অংশে অর্থাৎ বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮২ জন কৃষিজীবী। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬২ জনের নিজস্ব জমিজমা আছে। অবশিষ্ট ৩৮ জনের মধ্যে প্রায় ১৬ জন হইবে কৃষিমজুর বা ক্ষেত-মজুর আর ২২ জন ভূমিহীন অথবা যৎসামান্য কৃষিজমি সংযুক্ত।

সমগ্র জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিযোগ্য জমির জন প্রতি বণ্টন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে প্রকাশ পাইবে:

সাল	জন প্রতি কৃষি-যোগ্য জমি (একরে)
১৯২১	প্রায় ·৭০
১৯৩১	„ ·৬৭
১৯৪১	„ ·৬৫
১৯৫১	„ ·৫৭
১৯৬১	·৪১

আসানসোল মহকুমায় পরিমাণ আরও কম

১৯২১	প্রায়	·৪৭
১৯৩১	"	·৩৯
১৯৪১	"	·৩৭
১৯৫১	"	·২৭
১৯৬১	"	·১৮

ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যাই যে এই পরিমাণ হ্রাসের কারণ তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কৃষিজমি যে আবার যাবতীয় কৃষক পরিবারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত তাহাও ঠিক নহে। জিলার ক্ষুদ্রায়তন জমাই স্বত্বের প্রাবল্য দেখা যায় এবং নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে তাহার আনু-মানিক আভাস পাওয়া যায় :

মহকুমা	জমাই স্বত্বের আযতন ও বিভাগ		
	০—৩ একর	৩ একর হইতে ৫ একর	৫ একবের উপর
বর্ধমান সদব	শতকরা ৯২	শতকরা ৫	শতকরা ৩
আসানসোল	" ৮৯	" ৬	" ৫
কালনা	" ৯৫	" ৩	" ২
কাটোয়া	" ৯৫	" ৩	" ২
জিলাব গড	" ৯৩	"	" ৩

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষক পরিবার একাধিক জমাই স্বত্বের অধিকারী হইলেও ইহা দেখা যায় যে অর্থনীতির হিসাবে কৃষক পরিবারের পক্ষে যাহাকে পর্য্যাপ্ত জমি বলা যায় তাহার অধিকারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ও মুসলমানের আধিক্য দেখা যায়। নানা প্রকার ব্যবসায়, শিল্প অথবা চাকুরী প্রভৃতিও প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ভূমি-সংযুক্ত পবিবার কম, ভূমি থাকিলেও ইহা নগণ্য। বাধ্য হইয়া ইহাবা অন্যের জমির ভাগদার, মজুর বা কিষাণ্ হিসাবে চাষ করে। ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতি সংস্থায় ইহাদের স্থান নিম্নতম স্তরে। কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর উপজীবিকার পরিচয় দেওয়া হইল :

কয়েকটী নিম্ন-শ্রেণীর জীবিকা

বাগ্দি : কৃষি বা কৃষিমজুর, মাছধরা, বাগ্গাল, রাখাল ও নিম্ন-স্তরের চাকুরী

ডোম : ময়লা পরিষ্কার, ঝাড়ুদার, বাঁশ ও বেতের কাজ, গ্রাম-চৌকিদার, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ইত্যাদি। ইহাদের অনেকেই ভূমিহীন ও দরিদ্র।

বাউরি : প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা ছিল পাল্‌কি বহন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহারা কয়লার খনিতে আকৃষ্ট হয় এবং তারপর কয়লা উত্তোলনে এরূপ পারদর্শী হয় যে পুরুষানুক্রমে এই কাজই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা হইয়া গিয়াছে। আসানসোল কয়লা শিল্প অঞ্চলেই প্রায় ১২,০০০ হাজার বাউরি জীবিকা অর্জনের জন্য বসবাস করে। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ৮০,০০০ হাজার বাউরির এক প্রধান অংশও খনি অঞ্চলে বাস না করিলেও বাহিব হইতে আসিয়া এখানে শ্রমিকের কাজ করে। আসানসোলের বাহিরে ইহাদের প্রধান উপজীবিকা চাষ, মাটি কাটা, শ্রমিকের কাজ ও কদাচিৎ পালকি বহন।

হাড়ী : গ্রাম-চৌকিদারের কাজ ব্যতীতও ময়লা পরিষ্কার, চাষ ও তাল কিম্বা খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা ইহাদের বৃত্তি। এই শ্রেণীও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিহীন ও দরিদ্র।

কোরা : ইহাদের আদিবাস ছোটনাগপুর হইলেও, বহু পুরুষ ধরিয়া ইহারা এই অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। মাটি কাটা হইল ইহাদের প্রধান জীবিকা। এই কাজের জন্য ইহাদের অনেকে কয়লাখনি অঞ্চলে নিয়োজিত থাকে। ইহারাও ভূমিহীন ও দরিদ্র।

নমঃশূদ্র, ভুঁইয়া প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণী : ইহাদের প্রধান উপজীবিকা হইল কৃষি অথবা ক্ষেত মজুরের কাজ।

অকৃষি সম্প্রদায়

অকৃষি সম্প্রদায়ের বিন্যাস এইরূপ :

ক।	কৃষিভিন্ন অন্যান্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল	শতকরা প্রায়	৪১ জন
খ।	ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল	"	২২ "
গ।	যানবাহন কার্য্যে নিযুক্ত	"	৭ "
ঘ।	অন্যান্য উপজীবিকা	"	৩০ "

উপরোক্ত বিভিন্ন উপজীবিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ ঃ

ক। কৃষিভিন্ন অন্যান্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল

উপজীবিকা ঃ—

কয়লা ও শিল্পাঞ্চলে নিয়োগ
ধান ভানা
বিড়ি তৈয়ারী
তাঁতের কাজ
চামড়ার কাজ
কামারের বৃত্তি
মৎস্যজীবীর বৃত্তি
পিত্তল-কাঁসার বাসন তৈয়ারী
কুম্ভকার বৃত্তি
সূত্রধর বৃত্তি
নৌকা তৈয়ারী ইত্যাদি

খ। ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল।

উপজীবিকা ঃ

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী
ধান চাউলের ব্যবসাদার
মুদি
ফেরিওয়ালা
পান, বিড়ি, সিগারেট বিক্রেতা ইত্যাদি।

গ। যানবাহন কার্য্যে নিযুক্ত।

উপজীবিকা ঃ

মোটর গাড়ী সংক্রান্ত কাজ
গোযান চালক
নৌকার মাঝি
রেলকর্মচারী ইত্যাদি

ঘ। অন্যান্য উপজীবিকা :

উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবী
ডাক্তার, কবিরাজ
সরকারী চাকুরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ
ধর্মীয় বা দাতব্য অনুষ্ঠানে নিয়োগ
গৃহভৃত্য ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

জন স্বাস্থ্য

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রসার

ইং ১৮৬২ সালের পূর্বে বর্ধমানের সাধারণ স্বাস্থ্য বাংলার অন্যান্য বহু অঞ্চলের তুলনায় ছিল উন্নত ; ইহার জলবায়ু ছিল মনোরম ও প্রীতিকর। তখন কলিকাতা হইতে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুর, গিরিডি, কারমাটার প্রভৃতি স্থানের পরিবর্তে বর্ধমানকেই বেশী পছন্দ করিতেন। এই সালেই ম্যালেরিয়া প্রথম বর্ধমানে প্রবেশ করে ও ক্রমে মহামারীর রূপ ধারণ করে। সুদৃঢ় বাঁধে দামোদরের বন্যাজল প্রতিরোধ, চিরন্তন জলধারার অবনতি বা বিলুপ্তি, বদ্ধ জলস্রোত প্রভৃতি ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায় হয়। কালক্রমে যদিও এই ব্যাধির উগ্রতা ও সন্থ মারণ ক্ষমতার লাঘব হয়, বহুকাল ধরিয়া ইহার প্রকোপ পল্লী ও নাগরিক জীবনের অভিশাপ হইয়া বর্তমান থাকে। ম্যালেরিয়া জিলার অধিবাসীকে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য ও স্বাস্থ্যহীন করে। ইং ১৯০৮ সালে যখন জিলা গেজেটিয়র (District Gazeteer) প্রণীত হয়, তখন ম্যালেরিয়ার বিজয় অভিযান অক্ষুণ্ণ ছিল। বিগত ১৯২৬-১৯৩৪ সালের সেটেলমেণ্ট বিবরণীতে (Survey and Settlement Report) ইহার নিদারুণ প্রকোপের উল্লেখ আছে। ইং ১৯৪৪ সালের সরকারী কৃষিতথ্য বিবরণীতে (Agricultural Statistics) ইহার প্রাখর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া ব্যতীত আরও কয়েকটী ব্যাধি বহুকাল যাবৎ স্থানীয় অধিবাসিগণের সন্ত্রাস বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছে— কলেরা, বসন্ত, আন্ত্রিক জ্বর ও আন্ত্রিক পীড়া। পানীয় জলের অভাব, জীবন-যাত্রার নিম্নস্তর, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব ও সাধারণের অজ্ঞতা, ইহারা ছিল এই সকল ব্যাধির বিস্তারের কারণ।

ইহাদের উগ্রতা প্রশমন

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবৃত্তির জন্য ডাঃ বেণ্টলি (Dr. Bentley) প্রমুখ বহু মনস্বী গবেষণা করিয়া গিয়াছেন ও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও কার্যকরী কর্মপন্থা বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হয় নাই বলিলেও চলে। এই

সময় পানাগড় প্রভৃতি কয়েকটী ম্যালেরিয়া প্রধান অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী বিশদভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং ইহার মধ্যে ছিল আবদ্ধ-জল-নিষ্কাশন, সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও ডি.ডি.টি. প্রভৃতি প্রয়োগে মশককুল নিধন। প্রথমে সামরিক কেন্দ্রেই এই কর্মসূচীর প্রবর্তন করা হয় এবং পরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহার প্রসার হয়। এই কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য অসমারিক কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করেন। ইং ১৯৪৭ সালের পর কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করা হয় ও ইহার সহিত উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নূতননূতন চিকিৎসা-কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বদ্ধজল নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্যান্য কার্য্যসূচীও অবলম্বন করা হয় এবং এই সকল বিধিব্যবস্থার ফলে ম্যালেরিয়া আয়ত্তে আসে ও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পায়। কয়েকটি বিশেষ ব্যাধির আক্রমণজনিত মৃত্যুর হারের একটী তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল এবং ইহা হইতে হ্রাসের পরিমাণ বোঝা যাইবে :

	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৫৪	১৯৫৭
ম্যালেরিয়া	৬০৪২৫	৩৮৮৪৭	৩৯৪৯৬	২৩৯৮৮	১৩৪৮৬	১১৮৯	৪৪৩
কলেরা	২৫৬০	৪৩০১	২৮১৪	১৬৩৬	৩৬৯	২২১	২৪৭
বসন্ত		১২৫০		১২৭১	১৮২৩	২২৫	৩৬
আন্ত্রিক ব্যাধি				২০২৯	১৫৫১	১০২৬	৯৯৫

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জিলায় যে সকল সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ডাক্তারখানা বা ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল তাহাদের অবস্থানের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

অবস্থান	প্রতিষ্ঠার সময়
বর্ধমান	ইং ১৮৩৭ সাল
কাটোয়া	„ ১৮৬০ „
রাণীগঞ্জ	„ ১৮৬৭ „
দাঁইহাট	ইং ১৮০২ „
পূর্বস্থলী	„ ১৮৯৬ „
কুলিন গ্রাম	„ ১৮০৫ „
মাহাতা	„ ১৮০২ „

চিকিৎসা কেন্দ্র বর্তমান শতাব্দীর প্রথম

অবস্থান	প্রতিষ্ঠার সময়
মেরাল	„ ১৮০২ সাল
জামনা	„ ১৮০৬ „
আদরা	„ ১৮০৪ „
খণ্ডঘোষ	„ „ „
মঙ্গলকোট	„ „ „
কেতু গ্রাম	„ ১৮০৫ „
আউশ গ্রাম	„ „ „
চকদিঘি	„ ১৮৫৯ „
কাঞ্চননগর	„ ১৯০৬ „

এই সব ভিন্ন বর্ধমান-রাজ স্থাপিত বর্ধমান-রাজ-হাসপাতাল ও কালনা রাজ-হাসপাতালও ছিল। পূর্বভারতীয় রেল-কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় বর্ধমান, আসানসোল, অণ্ডাল ও সীতারামপুরে ডাক্তারখানা ছিল। মিশনরী পরিচালিত একটি হাসপাতালও কালনায় অবস্থিত ছিল।

বর্তমান চিকিৎসা কেন্দ্র

ইং ১৯০৮ সালে বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এই হাসপাতালটীর ক্রমশঃ সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধিত হয় এবং বর্তমানে ইহা একটী প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল। আসানসোল মহকুমার শ্রমাঞ্চলে কয়েকটী উচ্চ শ্রেণীর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শাঁকতোরিয়া ও কল্লা হাসপাতালের নাম উল্লেখযোগ্য। আসানসোলে পূর্ব-রেলপথ পরিচালিত একটী প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল আছে। জিলার অন্যান্য স্থলে যে সকল চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :

হাসপাতাল—

রাজ্য-সরকার	৬
জিলাবোর্ড	১
অন্যান্য	৪

ডিস্পেন্সারি—

জিলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড	৬৭
রেলপথ	৬
অন্যান্য	১৫

স্বাস্থ্য কেন্দ্র— ৩০

কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়— ২১

কুষ্ঠ ব্যাধি সমস্যা

আসানসোল মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি একটি সাধারণ রোগ হিসাবে বর্তমান। নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যেই এই ব্যাধির প্রকোপ অধিক। সরকারী হিসাব অনুসারে কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে যাহারা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন কুষ্ঠ-কেন্দ্রে সমবেত হয় তাহাদের সংখ্যা গড়ে প্রায় ৫০০০ হাজার।

প্রথম কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপনের কৃতিত্ব খৃষ্টান মিশনরিগণের। ইহাদের প্রচেষ্টায় ইং ১৮৯৩ সালে রাণীগঞ্জে প্রথম কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়। পরে একটি কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয় আসানসোলে। কিন্তু ইং ১৯৩০-৩১ সালের পূর্বে কুষ্ঠ চিকিৎসা কিম্বা এই ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। এই বৎসর দিশেরগড়ে একটি কুষ্ঠ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর কলিকাতার স্কুল অব্ ট্রপিকাল্ মেডিসিন (School of Tropical Medicine)-এর কুষ্ঠশাখা কয়লাখনি অঞ্চলে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় এবং ইহাতে দেখা যায় যে খনি অঞ্চলের শতকরা প্রায় দুইজন লোক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। ইহার পর ইং ১৯৩২-৩৩ সালে আসানসোলের খনি-স্বাস্থ্য সংস্থা (Mines Health Board) রাণীগঞ্জ এলাকায় বিশদ তদন্তের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযোগ করেন। তাঁহার তদন্তের ফলে বোর্ড তিনটি কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন; তাহাদের অবস্থান আসানসোল, জামুরিয়া ও হরিপুর। এই বৎসর সীতারামপুরেও একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রাণীগঞ্জ খনি এলাকা তদন্তে দেখা যায় যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা পল্লী অঞ্চলে শতকরা ২ জন ও খনি অঞ্চলে শতকরা '০৭ জন। ফলে খনি স্বাস্থ্য-বোর্ডের কুষ্ঠ প্রতিষেধক অভিযানে সহাযতার জন্য কয়েকটি বেসরকারী কুষ্ঠত্রাণ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত হয। কুষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসা-কেন্দ্রের বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হয। ইহাতে স্থির হয় যে কুষ্ঠ-ত্রাণ সমিতি খনি-স্বাস্থ্যবোর্ডের কুষ্ঠ বিভাগের সহযোগে কাজ করিবে ও কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান (Leprosy Board) নামীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সমিতিসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি কুষ্ঠত্রাণ সমিতি ও চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হয। আসানসোলে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল ও কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। কুষ্ঠ রোগীদের স্বতন্ত্রীকরণের জন্য কয়েকটি কেন্দ্রও খোলা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন কুষ্ঠত্রাণ সমিতির তত্ত্বাবধানে যে-সকল চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি আছে তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ :

	কুষ্ঠত্রাণ সমিতি	সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রভৃতি
১।	লালগঞ্জ কুষ্ঠত্রাণ সমিতি	লালগঞ্জ কুষ্ঠ-চিকিৎসা-কেন্দ্র
২।	জেমেহারি "	জেমেহারি "
৩।	কুলটি "	কুলটি "
		বরাকর স্বতন্ত্র কেন্দ্র
৪।	সীতারামপুর "	সীতারামপুর কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র
৫।	শাঁকতোরিয়া "	শাঁকতোরিয়া "
		" স্বতন্ত্র কেন্দ্র
৬।	আসানসোল "	আসানসোল কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র
		" কুষ্ঠ হাসপাতাল
		" কুষ্ঠাশ্রম
৭।	কালি পাহাড়ি "	চাঁদা কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র
		" স্বতন্ত্র কেন্দ্র
৮।	রাণীগঞ্জ "	রাণীগঞ্জ কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র
৯।	কাজোরা "	কাজোরা "
১০।	জামুরিয়া "	জামুরিয়া "
		" স্বতন্ত্র কেন্দ্র
১১।	দোমোহানি "	দোমোহানি "
		" কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র
১২।	উখরা "	উখরা "
১৩।	জামবাদ "	জামবাদ "
১৪।	পাণ্ডবেশ্বর "	পাণ্ডবেশ্বর "

কুষ্ঠ ব্যাধির অস্তিত্ব ও প্রসার আসানসোল মহকুমার একটি বিশেষ সমস্যা। এই ব্যাধির আবির্ভাব বা বিস্তারের কারণ সঠিক স্থির হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভূস্তরের গঠন ও স্থানীয় জলবায়ুর সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। দৈন্য ও নিম্নস্তরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ইহার একটি কারণ, এ কথাও কেহ কেহ বলেন। ইহা সত্য যে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত দরিদ্র সমাজে ব্যাধির প্রসার বেশী। কুষ্ঠ রোগীর জীবন দুঃখময়। সংসারে বা সমাজে তাহার স্থান অতি হীন। রোগ-বৃদ্ধি অবস্থায় কুষ্ঠ রোগী কাজ কর্ম করিবার শক্তি হারায়। এই ব্যাধির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাচীন শিক্ষা-প্রথা

প্রাচীন কাল হইতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল সাধারণ সমাজ জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইং ১৮০২ সালে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ বহু সংখ্যক পাঠশালার অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কোনও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল না, যেখানে পাঠশালা অবস্থিত ছিল না। এই সকল পাঠশালায় প্রাথমিক লেখাপড়া ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত। অঙ্ক শিক্ষার ধারা ছিল শুভঙ্করী মতে। অধিকাংশ বালকই পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া নিজ নিজ পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমিদারের কাছারীতে কয়েকদিন শিক্ষানবিশ থাকিয়া গোমস্তা বা অনুরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিত। মুসলমান বালকেরাও এই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিত কিন্তু মুসলমানপ্রধান গ্রামে পাঠশালার স্থলে ছিল মক্তব। মক্তবে প্রাথমিক অঙ্ক ব্যতিত পারসি কিম্বা উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ব্রাহ্মণ বালকদের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত শিক্ষার অভিলাষী হইত তাহারা পড়িত টোল বা চতুষ্পাঠীতে। টোলের অধ্যক্ষ থাকিতেন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। টোল ছিল আবাসিক; ছাত্র অথবা পড়ুয়াগণ এখানে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। টোলের শিক্ষা আরম্ভ হইত সংস্কৃত ব্যাকরণে। ব্যাকরণ পাঠ সমাপন হইবার পর সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত। তারপর কেহ পড়িত ন্যায়, কেহ বা স্মৃতি। অবশ্য একই পণ্ডিত ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন না. নৈয়ায়িক পণ্ডিতের টোলে পড়ান হইত ন্যায়, আর স্মার্ত পণ্ডিতের টোলে স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির জন্য বহু সংখ্যক টোল এই অঞ্চলে ছিল, তাহাদের মধ্যে মানকর, জৌগ্রাম, ভাঙ্গামোড়া প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। কোনও কোনও ছাত্র আবার নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে পড়িতে যাইত। আবার অনেকে যাইত দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতে মিথিলা এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বেদ পড়িবার জন্য কাশী। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরিয়া তাহারা নিজেরাই টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিত।

মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। জিলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল বহু। মাদ্রাসাও ছিল আবাসিক; আহার বাসস্থান ও শিক্ষা বিনাব্যয়ে মিলিত। এখানে মৌলবী সাহেব কোরাণ, হদিস, আরবি ও পারসি সাহিত্য শিক্ষা দিতেন।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনও ছিল। উচ্চ-শ্রেণীর কোন কোন মহিলা সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোটার রূপমঞ্জরী দেবী, শাঁকনাড়ার কুড়ুনি দেবী, খণ্ড-ঘোষের ভগবতী দেবী ও হটি বিদ্যালঙ্কার। রূপমঞ্জরী কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরজীবন অধ্যাপনা কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কুড়ুনি দেবী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জননী। তাঁহার স্বামীও একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন; স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনিই অধ্যাপনা পরিচালনা করিতেন। ভগবতী দেবী বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। হটি বিদ্যালঙ্কারও একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিতেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জিলায় শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা উইলিয়ম্‌স্ অ্যাডাম্‌স্ (William Adams) নামক একজন ইংরেজের লিখিত বিবরণী হইতে পাওয়া যায়। অ্যাডাম্‌স্ সাহেব ইং ১৮৩০ সালে বাংলা ও বিহারের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করেন ও ইং ১৮৩৭ সালে তাঁহার বিবরণী প্রকাশ করেন। তাহা হইতে বর্ধমান জিলার তৎকালীন নানা শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়ঃ

থানা	বাংলা	সংস্কৃত	পারসি	আরবি	ইংরাজী	বালিকা	শিশু
কালনা	৭৩	৫৭	৬	১	১	১	—
পূর্বস্থলী	৩৩	১৮	৩	—	—	—	—
গাঙ্গুরিয়া (বর্তমান মেমারির অংশ)	১৬	৭	১	১	—	—	—
রায়না	৭২	১৪	১০	২	—	—	—
সেলিমাবাদ (বর্তমান জামালপুর)	৬৬	৮	২	—	—	—	—

থানা	বাংলা	সংস্কৃত	পারসি	আরবি	ইংরাজী	বালিকা	শিশু
ইন্দাস (বর্তমান বাঁকুড়া ভুক্ত)	৪৩	৬	৮	৩	—	—	—
মন্তেশ্বর	৪৩	৬	৯	—	—	—	—
বালকৃষ্ণ (বর্তমান বর্ধমান থানার অংশ)	২৬	২৫	১২	—	—	—	—
পোতনা (বর্তমান গলসির অংশ)	৫৩	১০	৯	—	—	—	—
কাটোয়া	৩১	১৩	—	—	—	১	—
বর্ধমান	৩৭	২	১০	৪	২	২	১
মঙ্গলকোট	৮৫	১০	৪	—	—	—	—
আউশগ্রাম	৯১	৩২	১৯	—	—	—	—
মোট	৬২৯	১৯০	৯৩	১১	৩	৪	১

৬২৯টি বাংলা বিদ্যালয় ছিল পাঠশালা পর্যায়ের। ইহাদের সংখ্যা বর্ধিষ্ণু গ্রামে ছিল একাধিক ; এক গ্রামে ইহা ছিল সাত, একগ্রামে ছয়, আর এক গ্রামে পাঁচ। তেরটি বিদ্যালয় ছিল মিশনরী পরিচালিত। বর্ধমানের মহারাজার একটি নিজস্ব বিদ্যালয় ছিল। বিভিন্ন জাতির বা শ্রেণীর লোক শিক্ষকতা করিতেন, শিক্ষককে বলা হইত পণ্ডিত বা পণ্ডিত মহাশয়। বহু নিম্নবর্ণের লোকও পণ্ডিতের কাজ করিতেন। পণ্ডিতের প্রাপ্য ছিল এইরূপ : ২৬ জন গ্রাম হইতে মাসোয়ারা বা বৃত্তি পাইতেন, ৫৮ জন ছাত্রদের বেতনের উপর নির্ভর করিতেন। মিশনরী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মিশন হইতে বেতন পাইতেন, মহারাজাও তাঁহার বিদ্যালয়ের পণ্ডিতকে অর্থ দান করিতেন। অবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা চাউল, তরকারী ও সংসারের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে প্রণামী পাইতেন। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের আবার অন্য বৃত্তি ছিল, যেমন পৌরোহিত্য বা যজমানি, কৃষি, লগ্নি কারবার, তাঁত, মুদিখানা ইত্যাদি। মিশনরী বিদ্যালয়ে ও মহারাজার পাঠশালায় পড়ুয়াগণ কাগজ, কলম, দোয়াত, বই, তালপাতা প্রভৃতি বিনাব্যয়ে পাইত ; মহারাজা আবার প্রত্যেক পড়ুয়াকে

জলখাবার বাবদ এক বুড়ি করিয়া দিতেন ও প্রতি চারি বৎসরের জন্য তিনজন হিন্দু ছাত্রের যাবতীয় ভার বহন করিতেন।

বাংলা বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩১৯০ ; তাহার মধ্যে ছিল ৭৬৯ জন মুসলমান, ১৩ জন খৃষ্টান ও অবশিষ্ট হিন্দু। হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সব জাতিই ছিল কিন্তু উচ্চবর্ণের বালকের সংখ্যাই ছিল বেশী। ৭৬০ জন নিম্নজাতির ছাত্রের মধ্যে ৮৬ জন পড়িত মিশনরী বিদ্যালয়ে। এই ১৩১৯০ জন ছাত্রের শিক্ষার স্তর ছিল এইরূপ :

মাত্র মাটির ওপর অক্ষর লেখায়	৭০২
তালপাতে "	৭১১৩
কলাপাতে লেখায়	২৭৬৫
কাগজে লেখায়	২৬১০

অক্ষর পরিচয় ও বানান শিক্ষার সহিত ছেলেরা পড়িত শুভঙ্করী, গঙ্গা-বন্দনা, যোগাদ্যা-বন্দনা, দাতাকর্ণ, হাতেমতাই, কাশিরাম মহাভারতের আদিপর্ব। সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে, বহির্বাটীতে অথবা জমিদারের কাছারী বাড়ীতে এই বিদ্যালয় বসিত।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি চতুষ্পাঠী বা টোল। ১৯০টি টোলের ভিতর দুই গ্রামেই ছিল প্রত্যেক গ্রামে ছয়টি করিয়া ; এক গ্রামে ছিল পাঁচটি, তিনটি গ্রামে ছিল প্রত্যেক গ্রামে চারটি করিয়া আর সাতটি গ্রামে ছিল প্রত্যেক গ্রামে তিনটি করিয়া। সাতাশটি গ্রামে ছিল প্রতিগ্রামে দুইটি করিয়া আর ছিয়াশীটি গ্রামে ছিল প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া। পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন বৈদ্য, অবশিষ্ট সকলে ব্রাহ্মণ। টোলগুলির অধিকাংশই ছিল পণ্ডিত মহাশয়ের নিজগৃহে, পড়ুয়াগণ এখানে বিনাব্যয়ে শিক্ষা, বাসস্থান ও আহার পাইত। কোন কোন গ্রামে আবার জমিদার-শ্রেণী টোলগৃহ নির্মাণ করিয়া যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন। টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩৫৮ ; ইহার মধ্যে ৫৯০ জন ছিল গ্রামেরই অধিবাসী, অবশিষ্ট ছিল বহিরাগত। ব্রাহ্মণ পড়ুয়াদের সংখ্যা ছিল বেশী ; বৈদ্য ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের পড়ুয়াদের সংখ্যা নগণ্য। টোলে পড়ান হইত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত, সংহিতা, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ। পণ্ডিতগণের আয় হইত বৃত্তি, সভা-দক্ষিণা ও প্রণামী হইতে।

তখন বর্ধমান ছিল বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাসভূমি। অ্যাডাম্‌স্‌ সাহেব নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের উল্লেখ করিয়াছেন :

অম্বিকা কালনার কালিদাস সার্বভৌম, মনু ও মিতাক্ষরার অনুবাদক।

বাগুনিয়ার গুরুচরণ তর্কপঞ্চানন ; শ্রীকৃষ্ণ লীলাম্বুধি নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা।

বড বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ; 'গৌর চন্দ্রামৃত', 'মুক্তিদীপিকা' ও 'মনোদূত' নামক তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লেখক। মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ ; অলঙ্কার কৌস্তুভ নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের টীকা লেখক :

মারোর রঘুনন্দন গোস্বামী বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার ৩৭ খানি রচনাব পরিচয় পাওয়া যায়, অধিকাংশই আধ্যাত্মিক বিষয়ের।

বর্ধমানের রামকমল কবিভূষণ ; মহারাজা তেজচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে "নয়নানন্দ" নাটক প্রণেতা ও 'ভাবার্থদর্শ' নামক ব্যাকরণ রচয়িতা।

চানকের রাধাকান্ত বাচস্পতি ; নিকুঞ্জ বিলাস, স্মর্যপঞ্চাশৎ; দুর্গাশতক প্রভৃতি লেখক।

পারসি ও আরবি শিক্ষা দেওয়া হইত মক্তব ও মাদ্রাসায়। মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানে কোবান পডান হইত। পারসির জন্য ছিল ৯০টি আর আরবির জন্য ৮টি প্রতিষ্ঠান। আরবি ও কোরান পডাইতেন মৌলবী। পারসি শিক্ষকেব ভিতর ছিলেন সাতজন হিন্দু ; ইঁহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন ব্রাহ্মণ, চারজন কায়স্থ ও একজন গন্ধবণিক। শিক্ষকগণের ২২ জন অধ্যাপনার জন্য কিছুই লইতেন না ; ছয়জন আবার ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন—ইঁহারা ছিলেন বর্ধিষ্ণু মুসলমান অথবা আয়মাদার। অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে ২১ জন ছিলেন বৃত্তিভোগী, ১৪ জন ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল, অবশিষ্ট সকলে আংশিক ছাত্র-বেতন বা মাসিক বৃত্তি সহ পাইতেন চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৭১। তাহার ভিতর পারসি পড়িত ৮৯৯ ও ইহাদের ভিতর ছিল ৪৪৮ জন হিন্দু। হিন্দু ছাত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সদ্‌গোপের সংখ্যাই ছিল বেশী।

তিনটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ছিল কালনার জাপটে আর দুইটি বর্ধমান শহরে। কালনার একটি ও বর্ধমানের একটি বিদ্যালয় ছিল মিশনরী পরিচালিত। বর্ধমানের অন্য বিদ্যালয়টি ছিল মহারাজার। কালনার বিদ্যালয় বসিত গীর্জাঘরের এক পার্শ্বে। বর্ধমানের মিশনরী বিদ্যালয় নির্মাণ করেন মহারাজা। মহারাজার নিজ বিদ্যালয় ছিল তাঁহার প্রাসাদ সংলগ্ন। তিনটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২০; ইহাদের মধ্যে হিন্দু ১১২, মুসলমান ৬ ও খৃষ্টান ২। শিক্ষাদান হইত বিনাবেতনে। মিশনরী বিদ্যালয়ে ইংরেজীর সহিত পড়ান হইত বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও বাইবেল। মহারাজার বিদ্যালয়েও ইংরেজীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত।

বালিকা বিদ্যালয়ের সবগুলিই ছিল মিশনরীদের। ইহাদের একটি ছিল কালনায়, একটি কাটোয়ায় আর দুইটি বর্ধমানে। ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭৫; হিন্দু ১০৮, খৃষ্টান ৬৬, মুসলমান ১। কোনও উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকা এখানে পড়িত না। হিন্দু ছাত্রীগণ ছিল বাগদি, মুচি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর। এখানে মাত্র বাংলাই পড়ান হইত। পাঠ্য-পুস্তকের বেশীর ভাগই ছিল খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে। বালিকাদের সুঁচের কাজও শিক্ষা দেওয়া হইত।

বর্ধমানে মিশনরীদের একটি শিশু বিদ্যালয় ছিল। ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫।

শিক্ষায় নূতন ব্যবস্থা— মিশনরী স্কুল

ইং ১৮১৬ সালে ক্যাপটেন ষ্টুয়ার্ট (Captain Stuart) নামক একজন ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর প্রচেষ্টায় মিশনরী পরিচালিত দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দুই বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দশ হয় ও ছাত্র সংখ্যা হয় প্রায় এক হাজার। সাধারণ বাংলা পাঠ ভিন্ন এখানে পড়ান হইত ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান। কোম্পানির শাসন সম্বন্ধে বালকদের মনে যাহাতে ভাল ধারণা জন্মে, সেই বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইত। ইং ১৮৩০ সালে এই শ্রেণীর মিশনরী পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ১৩। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বিদ্যালয়গুলি সুনাম অর্জন করে ও অ্যাডাম্‌স্ সাহেব তাঁহার বিবরণীতে ইহাদের সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মিশনরিগণ কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয়, ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা

পূর্বে বলা হইয়াছে। মিশনরীদের শিক্ষা পদ্ধতির অনুকরণে এই জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু ইং ১৮৩৫ সালের ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহিত ইংরেজী বিদ্যালয় বা স্কুল সমূহের বিশেষ সমাদর হয় নাই। ইং ১৮৫০ সালে মাত্র একটি.উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন ও ইহার প্রসারে বিলম্ব হয় নাই। ইং ১৮৬৮ সালে জিলার যে সকল সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজী স্কুল বা বিদ্যালযেব পরিচয় পাওয়া যায় তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার

ইং ১৮৬৮ সাল

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ১২। ইহাদের মধ্যে তিনটি ছিল মিশনরী পরিচালিত; একটি ছিল বর্ধমান শহবে, একটি কালনায় ও একটি মেমারিতে। মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫১৮। বর্ধমান শহরে মহারাজাও এইরূপ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ শত। বর্ধমান প্রবেশিকা বিদ্যালয নামে একটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও বর্ধমান শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চকদীঘির জমিদারগণের পরিচালনায় চকদীঘিতে এইরূপ একটি স্কুল স্থাপিত হয়। তাহা ব্যতীত কাটোয়া, কুলিনগ্রাম, ওকরশা, বেলগোনা, বাগনাপাড়া ও বাদলায় এই জাতীয় বে-সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় ২২। ইহাদের মধ্যে আমাদপুর, গলসি ও বরাকবের বিদ্যালয়গুলি সরকার হইতে সাহায্য পাইত। অপর-গুলির ব্যয়ভার বহন করিত স্থানীয় জনসাধারণ।

ইংরেজ স্কুল—১। ইংরেজ শিশুদের জন্য এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ইং ১৮৬৬-৬৭ সালে।

বালিকা মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয়—৯। ইহাদের সবগুলিই ছিল মিশনরী পরিচালিত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এইরূপ। ইংরেজী স্কুল সমূহের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রসার

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—২৮। ইহাদের মধ্যে ১৬টি ছিল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির পরিচয় পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া

সাহায্য-প্রাপ্ত	অন্যান্য
বর্ধমান মিউনিসিপাল	বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট
ভৈটা	„ আলবার্ট ভিকটর
মেমারি	গোপালপুর
নাসিগ্রাম	শাঁখারি
মানকর	তোরকোনা
রায়না	চকদীঘি
বাদলা	কালনা রাজ
বাগনাপাড়া	পুটস্থুরি
পাটুলি	মাথরুন
পূর্বস্থলি	উখরা
কাটোয়া	ইথোরা
দাঁইহাট	সেয়ার সোল
ওকরশা	
রাণীগঞ্জ	
আসানসোল রেলওয়ে	
শাঁকতোরিয়া	

মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় ৮৫। ইহাদের মধ্যে জিলা বোর্ড পরিচালিত ছিল ৪, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ৬১, অন্যান্য শ্রেণীর ২০।

মাধ্যমিক বাংলা বিদ্যালয় ২২। জিলা বোর্ড ইহাদের মধ্যে চারিটি পরিচালনা করিত; ষোলটি ছিল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও মাত্র দুইটি অন্যান্য শ্রেণীর।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৩৮। ইহাদের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক ছিল ২২১ ও নিম্ন প্রাথমিক ৯১৭। আটটি ছিল সরকারী পরিচালনায় ও একটি ছিল মিউনিসিপালিটির অধীন। অবশিষ্টগুলি বেসরকারী কিন্তু তাহাদের মধ্যে ৯৭২টি সরকার হইতে সাহায্য পাইত। সরকারী সাহায্য-প্রাপ্তদের মধ্যে ছিল আসানসোল অঞ্চলের আটটি কোলিয়ারি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়। খনি শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা বাবদ সরকারী বরাদ্দ বার্ষিক ৮০০ শত টাকা হইতে ইহারা সাহায্য পাইত। চারিটি বিদ্যালয় সাহায্য পাইত সরকারী খাস মহালের আয়

হইতে, ২৮টি মিউনিসিপালিটি হইতে ও ৭২১টি জিলা বোর্ড হইতে। সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কোনটিরই অবস্থা ভাল ছিল না।

বালিকা বিদ্যালয় ৭৬। ইহাদের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। সবগুলিই ছিল নিম্ন কিম্বা উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের। সাতটি ছিল সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত। জিলা বোর্ড সাহায্য করিত ৫৯টি ও মিউনিসিপালিটি ৩টি। অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি কোনও সাহায্য পাইত না। সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পাঁচটি মিশনরী পরিচালিত ছিল।

ইউরোপিয়ান বিদ্যালয় ৩। এইগুলি ছিল ইংরেজ বালক বালিকাদের জন্য। ইহাদের একটি ছিল পূর্ব ভারতীয় রেল কোম্পানির পরিচালনায়, আসানসোলে। আর দুইটি ছিল মিশনরী পরিচালিত, সেণ্ট প্যাট্রিক ও লোরেটো কনভেণ্ট। শেষোক্তটি ছিল মাত্র বালিকাদের জন্য। ইহাদেরও অবস্থান ছিল আসানসোলে।

টেক্‌নিকাল বিদ্যালয় ২। বর্ধমানে ইহাদের একটি অবস্থিত ছিল, পরিচালনা করিত জিলা বোর্ড। অন্যটির অবস্থান ছিল রাণীগঞ্জ, খার-স্থলিতে। ইহা ছিল ওয়েস্‌লিয়েন মিশনের পরিচালনায়।

মকতব ও মাদ্রাসা—৭৮। ইহাদের মধ্যে ৬২টি মকতব সরকারী, জিলা বোর্ডের অথবা মিউনিসিপালিটির সাহায্য পাইত। মাদ্রাসার মধ্যে মাত্র রাইগ্রাম মাদ্রাসা ছিল সরকারী সাহায্যপুষ্ট।

উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলি ভিন্ন ছিল কয়েকটি চতুষ্পাঠী বা টোল। ইহারা কোনরূপ সরকারী সাহায্য পাইত না আর ছিল ৪৩টি নৈশ বিদ্যালয়, কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য।

জিলায় মাত্র একটি কলেজ ছিল, তাহা হইল বর্ধমান রাজ কলেজ।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪,০০০ হাজার। কলেজগামী ছাত্র ছিল খুবই কম। ইং ১৯০৪ সালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৩; ১৯০৯ সালে এই সংখ্যা ৫৩ জনে নামিয়া আসে। তৎকালীন লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১,৩০,০০০ লোক অর্থাৎ প্রতি বারজনের মধ্যে একজন ছিল "শিক্ষিত" অর্থাৎ তাহারা কোন না কোন ভাষায় লিখিতে বা পড়িতে জানিত। ইহাদের মধ্যে

পুরুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৬'২ আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে মাত্র ৮ জন। ইংরেজীতে লিখিতে ও পড়িতে জানে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা এক জনের কিছু উপরে।

বর্তমান শিক্ষায়তন সমূহ

তারপর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি হইয়াছে। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে আট, ইহার মধ্যে দুইটি মহিলা কলেজ আছে। কলেজ সমূহের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০০০ হাজার। ইহা ব্যতীত দুর্গাপুরে একটি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ছাত্রসংখ্যা প্রায় একশত। বিভিন্ন স্কুল বা বিদ্যালয়-সমূহ সংখ্যায় বৃদ্ধি হইয়া বর্তমানে ২৬৫৪টি হইয়াছে ; ইহাদের পরিচয় ও আনুমানিক ছাত্রসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :

স্কুল	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	মন্তব্য
উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় (Higher secondary multipurpose)	৬০	প্রায় ৩০,০০০	৬টি বালিকাদের জন্য
উচ্চ বিদ্যালয় (High school)	১১২	„ ৩২,০০৫	১৪টি „
উচ্চ বুনিয়াদি (Senior Basic)	২৩	১,৬৪০	„
নিম্ন বুনিয়াদি ও প্রাথমিক	২২৬৩	„ ২,২৩,০০০	৪৯টি „
উচ্চ প্রাথমিক	১৮৬	„ ১৮,০০০	২৫টি „
ইঞ্জিনিয়ারীং	২	„ ১,১০০	
টেক্‌নিকাল	৩	„ ৫০০	
মেডিকাল	১	„ ২২৫	
গুরু ট্রেনিং (Guru training	৪	„ ২৫০	১টী মহিলাদের

বর্তমানে মাদ্রাসা ও মক্তবের সংখ্যা মাত্র আটটি, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৯০০ শত। চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ৫২টি, মোট ছাত্র বা পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত।

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিন লক্ষেরও উপর ; তাহার মধ্যে বালিকা বা মহিলার সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জিলায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৯'৬ ; তাহার মধ্যে পুরুষ ৩৯'৪ ও নারী ১৮'১।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনযাত্রার মান ও প্রণালী

যে দেশে জীবনযাত্রা প্রণালী জাতি সংস্কার, সামাজিক প্রথা, বৃত্তি ও অন্যান্য সমস্যার সহিত জড়িত, তথাকার সাধারণ জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ উক্তি ভিন্ন আর কিছু সম্ভব নহে। পূর্বে বর্ধমানবাসীদের জীবনযাপন প্রণালী ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। হাণ্টার সাহেব তাঁহার পল্লী বাংলার কাহিনী (Annals of Rural Bengal) নামক পুস্তকে বর্ধমান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তখনকাব দিনে সাধারণ লোকের পরিধেয় ছিল মাত্র ছোট একখানা মোটা ধুতি আর গামছা; বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ পরিধান করিতেন ধুতি ও চাদর আর ব্যবহার করিতেন চটিজুতা। সে আজ প্রায় একশত বৎসবের পূর্বের কথা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে কিম্বা তার কিছু পরও ইহাই ছিল সাধারণ পোষাক। পচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও প্রাতরাশ বা জলখাবার বলিতে বুঝাইত মুড়ি আর আকের গুড। মুড়ি ছিল এইরূপ প্রিয় ও অপরিহার্য্য যে বয়স্ক ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বিচার করিবার জন্য জিজ্ঞাস্য ছিল যে তিনি মুড়ি চিবাইতে পারেন কিনা। মধ্যাহ্নের আহার ছিল ভাতের সহিত কড়াই ডাল ও পোস্ত, বিশেষ বিশেষ সময়ে ইহার সহিত যোগ হইত অল্প মাছ। সম্পন্ন গৃহস্থ খাঁটি গব্য-ঘৃতে প্রস্তুত লুচি দ্বারা অতিথি সৎকার করিতেন; দুধ-মুড়িও প্রিয় ছিল। তামাকের ব্যবহার হুকা কল্কি সংযোগেই সমাধা হইত। মাত্র সচ্ছল গৃহস্থের ঘরেই গ্রামোফোন দেখা যাইত। পল্লীবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য ছিল যাত্রা, ভাসানগান, কীর্তন ও কবির লডাই। আর ছিল জনপ্রিয় ল'টে গান। কীর্তন বা হরি-সংকীর্তন কখনও বা সারা দিনরাত বা কয়েকটি দিনরাত ধরিয়া চলিত; স্থায়ীকাল হিসাবে ইহাকে বলা হইত অহোরাত্র, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর বা পঞ্চরাত্র। অবস্থাপন্ন গৃহে বৈঠকি গানের প্রচলন ছিল। তখন পরিবারবর্গের মাথা প্রতি মাত্র চার আনা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল

দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পূর্বের কথা

যে গৃহস্থ দৈনিক ব্যয় করিতে সমর্থ ছিলেন তিনি গণ্য হইতেন সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া ; দৈনিক মাথা প্রতি ছয় আনা ব্যয় ছিল সচ্ছলতার পরিচায়ক, আর গৃহস্থ যদি প্রত্যেকের জন্য আট আনা ব্যয় করিতে পারিতেন, তাঁহার অবস্থা উচ্চ-মান নির্দেশক বলিয়া পরিগণিত হইত।

মহাযুদ্ধের পরের কথা

বর্তমানে এই কাহিনী হইয়াছে অতীতের বিষয়। ইং ১৯৪০ সালের পর অর্থনীতিক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল তাহা জীবনযাত্রার মান ও স্তর দুইটিতেই বিপর্যয় আনিল। যে সকল কারণে ইহার সৃষ্টি ও বিস্তৃতি লাভ হয় তাহার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি। ইহার পূর্বেই দামোদর ক্যানাল সমষ্টির খাল সমূহ বর্ধমানের এক অংশকে যথা সময়ে সেচন জল-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা হইতে বহু পরিমাণে নিশ্চিন্ত করে ও ইহার একটি ঊষর অঞ্চলকে উর্বর ও শস্যশালী করে। যুদ্ধোত্তরকালেও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি বজায় থাকে ও তাহার সহিত যোগ হয় নূতন নূতন ক্যানাল সমষ্টির সহায়ে এক বিস্তৃত অঞ্চলে জলসেচনের ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার এবং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রা প্রণালী যে রূপ পরিগ্রহ করিল, তাহা হইল এই পরিবর্তন জনিত সুখ-সুবিধাগুলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া জীবন উপভোগ। পূর্বে চা ছিল পল্লীগ্রামে দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু এখন প্রাতে অন্ততঃ এক পেয়ালা চায়ের প্রলোভন ত্যাগ পল্লীযুবকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। গ্রামের কোণে, হাটে বা বাজারে ও পথিপার্শ্বে চায়ের দোকান সমূহের প্রাচুর্য্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জলখাবারের জন্য মুড়ির প্রচলন এখনও আছে বটে কিন্তু পাউরুটি ও বিস্কুট মুড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শহরের নাগরিক কিম্বা পল্লীগ্রামের সচ্ছল গৃহস্থের নিকট মাছ একরূপ দৈনিক আহার্য্য। শহর অঞ্চলে আবার মাংসের প্রসার বাড়িতেছে। আলু, পটল, কপি প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধির সহিত তাহাদের ব্যবহারও প্রসার লাভ করিতেছে। খাঁটি ঘি এখন দুষ্প্রাপ্য কিন্তু দালদা বা অনুরূপ উদ্ভিজ্জ খাদ্যের প্রচলন মাত্র শহরে নহে, পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। ক্রম-বর্ধমান মনোহারী দোকানের সংখ্যা দেশী বিদেশী নানাজাতীয় সৌখীন দ্রব্যের চাহিদা নির্দেশ করে। গ্রামান্তরে

অষ্টপ্রহর প্রভৃতির প্রচলন আছে বটে, কিন্তু যাত্রা, ভাসান বা কবিগান জনপ্রিয়তা হারাইতেছে ও তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে সিনেমা। এরূপ কোনও শহর বা প্রখ্যাত শিল্প বা বাণিজ্যকেন্দ্র নাই যেখানে সিনেমা-গৃহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সময় বিশেষে সুদূর পল্লীগ্রামেও সিনেমার ছবি দেখান হয়। গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ স্ব-গৃহে রেডিওসেট রাখা সুরুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। বাইসাইকেল সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবকেরও নিত্যসঙ্গী। টর্চ লাইট ও সিগারেটের প্রচলন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সস্তা মূল্যের সিগারেট ও বিড়ি হুকা কল্কিকে বিদায় করিতেছে। দৈনিক রন্ধনের জন্য যেখানে পূর্বে ঘুটে বা কাঠ ব্যবহৃত হইত সেখানে স্থান লাভ করিতেছে কয়লা। বিজলি বাতির চাহিদা বাড়িয়াছে এবং ডি.ভি.সির কল্যাণে দূর পল্লীগ্রামেও ইহার প্রসার হইতেছে।

উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের সহিত স্কুল ও কলেজ সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবস্থা সম্পন্ন এমন গৃহস্থ কমই আছেন যিনি পুত্রদের কলেজী শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে যৌতুকের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে এবং পাত্র যদি ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়র বা বিজ্ঞানের কৃতবিদ্য ছাত্র হয় তবে যৌতুকের মাত্রাধিক্য হয়। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে পাস্তালুন, সার্ট, পাজামার ব্যবহার যেমন ভদ্রতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, ভদ্রশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেও সেইরূপ স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার সুরুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। জিলার রাস্তাসমূহের উন্নতি হওয়ায় যাত্রীবাহী বাস চলিবার পথ সুগম হইয়াছে এবং নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোনও পথচারী যে-পথে বাস চলাচল করে সেই পথে পদব্রজে যাইতে চাহে না। পল্লীগ্রামে পুরাতন আমলের মাটির খড়ের ঘর কোনও সঙ্গতিশালী গৃহস্থ পছন্দ করেন না, সুতরাং সেখানে উঠিতেছে পাকা বাড়ী। পল্লীর পৈতৃক গৃহ ছাড়াও শহরে বাড়ী তৈয়ার করা অনেকেরই উচ্চাভিলাষ।

শিল্পসংস্থা প্রসারের সহিত বহু আধুনিক পদ্ধতির নূতন নূতন শহর উপনগরী ও পল্লী-আবাসের আবির্ভাব হইতেছে ও ইহার সহিত পরিবর্তন ঘটিতেছে পুরাতন দৃশ্য-পটের ও ভাবধারার।

সমাজের নিম্ন-স্তরের জীবনী

কিন্তু সমাজের একটি বিশাল অংশের জীবনধারার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। ইহা হইল নীচ বা নিম্নশ্রেণীর জীবন। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "বাংলার জনগণের মধ্যে আদিবাসী উপাদান" (Aboriginal element in the population of Bengal) নামক প্রবন্ধে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে যাহা লিখিয়াছেন, বর্তমানেও তাহার বিশেষ কোনও বিকৃতি হয় নাই।

"একই জিলায়, অনেক সময় বা একই গ্রামে একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও হিন্দু ও অর্ধহিন্দু আদিবাসীর রীতিনীতি ও জীবনধারণ প্রণালীতে এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে তাহা অতি সাধারণ দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি উন্নত ধর্মের আদর্শ ও পুরুষানুক্রমিক অর্জিত সুদৃঢ় সংস্কার সর্বশ্রেণীর বর্ণ হিন্দুকে শান্ত প্রকৃতি ও চিন্তাশীলতা প্রদান করিয়াছে; উন্নত সভ্যতা তাহাকে করিয়াছে হিসাবী, বিবেচক ও মিতব্যয়ী। নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের শিক্ষা তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াছে, তাহাকে কর্তব্য-পরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবাপন্ন আদিম অধিবাসীর চরিত্র ইহার বিপরীত। অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হওয়া তাহার প্রকৃতিজাত; উগ্র আনন্দ ও দৈহিক আনন্দ তাহার প্রথম কাম্য। ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে সে অক্ষম, সেইজন্যই পরে কি হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া সে যাবতীয় উপার্জন নিঃশেষ করে। কোন শ্রমকর্মে একনিষ্ঠভাবে লাগিয়া থাকিয়া জীবন যাপনে সে অপারগ, সুতরাং কৃষক না হইয়া কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করাই বেশী পছন্দ করে। সরল আমোদ ও উত্তেজনা প্রিয়, অপরিণামদর্শী, অমিতব্যয়ী ও সুরাসক্ত এই অর্ধআদিম অধিবাসী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান জীবনে পূর্ব-পুরুষের বহু সৎ ও নিকৃষ্ট গুণ বহন করিয়া আনিয়াছে। যে-গ্রামে ইহারা বাস করে, তাহার এক পৃথক অংশ ইহাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। নিকটবর্তী বর্ণ হিন্দুর পল্লীতে যে পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষিত পরিষ্কার গৃহ ও আঙ্গিনা পরিলক্ষিত হয় তাহার সহিত প্রতিবেশী বাউরি বা হাড়ী পাড়ার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অর্ধনগ্ন গৃহাবরণের প্রভেদ অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রামে যদি গবাদি পশু বা শূকর মৃত হয়, তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া মুচি কিম্বা বাউরি মাংস লইয়া যায় কিন্তু বর্ণহিন্দু মুখ ফিরায় অথবা নাকে কাপড় দেয়। গ্রামে যদি কোনও

গোপন মদ চোলাই-এর স্থান থাকে তাহা হাড়ী কিম্বা বাগ্‌দি পাড়ায়। এই পাড়ায় হাড়ী ও বাগ্‌দি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে ও নিজেদের নগণ্য আয় বেহিসাবে নিঃশেষ করে; খড়শূন্য চাল কিম্বা উপবাসী পুত্রকন্যার দিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই।

"বর্ণহিন্দু সাধারণতঃ মদ ও মাদকতার বিরুদ্ধে। মিতব্যয়িতা, স্বাভাবিক দূরদর্শীতা, স্থৈর্য্য, চিন্তাশীল মনোবৃত্তি, ধর্মভাব প্রভৃতি গুণ তাহাকে অসংযম অভ্যাসগুলির প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে নিবৃত্ত করে। এ কথা সত্য যে, কিছু সংখ্যক যুবক ও উচ্চশ্রেণীর অনেকে মদ্য পান করে। কিন্তু যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করে, যেমন মিতব্যয়ী ও হিসাবী মুদি, ধীর ও অক্লান্ত কর্মী সদ্‌গোপ, নম্র ও বিনয়ী কৈবর্ত, ইহাদের কেহই মদ স্পর্শ করে না। মদ্য-পান জনিত উগ্র কোলাহলময় উল্লাস ইহাদের স্থির শান্ত প্রকৃতির নিকট অজ্ঞাত; ইহাদের কেহ যদি মদ্য পান করে, তাহা করে রাত্রিতে, নিজগৃহে নিঃশব্দে। উগ্র উত্তেজনা ও কোলাহল যুক্ত উল্লাস অমার্জিত সমাজের প্রকৃতি আর এই সমাজের মধ্যে মদ্যপান জনিত মত্ততার প্রসার বেশী। বাউরি, বাগদি ও মুচির ভিতর তাহাদের আদিম প্রকৃতির অনেক কিছু আছে যাহাতে তাহারা অনুভব করে মদ্য পানের তীব্র তৃষ্ণা। বর্ধমান ও বাঁকুড়ার যে সকল দেশী মদ বা পচাইএর দোকান আমরা পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একটিও নাই যাহা প্রধানতঃ এই অর্ধ-আদিম অধিবাসী ক্রেতার উপর নির্ভর করে না। মদ ও পচাই-এর দোকানের সম্মুখে সমবেত জনতার মধ্যে আমরা একজনও বর্ণহিন্দু দেখি নাই।

"বর্ণহিন্দু ও অর্ধহিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসীর মধ্যে পার্থক্য তাহাদের নারীজাতির আচার ব্যবহারেও লক্ষ্য করা যায়। শহর অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথায়ও হিন্দু-নারী মুসলমান স্ত্রী-লোকের ন্যায় পর্দার আড়ালে অবরুদ্ধা থাকে না। পল্লীগ্রামে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের স্ত্রী ও কন্যাগণ এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী অথবা স্নানের জন্য পুষ্করিণী বা নদীতে অবাধে যাতায়াত করে, কিন্তু ঘোমটা টানিয়া; নিম্ন-বর্ণের স্ত্রী-লোকের ঘোমটা থাকে না, থাকিলেও নাম মাত্র। কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিবে না, অপরিচিত

লোকও তাহাকে সম্বোধন করিবে না। নিম্ন বর্ণের স্ত্রীলোকের মধ্যেও খুব বয়স্কা ভিন্ন কম স্ত্রীলোকই অপরিচিত লোকের সহিত কথাবার্তা বলিবে। অর্ধ হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসীদের সম্বন্ধে এই সব বিধিনিষেধের বালাই নাই। ইউরোপীয় নারীর ন্যায় তাহাদের স্ত্রী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যুবতী স্ত্রী কিম্বা বয়স্কা বিধবা গ্রামে হাট বাজারের রাস্তায় ঘোমটার সহিত বিন্দু মাত্র সম্পর্ক না রাখিয়া অবাধে চলাফেরা করে, প্রয়োজন মত যে-কোনও অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করে এবং স্বভাবতঃই চপল, উৎফুল্ল ও সতেজ অন্তঃকরণ থাকায় পথ চলিবার সময় স্ফূর্তির সহিত কথাবার্তা বলে ও কলহাস্য করে। অল্প-বয়স্কা তাঁতি কিম্বা ছুতার স্ত্রী, কামার বা কুমার গৃহিণী অপরিচিত লোক পথ দিয়া আসিতে দেখিলে এক ধারে সরিয়া দাঁড়ায় কিন্তু বাউরি স্ত্রীলোকের মধ্যে লজ্জা রক্ষার এরূপ কোনও সংস্কার নাই। এই অর্ধ-আদিবাসী স্ত্রীলোকগণ যদিও ইউরোপীয় নারী-সুলভ স্বাধীনতা উপভোগ করে, কিন্তু অনেক সময় এজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বর্ণহিন্দু নারীর অদৃষ্টে থাকে গৃহস্থালি, কিন্তু অর্ধ-আদিবাসী স্ত্রী-লোকের অন্ন সংস্থান করিবার জন্য গৃহের বাহিরেও কাজ করিতে হয়। বধূ, বিধবা, মা, কন্যা প্রভৃতি সকলকেই হয় কৃষি ক্ষেত্রে, না হয় জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিতে শ্রমিকের কাজ করিতে হয় আর ইহা দ্বারা স্বামী, পুত্র বা পিতার স্বল্প আয় পূরণ করে। সরকার হইতে যদি কোনও রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ হয় অথবা গ্রামের জমিদার যদি জলাশয় খননে অগ্রসর হন, বাউরি পুরুষ ও স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করে; পুরুষগণ কোদালি চালায় আর স্ত্রীলোকগণ মাটির ঝুড়ি বহন করে। অনেক সময় আবার পুরুষগণ কাজ করে আর স্ত্রীলোক গ্রামের বাজারে বা হাটে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে যায়। দৈনন্দিন ব্যাপারে যে এইসব নারীর জীবন দুঃখের নহে তাহা ইহাদের সবল সুস্থ দেহাবয়ব ও আনন্দোৎফুল্ল মুখই পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বামী যদি মাতাল হইয়া গৃহে ফিরে, তবে স্ত্রীর পক্ষে তাহা মোটেই সুখকর হয় না; স্ত্রী-প্রহারের রীতি বর্ণহিন্দু অপেক্ষা অর্ধহিন্দুর মধ্যেই অধিক মাত্রায় প্রচলিত।"

অর্ধ-শতাব্দীরও পূর্বে লিখিত এই প্রবন্ধে পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি নিম্ন-শ্রেণীর জীবনের যে নৈতিক ও আর্থিক দৈন্য প্রকাশ পায়, তাহার অবসান এখনও হয় নাই, বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলে।

তৃতীয় পর্ব

কৃষি ও কৃষক

প্রথম অধ্যায়

কৃষির প্রসার ও প্রধান শস্য সমূহ

কৃষির প্রসার

বর্ধমান কৃষি-প্রধান। কৃষিই অধিকাংশ অধিবাসীর মুখ্য অথবা গৌণ উপজীবিকা এবং সেইজন্য কৃষির সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ ন্যূনাধিক জড়িত আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত যেমন অতিরিক্ত আবাদি জমির চাহিদা বাড়িয়াছে, সেইরূপ খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি, সেচন ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি কারণ কৃষককে অনাবাদি বা অনুর্বর জমিকে আবাদের উপযোগী জমিতে রূপান্তর করিতে প্রেরণা দিয়াছে। আবাদ প্রসারের জন্য অরণ্যভূমি নির্মূল করা হইয়াছে, উচ্চভূমি সমতল ও উষরভূমি শস্যোপযোগী করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে প্রধান ফসল আবাদেব উপযোগী নূতন জমি আর নাই বলিলেই চলে। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এই আবাদি জমির পরিমাণ কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে প্রকাশ পাইবে :

বৎসর		আবাদি জমি রপরিমাণ	
ইং	১৯১০ সাল	১০,০৮১৭০	একর
ইং	১৯৩০ „	১০,৫৩৬৭০	„
ইং	১৯৪০ „	১২,৩১৯০০	„
ইং	১৯৬০ „	১২,৫৮০০০	„

জিলার প্রধান শস্য ধান। ধান ভিন্ন আক, আলু, পাট ও নানা প্রকার রবিশস্যও প্রচুর পরিমাণ জন্মে। এই সকল শস্যের বর্তমান আবাদি জমির পরিমাণ এইরূপ :

ধান	...	১১৩:৫০০	একর	কমবেশী
আলু	....	১৫২০০	„	„
আক	...	৯৫৭০	„	„
পাট	...	১৫২০০	„	„
ডাল কলাই ইত্যাদি	...	৫৬১৮০	„	„

প্রধান শস্য সমূহের আবাদের প্রসার

প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কি ভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার আভাস নিম্নে মহকুমানুযায়ী একর পরিমাণে দেওয়া হইল।

মহকুমা	ধান	আলু	আক	পাট	ডাল কলাই ইত্যাদি
ক। ইং ১৯৩০ সাল					
বর্ধমান সদর	৪১৭৯৮৫	৬৫৯৪	৩৯২২	৪৯৪	১০৪৯৭
কালনা	১৫৫৫৬৮	২১৬১	৩২৯	১৮২৬	১৫৫৪৭
কাটোয়া	১৮১৮৬৪	২২৬৪	৯১৮	২৫	১৬৯৯৫
আসানসোল	১৭০১০৭		১৪৪৭	১০০	১০৪৫৮
খ। ইং ১৯৪০ সাল					
বর্ধমান সদর	৫১০৮৩৫	৯৩৪৫	২৮৭৭	২০৬৫	১৭২৭৬
কালনা	১৫৯০৫০	২৯২৯	৯৯৮	৩১৯১	১৫৩১৮
কাটোয়া	১৭০৬৫৩	২০৫৫	২৯২৯	৮৩১	১৩২৩৬
আসানসোল	১৮২১৮০	৬২১	২৫৯৮	১০৪	৯৯৫৮
গ। ইং ১৯৬০ সাল					
বর্ধমান সদর	৫৭৩৪৭০	৯৯৩০	৩৯২০	২৯৭০	১৫৫১০
কালনা	১৭২২৯০	১৪০০	৯৯০	৮৩৬০	১৮২৬০
কাটোয়া	১৯৮৮৭০	৩২৮০	২৪৮০	৩৮৬০	১১৭০০
আসানসোল	১৮৬৮৭০	৫৯০	২১৮০	১০	১০৭১০

প্রধান শস্য সমূহের আবাদি জমির অনুপাত মোটামুটি এইরূপ :

ধান	·৮৯
আলু	·০২
আক	·০১
পাট	·০২
অন্যান্য	·০৬

ধান

ধানের মধ্যে আমনের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী। আমনের পরেই আউশের স্থান, তারপরই বোরোর। নীচু এঁটেল মাটির জমি

আমন ধান

আমন ধানের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ; যেখানে জল সেচনের সুবিধা নাই এইরূপ উঁচু জমি ইহার পক্ষে অনুপযোগী। পূর্ব অঞ্চলের শালি জমি ও

পশ্চিমাঞ্চলের শোল বা বহাল জমিতে আমন জন্মে। পশ্চিমাঞ্চলের কানালি জমিতেও এই ধানের আবাদ হয় কিন্তু সফলতা নির্ভর করে জল আবদ্ধ করা বাঁধ বা দৃঢ় আইল ও সেচনের সুবিধার উপর। আমন ধানের প্রকার ভেদ আছে, যেমন সরু, মাঝারি ও মোটা। সীতাশাল, রামশাল , দাদখানি, বাদশাভোগ, গোবিন্দভোগ প্রভৃতি সরু জাতীয়; নাগরা, ঝিঙ্গাশাল, দুধকলমা, কলমা, পাটনাই প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর; কনকচুর, ভাসামানিক প্রভৃতি মোটা পর্যায়ের। এইগুলি ছাড়াও জিলায় বহু প্রকার ধানের চাষ হয় যেমন রঘুশাল, তিলক কাচারি, সিন্দুর টুপি, নোনা, দুধে নোনা, হিঞ্চালঘু, বেনাফুলি, কটকচুরি, কাশিফুল, মহিশাল, নাগরা, নরি কলমা ইত্যাদি।

আমন চাষের সময় ও প্রণালী

আমন ধানের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল বলা যাইতে পারে :

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাল এক পসলা বৃষ্টি। ইহাতে জমি তৈয়ারী ও বীজ ধান বপনের সুবিধা হয়।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি। চারা-ধান রোপণের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে পরিষ্কাব আকাশ। জমি নিড়ান ও অতিরিক্ত জল নিকাশের জন্য ইহা দরকার ও সুবিধা দায়ক।

ভাদ্র মাসে যখন শিষ বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রচুর বৃষ্টি। আশ্বিন মাসে মাঝে মাঝে পর্য্যাপ্ত জল।

ফসল উঠিয়া যাইবার পরই আমন ধানের জমিতে একটি লাঙ্গল দিবার প্রয়োজন। যাহারা বিজ্ঞ কৃষক, তাহারা মাটিতে রস থাকিলে পৌষ মাসেই একটি লাঙ্গল দিয়া রাখে আর রস যদি না থাকে, তবে মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি হয়, তাহার পূর্বেই লাঙ্গল দেয়। সাধারণতঃ বর্ষা নামিবার পূর্বে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বীজ ধানের ক্ষেত তৈয়ার করা হয় ও বৃষ্টি পড়িলেই বীজ ধান বপন করা হয়। বর্ষা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ দুইটি চাষ দেওয়া হয় জমির সোজাভাবে, আর দুইটি আড়ভাবে। প্রত্যেক চাষের সহিত মই দিয়া বীজ রোপণের জন্য জমি ঠিক করা হয়। বীজ ধান রোপণ অর্থাৎ রোঁয়া সময় মত যত আগে করা যায়, ফসলের উৎপাদন ততই ভাল হয়।

সুবিধা মত বৃষ্টি পাত হইলে সাধারণতঃ আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ধান রোপণ আরম্ভ হয়। ততদিন পর্য্যন্ত বীজ ধান যাহাতে সতেজ থাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; প্রয়োজন মত সেচনেরও আবশ্যক হয়। আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হয়, অথবা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে আবাদ পিছাইয়া যায় ও শস্যের পক্ষে ইহা হয় ক্ষতিকর। এই অবস্থায়ই জল সেচনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্যানাল বা খাল সমূহের সার্থকতা। সময় মত সেচনের জল পাওয়া গেলে বা বৃষ্টির জল পাইলে আষাঢ় মাসেই বীজ ধান রোপণ প্রশস্ত।

আমন জমিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সার দেওয়া হয়, আবার কখনও দেওয়া হয় না। পুকুরের পাঁক, গোবর ও খইল উৎকৃষ্ট সার। বর্তমানে রাসায়নিক সারের প্রচলনও হইয়াছে। কিন্তু যদি জমিতে জল বেশী জমে কিম্বা অত্যধিক বৃষ্টি হয়, তবে সার জলের সহিত চলিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে ও এই কারণে বহু কৃষক কোনও এক বিশেষ সময়ের পর সার দিবার পক্ষপাতী নহে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আমন সেই জমিতে খুব ভাল জন্মে যেখানে বেশী জল জমিতে পারে না। নীচু জল-বদ্ধ জমি এই শ্রেণীর আমনের পক্ষে ক্ষতিকর।

আউশ ধান

আউশের সাধারণ প্রকৃতি হইতেছে যে, ইহা মোটা ও দুষ্পাচ্য। দরিদ্র শ্রেণীই আউশ চাউল বেশী ব্যবহার করে। আউশ ধানের চাষ হয় উচু জমিতে ও নদী সংলগ্ন ভূভাগে; জমিতে আমন কিংবা বোরো অপেক্ষা কম জলের আবশ্যক হয়। বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলের বাইদ বা ডাঙ্গা জমি ও পূর্বাঞ্চলের শুনা ও দামোদর-ভাগীরথীর চর জমি আউশ ধানের পক্ষে উপযুক্ত। আউশ চাষ হয় দুই ভাবে বীজ ছড়াইয়া বা রোঁয়া প্রথায়। আমন অপেক্ষা আউশের উৎপাদন কম কিন্তু ইহা বৎসরের এমন এক সময় জন্মে, যখন বাজারে খাদ্য শস্যের আমদানি থাকে কম। আউশের প্রকারভেদ আছে। নিয়ালি, কেলে, কার্তিকশাল, আউশ ও আমনের প্রায় মাঝামাঝি; আমনের ন্যায় বীজ ধান রোপণ করিয়া ইহাদের চাষ হয়, আবার সাধারণ আউশ ধানের তুলনায় ইহাদের চাষে বেশী পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। আমন ধানের কিছু পূর্বেই ইহারা পাকে ও কাটার উপযুক্ত হয়। কলমা,

শনফুলি, সেটে, কটকতারা ইত্যাদি মোটা পর্যায়ের আউশ অন্যান্য সাধারণ আউশের ন্যায়। সাধারণতঃ বীজ ছড়াইয়া ইহাদের চাষ হয়।

আউশ জমিতে প্রথম লাঙ্গল ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে এক পস্‌লা বৃষ্টি হইবার পরই দেওয়া হয়। পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইলে পুনরায় লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করা হয় ও মই দিয়া জমি ঠিক করিয়া আবাদের উপযোগী করা হয়। যেখানে রোঁয়া প্রথায় চাষ হয়, সেখানে বীজক্ষেত কোনও জলাশয়ের নিকট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বীজক্ষেতে বীজ বপনের সময় হইল বৈশাখের শেষ ভাগ; চারা ধান রোপণের সময় হইল বর্ষাগমের প্রারম্ভ—আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাধারণতঃ জমি প্রস্তুত ও বীজ বপন বৈশাখ মাসের মধ্যেই শেষ হয়। চারা রোপণ করার পূর্বে "কাদার চাষ" হয়; এই সময় জমিতে উপযুক্ত জল থাকা প্রয়োজন। কাদার চাষের পর মই দেওয়া হয় কিন্তু যেখানে বালির ভাগ বেশী, সেই জমিতে আর মই দেওয়া হয় না। জমি যদি শুকাইয়া যায়, বিশেষতঃ শিষ বাহির হইবার সময় জমিতে সেচ আবশ্যক। কিন্তু স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইলে সেচের প্রয়োজন হয় না।

কতকগুলি আউশ ধান শীঘ্রই পাকে। সেটে আউশের পাকার সময় শ্রাবণ মাস। আরও কয়েক শ্রেণীর মোটা আউশ ভাদ্র মাসে পাকে। নিয়ালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরু আউশ পাকে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে। আউশের জমিতেও সার দেওয়ার প্রচলন আছে; সারের মধ্যে সাধারণতঃ দেওয়া হয় গোবর, পুকুরের পাঁক, ছাই ও অন্যান্য আবর্জনা। গোল আলু উঠিয়া যাইবার পর যদি সেই জমিতে আউশ চাষ হয়, তবে সারের প্রয়োজন হয় না। নদীতীরবর্তী জমি বা চরজমিতে সার দেওয়া হয় না।

বোরো ধান

বোরো ধান মোটা পর্য্যায়ের। ইহারও জাতি ভেদ আছে; যেমন, কেলে, বোরো কলমা, নেরে বোরো, বা সাধারণ বোরো। এই ধান চাষের জন্য নীচু ও সরস জমিই উপযুক্ত। খাল কিম্বা ছোট নদী বা নালায় বাঁধ দিয়া সংলগ্ন জমিতে জল সঞ্চয় করিয়া অথবা বিল অঞ্চলে ইহার আবাদ হয়। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে জমিতে বীজ বপন হয়, আবার কখনও বা মাঘ মাসেও বীজ বপন হয়। এই ধান

হয়। আকের জমি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে :

জমির নিকট জলসেচনের উপযোগী জলাশয় আছে কি-না ;

জমি বন্যার নাগালের বাহিরে কি-না ;

জমিতে জল নিকাশের সুবিধা আছে কি-না।

বহু প্রকারের আক উৎপন্ন হয় ; যেমন কলম্বো, জাভা, কয়ম্বাটুর, সামসারা, গণ্ডারী, কাজলি, চিনিচাঁপা, বোম্বাই ইত্যাদি।

আকের চারা বসাইবার প্রকৃষ্ট সময় হইতেছে মাঘ ফাল্গুন। কিন্তু জিলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসে চারা বসান হয়। পর বৎসর পৌষ হইতে বৈশাখের মধ্যে আক কাটিবার সময়।

আক গাছের মধ্যে যেগুলি বীজের জন্য নির্ধারিত থাকে, তাহাদের ডগা কাটিয়া ফেলা হয় ; ইহার ফলে নিম্নের ছোট ডগা সতেজ হইয়া বৃদ্ধি পায়। আকের উপরিভাগের এই অংশ প্রায় দুই ফুট পরিমাণে কাটিয়া চারা করা হয়। চারা গজাইবার পদ্ধতি এইরূপ : একটি শীতল গর্তের মধ্যে প্রথমে এক পরদা ভিজা খড় ও ছাই রাখা হয় আর তাহার উপর রাখা হয় আকের কাটা ডগা। এই ডগা আবার ভিজা খড় ও ছাই দিয়া ঢাকা হয়, তাহার উপর আর এক সারি ডগা বিছাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে স্তরের উপর স্তর সৃষ্ট হইয়া গর্তটি ক্রমশঃ ভরাট হয়। সকলের উপর চাপা দেওয়া হয় মাটি। এক সপ্তাহ এইভাবে রাখার পর দেখা যায় যে ডগাগুলি গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও তখন এইগুলি বসাইবার উপযুক্ত হয়, উপরের মাটি ফেলিয়া দিয়া ডগাগুলি সোজাভাবে গর্তের ভিতর দাঁড় করাইয়া খড় ও ছাই চাপাইয়া এক মাস পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে। এমন অবস্থায় খড় ও ছাইএর উপর সময় সময় জল দিবার প্রয়োজন হয়।

লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পর মই দিয়া জমি সমান করিয়া চারা বসাইবার উপযুক্ত করা হয়। চারা বসাইবার পূর্বে জল সেচন প্রয়োজন। চারাগুলিকে সারিবদ্ধভাবে বসাইতে হয়, আর দুই পার্শ্বে অগভীর নালা কাটা হয়। বসাইবার পর আবার জল সেচন হয়। বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত আকের জমিতে প্রয়োজনমত জলসেচনের ব্যবস্থা করা ও সঙ্গে সঙ্গে চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া

অবশ্য করণীয়। সময় সময় পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্তও জলের প্রয়োজন হয়।

আকের জমিতে সার অপরিহার্য্য। সাধারণতঃ খইল, গোবর, হাড়ের গুড়া ও ফস্‌ফেট্ জাতীয় সার দেওয়া হয়। কিন্তু বহু কৃষক মাত্র গোবর ও খইল প্রয়োগেরই পক্ষপাতী। জমি তৈয়ার হইবার পূর্বেই ইহাতে গোবর সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়; তারপর লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার সময় ইহা মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। খইল প্রয়োগের পরিমাণ বিঘা প্রতি প্রায় ৬ মণ। খইলের প্রয়োগবিধি চারা বসাইবার পর। কখনও আবার জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য চারা বসাইবার পূর্বেও খইল দেওয়া হয়। সাধারণ কৃষকের নিকট রেড়ির খইলই প্রিয়।

অন্যান্য ফসল

ডাইলের ভিতর খেসারি, মুগ, ছোলা ও অরহরের চাষই বেশী হয়। গম, ভুট্টা, যব, পটল, সরিষা, বিভিন্ন জাতীয় কপি, বেগুন ও নানাবিধ শাকসবজির আবাদ প্রচলিত আছে। সম্প্রতি কলা চাষের প্রসার হইয়াছে।

একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল

যদিও জিলা সাধারণতঃ এক ফসলি, একই জমিতে বৎসরে একাধিকবার ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা কোথায়ও কোথায়ও লক্ষ্য করা যায়। ইডেন ক্যানাল অঞ্চলে ধান উঠিয়া যাইবার পর রবিশস্যের আবাদ হয়। জিলার পূর্ব-অঞ্চলে আউশ কাটা হইলে সেই জমিতে রবিশস্য জন্মায়। আকের জমিতে আকের পর আউশ বপন করার রীতি আছে; আবার আউশ উঠিয়া গেলে এই জমিতে আলু বা কলাই লাগান হয়; তারপর আবার আকের চাষ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শস্য-উৎপাদনের বিঘ্ন ও তাহার প্রতিকার

জিলার সমস্যা—বন্যা ও অনাবৃষ্টি

যথাসময়ে বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টি পাতের তারতম্য, বন্যা ও অনাবৃষ্টি, বহুবার এই জিলায় তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আকাশের জলের উপর একান্ত নির্ভরশীল অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানে খাদ্য শস্যের সুষ্ঠু ও নিয়মিত উৎপাদন নির্ভর করে যথাসময়ে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের উপর। ভাদই বা মোটা আউশ বপন করার সময় সাধারণতঃ চৈত্র বৈশাখ মাস, কাটিবার সময় শ্রাবণ ভাদ্র। মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর জলই এই ফসলের পক্ষে যথেষ্ট। আউশের উৎপাদন ও অপেক্ষাকৃত কম। আমনের চাষের পক্ষে তিনটি বিশেষ সময় আছে, যখন বৃষ্টিজলের একান্ত প্রয়োজন—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র আশ্বিন মাস। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ধানের জন্য অল্প বৃষ্টিপাত প্রয়োজন; আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চারা রোপণের সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলের দরকার; ভাদ্র-আশ্বিনে গাছের বৃদ্ধি ও শিষ ধরার পক্ষে অল্প বিস্তর জল চাই। প্রথম দুইটি সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি হইবার পর যদি ভাদ্র আশ্বিনে জল না পায় তবে আমন ধানের পক্ষে সমূহ বিপদ। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে এই জিলায় যে সকল দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ভাদ্র-আশ্বিনে বৃষ্টি জলের অভাব। তারপর দুইটি দুর্ধর্ষ পার্বত্য নদ জিলার দুই পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়া বহুবার প্রলয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি করিয়া প্রধান খাদ্য শস্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যা, এই তিনটির ধ্বংসাত্মক লীলা বর্ধমানবাসীর অবিদিত নাই। ইংরেজ আমলের প্রথম হইতে ইহাদের যে লিপিবদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

ক। অনাবৃষ্টি	খ। অতিবৃষ্টি ও বন্যা
ইং ১৮৬৬ সাল	ইং ১৮২৩ সাল
,, ১৮৭৪ ,,	,, ১৮৫৫ ,,
,, ১৮৯৫ ,,	,, ১৮৯৩ ,,

ক। অনাবৃষ্টি	খ। অনাবৃষ্টি ও বন্যা
ইং ১৯০৭ ,,	ইং ১৮৯৮ ,,
,, ১৯২৫ ,,	,, ১৯০৯ ,,
,, ১৯২৭ ,,	,, ১৯১৩ ,,
,, ১৯৪০ ,,	,, ১৯১৭ ,,
	,, ১৯২৮ ,,
	,, ১৯৪৩ ,,
	,, ১৯৫৬ ,,

অতিবৃষ্টি বা বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়াছে অনাবৃষ্টি। ইংরেজ আমলের পূর্বে জিলার স্থানে স্থানে সুবৃহৎ জলাধার খনন করিয়া জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতে প্রয়োজন মত কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিয়া অনাবৃষ্টির প্রকোপ কিছু পরিমাণ লাঘব করিবার চেষ্টা হইত। বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত হইত দামোদর ও অজয়ের প্লাবনবাহী বহুসংখ্যক জলস্রোত দ্বারা। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভেই জলাধারগুলি হয় অবহেলিত। আর দামোদর-অজয়ের দৃঢ়তর বাঁধ নির্মাণে স্বাভাবিক প্লাবন ধারা হইল রুদ্ধ। ইহার পরিণাম হইল অশুভ দায়ক। জল সেচনের উন্নতি সম্বন্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় ইং ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর। তখন ইডেন ক্যানালের পরিকল্পনা-সূচী আরম্ভ হয়। ইডেন ক্যানালের খনন কার্য্য শেষ হয় ইং ১৮৮১ সালে। বর্ধমান থানার দক্ষিণাংশ ও জামালপুর থানার অংশ বিশেষ ইহা দ্বারা উপকৃত হইল। ইহার বহুকাল পর দামোদর ক্যানাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইং ১৯৩৫ সালে ইহার খনন কার্য্য শেষ হইল। বর্ধমান সদর ও কালনা মহকুমার এক বিশাল অংশে কৃষিজমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হয়। ইহার পর বীরভূমের ময়ূরাক্ষী খাল খনন হইলে ইহার একটি শাখা বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানায় প্রসারিত হইয়া সেচনের সুবিধা করিল। কিন্তু যে বিরাট পরিকল্পনা বর্ধমান জিলার এক বৃহত্তর অংশকে অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টিজনিত শস্যহানি হইতে রক্ষা করার জন্য গ্রহণ করা হয় তাহা হইল দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। জল সেচনের বিভিন্ন পরিকল্পনা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

অনাবৃষ্টি জনিত শস্যহানি রোধের প্রচেষ্টা

ইংরেজ আমলে প্রথম

ইডেন ক্যানাল

দামোদর

ময়ূরাক্ষী ক্যানাল

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-বাঁধ

দামোদর ও অজয়ের বন্যাবেগকে বাঁধ দিয়া সংযত করিবার পরিকল্পনা বহুদিনের। কিন্তু ইংরেজ শাসনের পূর্বে এই বাঁধকেই চিরস্থায়ী ও দুর্ভেদ্য করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের এক মাত্র উপায় বলিয়া কোনই কল্পনা স্থান পায় নাই। বাঁধ নির্মাণ করিয়া—সে বাঁধ যতই সুদৃঢ় হউক না কেন—বন্যা প্রবাহ, বিশেষতঃ দামোদর প্রবাহকে বশীভূত করার কোনই প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে দামোদরের উদ্বৃত্ত প্লাবন জল বহন করিত বাঁকা, কুন্তি, কানা-দামোদর প্রভৃতি জলধারা। কলিকাতার বহু উপরে এই প্লাবন জল ভাগীরথীতে পড়িত ও ভাগীরথীর স্রোত-পথ মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিত। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দামোদরের গতিপথ পরিবর্তিত হয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও কানা দামোদর দামোদরের প্লাবন জলের বহুলাংশ বহন করিয়া গঙ্গাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিত। কিন্তু ইং ১৮৬৬ সালে কানা দামোদরের স্রোত রুদ্ধ হয়; ইতিমধ্যে কুন্তি প্রভৃতিও ভরাট হয়। দামোদরের প্লাবন জল স্বভাবতঃই দক্ষিণ ভাগের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির দিকে প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ভয়াবহ বন্যায় দামোদরের দক্ষিণ বাঁধ বিপর্য্যস্ত হয়। তখন স্থির হয় যে এই বাঁধ পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। ইং ১৮৫৬ হইতে ১৮৫৯ সালের মধ্যে এই বাঁধ অপসারণের কার্য্য সমাপ্ত হয়। দক্ষিণ বাঁধ পরিত্যক্ত হওয়ায় দামোদরের বাম বাঁধ রক্ষা পায় বটে কিন্তু প্লাবন বাহিত বালি ও পলিমাটি দক্ষিণ ভাগের জমিকে উন্নত করে। দামোদরের গর্ভেও প্রচুর বালি জমা হয়। ফলে প্লাবনের সময় দামোদর পুরাতন প্রবাহ অনুসন্ধান করে। ইং ১৯৪৩ সালের বিরাট প্লাবনে বর্ধমানের নিম্নে আমীরপুরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দামোদরের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা ইহার প্রমাণ।

দামোদর বাঁধ

ইং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দামোদর বাঁধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়। পরে যখন পূর্বভারতীয় রেলপথ স্থাপিত হয় তখন বাঁধ আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চলে। দামোদর ও অজয় নদের তীরে বর্তমানে যে বাঁধ আছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ মাইল। দামোদর প্রবাহের বাম

পার্শ্বে জুজুটি হইতে জিলার প্রান্ত সীমা পর্যন্ত ও অজয় নদের দক্ষিণ ভাগে শিবপুর হইতে ভেদিয়া পর্যন্ত এই বাঁধ বিস্তৃত।

বিভিন্ন জল সেচন পরিকল্পনা দ্বারা যে পরিমাণ জমি উপকৃত বা উপকৃত হইবার যোগ্য তাহার বিবরণ এইরূপ :

বিভিন্ন সেচন পরিকল্পনায় উপকৃত জমির পরিমাণ

ইডেন ক্যানাল ৭৭৭০ একর
দামোদর " ১৮১০০০ "
ময়ূরাক্ষী " ২৬০০০ "
দামোদর উপত্যকা
পরিকল্পনা ২৫২০০০ "

ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা দ্বারা বিভিন্ন স্থানে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শস্যরক্ষা ও সুষ্ঠু উৎপাদনের অন্যান্য ব্যবস্থা

শস্য উৎপাদনের সমতা রক্ষা, পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয় :

ক। সার প্রয়োগ

খ। উন্নত বীজ সংস্থান

গ। পোকা মাকড় বা ব্যাধি হইতে শস্য রক্ষা

ঘ। গোব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধ।

সারের উপকারিতা সম্বন্ধে বর্ধমানের কৃষকের অজানা কিছুই নাই। সারের ব্যবহার ও উপযুক্ত প্রয়োগ-বিধি তাহার অজ্ঞাত নাই। জমিতে বহুপ্রকার সার দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সারের প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রথম—গোবর। গোবর অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান সার। পল্লী অঞ্চলে কৃষকের গৃহে ইহা অতি যত্নে রক্ষিত হয়। গৃহাঙ্গনের যে অংশে গোবর রাখা হয় তাহাকে বলা হয় সারগাদা বা সারকুর। গোবরের সার ধান, আক ও আলুর চাষে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়—পুকুরের পাঁক। ধানের জমির জন্য পুকুরের পাঁকের যথেষ্ট চাহিদা আছে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গ্রাম-পথে বাহির হইলেই দেখা যায় গো-গাড়ী ভর্তি এই পাঁক ক্রমাগত চলিতেছে মাঠের দিকে। পাঁক জমিতে জমিতে ফেলিয়া রাখা হয় ও পরে লাঙ্গল দিবার সময় মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়।

করিত মাঠের অতিরিক্ত জল। পূর্বে এই সব স্রোত-ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা ছিল, পরে এই ব্যবস্থার অবনতি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রথম হইতেই আভ্যন্তরীণ নদীস্রোতগুলি অবহেলিত হয় ও দামোদর নদের বন্যা-প্লাবন হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উভয় তীরের বাঁধ সুদৃঢ় করার নীতি অনুসৃত হয়। ফলে শাখা নদীগুলির পক্ষে দামোদরের প্লাবন-জল সম্যক্ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পায় আর প্লাবন-জল দামোদর প্রবাহের অভ্যন্তরেই রহিয়া যায়।

অজয় সম্বন্ধেও অনুরূপ কাহিনী। পূর্বে যে সকল ক্ষুদ্রকায় জলস্রোত অজয়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিত ও প্লাবন জলকে শস্যক্ষেত্রে বহন করিত তাহাদের চিহ্নস্বরূপ বহু কাঁদর মঙ্গলকোট ও কাটোয়া অঞ্চলে এখনও বর্তমান।

দামোদর ও অজয়ের প্লাবন জল ভিন্নও জলাশয়-মাধ্যমে সেচনের ব্যবস্থাও ছিল। এইরূপ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় এখনও বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে ক্ষীরগ্রামের ধামাস, যাগেশ্বরডি ও উচালনের দীঘি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বের বাঁধ ছিল সু-উচ্চ। বহু পরিমাণে বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখিয়া অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টি হইতে শস্য রক্ষা করাই ছিল এই সকল দীঘির বা জলাশয়ের উদ্দেশ্য। যখন শস্যক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন হইত, জলাশয়ের যে বাঁধটি শস্যক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত তাহার এক অংশ উন্মুক্ত করিয়া জল ছাড়া হইত আর এই জল বহু সংখ্যক পয়ঃপ্রণালী দ্বারা ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে বাহিত হইত। প্রয়োজন মত জল সরবরাহ হইবার পর বাঁধ মেরামত করা হইত। ইহার নামই মেলান প্রথায় জল-সেচন। ইহা ছাড়া মাঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত কোনও পুষ্করিণী, খাল অথবা অন্য কোনও জলাশয় হইতে ডুনি দ্বারা জল সেচন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে দিবার ব্যবস্থাও ছিল।

মেলান ও সেচন

মেলান প্রথায় কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও আছে। ক্যানাল বহির্ভূত অঞ্চলে বিশেষতঃ আসানসোল মহকুমায় ইহার প্রচলন বেশী। কিন্তু জলাশয়গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এখন আর হয় না। ডুনি সাহায্যে জল সেচন প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে এবং ক্যানাল সমূহের আবির্ভাব এই প্রথাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ক্যানাল

বর্তমান সেচন প্রথা

মাধ্যমে জল সেচনের পরিকল্পনাকে উইলকক্স সাহেব পুরাতন দামোদর প্লাবন-সেচের পুনরভ্যুদয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কোনও পরিকল্পনা বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে গৃহীত হয় নাই। তখন ইডেন ক্যানাল খনন হয়। ইহার বহু বৎসর পর ইং ১৯৩০-৩১ সালে দামোদর ক্যানালের খনন কার্য আরম্ভ হয় ও ইহা হইতে জল সেচন কার্যকরী হয় ইং ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে। ইহার পর গৃহীত হয় অন্য দুইটি পরিকল্পনা, একটি সর্বাত্মক আর একটি আঞ্চলিক। প্রথমটি হইল দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা আর দ্বিতীয়টি ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা। বিভিন্ন পরিকল্পনার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্যানাল মাধ্যমে জল সেচন

বর্ধমান থানার দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইডেন ক্যানাল জামালপুর থানার মধ্য দিয়া হুগলি জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। যদিও বর্ধমানের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই খাল খনন করা হয়, এই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার অবসানও পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য ছিল। বর্ধমান জিলায় এই খালের দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি মাইল, ইহার শাখা প্রশাখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ মাইল। খাল দ্বারা উপকৃত ৭৭০০ একর পরিমিত জমির অধিকাংশই জামালপুর থানায়। এই জমির মধ্যে দোফসলি জমির পরিমাণ প্রায় ৩০০০ একর। ইডেন ক্যানালের কিয়দংশ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। ইডেন ক্যানালের জল সেচনের উপর কর ধার্য আছে। প্রয়োগ অনুসারে করের হার এইরূপ :

ইডেন ক্যানাল

দীর্ঘ মেয়াদি	প্রতি একর	৩ টাকা
মাত্র খরিফ ফসলের জন্য	”	৩·৫০ টাকা
মাত্র রবি ফসলের জন্য	”	২·২৫ ”
আক চাষের জন্য (মাত্র একবার সেচ)	”	৩ ”
আমন চাষের জন্য (মাত্র একবার সেচ)	,,	১·৭৫ ,,

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার পূর্বে দামোদর ক্যানাল পরিকল্পনা সমগ্র বাংলা দেশের যাবতীয় সেচন পরিকল্পনার শীর্ষস্থান অধিকার

দামোদর ক্যানাল

করিত। পানাগড়ের অদূরে রনডিহা নামক স্থানে দামোদর ক্যানালের উৎপত্তি। এখানে দামোদর গর্ভে উভয় তীর পর্যন্ত প্রসারিত একটি অনুচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া দামোদর প্রবাহে একটি কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করা হয়; ইহার অব্যবহিত বাম পার্শ্বেই ক্যানালের মুখ। উদ্বেলিত প্লাবন-জল বাঁধে প্রতিহত হইয়া ক্যানালের ভিতর প্রবেশ করে ও ইহার মধ্য দিয়া বহু শাখা প্রশাখায় দূর দূরান্তরের কৃষিক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। বাংলাদেশের তদানীন্তন গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের নামানুসারে এই বাঁধের নামকরণ হয় এণ্ডারসন বাঁধ বা Anderson Weir. ইং ১৯৩৫ সালে এই ক্যানাল সেচনের জন্য উন্মুক্ত হয়। ঐ সালের বঙ্গীয় উন্নয়ন আইনের বিধি অনুসারে (Bengal Development Act) ইং ১৯৩৭ সালে সেচন করের হার ধার্য হয় প্রতি একর জমিতে ৫.৫০ টাকা। মূল ক্যানালের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ মাইল কিন্তু শাখা প্রশাখার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩৩ মাইল। এই ক্যানাল সমষ্টি প্রায় ১৮০,০০০ হাজার একর পরিমাণ জমিকে সেচনযোগ্য করিয়াছে, ইহার অধিকাংশই এক ফসলি। দামোদর ক্যানালের কিয়দংশ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাভুক্ত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

এই বিশাল পরিকল্পনা একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আর অন্যদিকে বিহার ও পশ্চিম বাংলা সরকারের সংবেত প্রচেষ্টার ফল। দামোদরের ধ্বংসাত্মক কাহিনীর উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। শীতকালে কিংবা গ্রীষ্মের সময় দামোদর প্রবাহ হয় ক্ষীণ কিন্তু বর্ষায় ইহা রূপান্তরিত হয় উদ্দাম জল প্রবাহে। সুতরাং প্রচণ্ড বন্যার আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নহে। ঐতিহাসিক যুগে এই বন্যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইং ১৭৩০ সালে। তাহার পর বহুবার এই বন্যার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইং ১৯৪৩ সালের প্রবল বন্যার কথা লোকে বিস্মৃত হয় নাই। তখন বন্যায় জিলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও মহাযুদ্ধের এক বিশেষ সংকটপূর্ণ সময়ে সামরিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। দামোদরকে বশীভূত করার উপায় সম্বন্ধে বহু গবেষণা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই সরকারী ও বেসরকারী মহলে করা হইয়াছে। এই সকল গবেষণা আকৃতি গ্রহণ করিল ইং ১৯৪৮ সালে যখন "দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠান" (Damodar Valley Corporation) নামক প্রতিষ্ঠানের

সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের "টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার" (Tennesy Valley Scheme) আদর্শে আর ইহার উদ্দেশ্য হয় বহুমুখী—জলসেচন, পরিবহণ, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ শিল্পের উন্নতি বিধান, ইত্যাদি। পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর ও বরাকর নদের বিভিন্ন স্থলে আটটি বৃহদাকারের বাঁধ বা ড্যাম ও দুর্গাপুরে একটি ব্যারাজ নির্মিত হইয়া দামোদরের প্লাবনকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা হইয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারাজের উভয় পার্শ্বে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জিলায় সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়া দামোদরের প্লাবনজল দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই খাল ও তাহার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জিলার এক বিশাল ভূভাগকে সেচনযোগ্য করিয়াছে। বর্ধমানে এই সেচনযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ একর ; পুরাতন দামোদব ক্যানাল ও ইডেন ক্যানালের যে ভাগ এই পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তৎসহ মোট সেচনযোগ্য ভূমির পরিমাণ হইবে চারি লক্ষ একরের উপর। ক্যানাল অঞ্চলে বিশেষ সেচ ব্যবস্থা দ্বারা বৎসরে একাধিক বাব ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টাও এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী অথবা মোর সেচ পরিকল্পনা দ্বারা যদিও বীরভূম জিলা প্রধানতঃ উপকৃত, সংলগ্ন কেতুগ্রাম থানার কিয়দংশ এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। কেতুগ্রাম অঞ্চলের প্রায় ১৬ হাজার একর পরিমিত জমি ময়ূরাক্ষী খাল হইতে সেচনযোগ্য হইয়াছে। জমি প্রায়ই এক ফসলি। এই পরিকল্পনার কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা

উপরোক্ত বৃহৎ বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ বহু ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত ও ইহা দ্বারা সেচনযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ১২০০০ হাজার একর।

সেচ পরিকল্পনার সুফল

সেচ পরিকল্পনাগুলি যে-সকল অঞ্চলে কার্যকরী হইয়াছে তথাকার অর্থনীতির উপর ইহাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। জমির উৎপাদন শক্তি যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু অনাবাদি জমি আবাদি জমিতে পরিণত হইয়াছে। ক্যানাল অঞ্চলে অ-সম বৃষ্টিপাত শস্যহানির

ভয় জন্মায় না। শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে ক্যানাল অঞ্চলের জমির মূল্য অন্যান্য অঞ্চল হইতে বেশী। কয়েক ক্ষেত্রে দোফসলি জমির আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌ-খাল যখন পরিবহণ কার্যের জন্য উন্মুক্ত হইবে, তখন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষতঃ আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সহিত কলিকাতার যে অধিকতর উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনায় খাল সমূহ ভবিষ্যতে যে দেশের মৎস্য সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবে সে সম্ভাবনাও আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যয়

কৃষিজাত শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একই ফসল আসানসোল মহকুমার শুষ্ক আবহাওয়ায় তপ্ত ভূমিতে যে পরিমাণে জন্মিবে, জিলার সরস পূর্বাংশে বিশেষতঃ ক্যানাল এলাকায় তাহা অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হইবে। প্রধান প্রধান ফসলের গড় উৎপাদন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি একর অর্থাৎ তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে কিরূপ হইয়া থাকে তাহার আভাস নিম্নে দেওয়া হইল :

উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ

আমন ধান—

আমন ধান

গড় উৎপন্ন প্রতি একর

মহকুমা :	ক্যানাল এলাকা :	ক্যানাল এলাকার বাহিরে
বর্ধমান সদর	২৮ মণ ২০ সের	১৬ মণ ৩০ সের
কাটোয়া	২২ „ ১৫ „	১৫ „ ১২ „
কালনা	৩০ „ ১৫ „	২২ „ ২০ „
আসানসোল	— — —	১৬ „ ২০ „

কিন্তু সময় মত পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল পাইলে ক্যানাল এলাকা ও ক্যানাল বহির্ভূত এলাকাব সহিত বিশেষ কোনই পার্থক্য থাকে না, এরূপও দেখা গিয়াছে।

আলু—

আলু

মহকুমা :	গড় উৎপন্ন প্রতি একর :
বর্ধমান সদর	প্রায় ১০৪ মণ
কাটোয়া	„ ১৫০ „
কালনা	„ ১৪০ „
আসানসোল	„ ৬৫ „

আক

আক— বর্ধমান সদর	„ ৭০ মণ গুড়
কাটোয়া	„ ৮৫ „ „
কালনা	„ ৭০ „ „
আসানসোল	„ ৬০ „ „

বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ব্যয়

বিভিন্ন প্রধান ফসল উৎপাদনের ব্যয়ও সর্বত্র একরূপ নহে।—অবস্থা বিশেষে ইহার তারতম্য হয়। নিম্নে কয়েকটি ফসল উৎপাদনের একটি গড় হিসাব দেওয়া হইল।

আমন ধান প্রতি একর

বিগত ১৯২৬-১৯৩৪ সালে যখন জিলার জরিপ কার্য হয়, তখন আমন ধান উৎপাদনের ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল এবং ইহার হিসাব উক্ত জরিপের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই হিসাব দুই ভাগে দেখান হইয়াছে, প্রথমটি ইং ১৯৩০ সনের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি তাহার পরের। প্রথম হিসাব অনুযায়ী একর প্রতি ব্যয় দাঁড়ায় ৩৬৸০ আনা। ১৯৩০ সালে বাজার মন্দা হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে প্রতি একর জমিতে উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ২৮৸৵.। বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইবে প্রায় ১০৩৸০। নিম্নে এই দুই সময়ের একটি তুলনামূলক বিবৃতি দেওয়া হইল :

চাষের পর্যায় :	গত জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যয় (১৯৩০ সালের পর) :	বর্তমান ব্যয় :
বীজ ধানের মূল্য	১৵০	৩৸০
সার	৩৸০	১৫৲
বীজ ক্ষেত তৈয়ারী, লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি	৯৲	১৮৲
বীজ ক্ষেত হইতে চারা জমিতে লওয়া ও বোঁয়া	৩৷৵০	১৫৲
জমি নিড়ান	১৸৵০	১০৲
সেচন ৩ বার	৩৷৵০	১৮৲
ধানকাটা, খামারে লওয়া ও পিছরান	৬৷৵০	২৪৲
	২৮৸৵০	১০৩৸০

আলু উৎপাদনের ব্যয় সম্বন্ধে গত জরিপের রিপোর্টে কোনই উল্লেখ নাই। বর্তমানে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব এইরূপ :

আলু প্রতি একর

১। জমি তৈয়ারী বা বাগানো। অক্টোবর মাসে

জমিতে লাঙ্গল দেওয়া (প্রায় ১৫বার)-৩০ মুনিস ১৸০ হিসেবে ৫২৷০

জমিতে গোবর সার ১২ গাড়ী,

প্রতি গাড়ী ২৲ টাকা হিসেবে ....২৪৲

	কয়েকবার লাঙ্গল দিবার পর পুনরায় গোবর সার	···	২৪৲
	বীজ লাগাইবার পূর্বে খইল সার ১২ মণ ১০৲ টাকা হিসাবে	····	১২০৲
	১৫ মণ রাসায়নিক সার ১১৷৹ টাকা হিসাবে	···	১৭২৷৹
২।	১০ মণ বীজ ২৫৲ টাকা হিসাবে	····	২৫০৲
	মুনিস (৩০) ১৷৵৹ আনা হিসাবে	···	৫২৷৹
৩।	চারা বাহির হইবার পর রেডির সার বা অন্য সার		৫৫৲
	জল সেচন (৩০ মুনিস ২৲ টাকা হিসাবে)	····	৬০৲
৪।	ফসল সংগ্রহ ও বহন করিবার ব্যয়	····	৫০৲
		মোট	৮৬০৷৹ টাকা

এই হিসাব আসানসোল মহকুমায় প্রযোজ্য হইবে না। এখানে আলুর চাষ কম এবং জমি আলুর পক্ষে কম উপযোগী বিধায় ইহার চাষে বিশেষ যত্ন বা ব্যয় লাভজনক বলিয়া গণ্য হয় না।

আক প্রতি একর

আক সম্বন্ধেও গত জরিপের রিপোর্টে কোনই হিসাব পাওয়া যায় না। নিম্নে বর্তমান ব্যয়ের একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :

১।	ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জমি তৈয়ার লাঙ্গল ১৫, ১৷৹ টাকা হিসাবে	····	২২৷৹
	জল সেচন, মুনিস ৯, ১৷৹ টাকা হিসাবে	····	১৩৷৹
২।	৬ কাহন চারার মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে	····	৬০৲
৩।	রোঁয়া— চারা তৈয়ারী, সারি দিয়া বসান ও জল সেচন, মুনিস ৩৬, ১৷৹ টাকা হিসাবে		৫৪৲
	জমির চতুষ্পার্শ্বে বেড়া দিয়া আগলান	···	৪০৲
	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারার সারির দুই পার্শ্বে নালা খনন, মাঝখানে মাটি দেওয়া ইত্যাদি মুনিস ৬০, ১৷৵৹ টাকা হিসাবে	····	১০৫৲
	জলসেচন, মুনিস ২৭, ২৲ টাকা হিসাবে	····	৫৪৲
	সার—১৮ মণ খইল, ১০ টাকা হিসাবে	···	১৮০৲
	মুনিস ১৩, ১৷৵৹ টাকা হিসাবে	····	২৬৷৹
			৫৫৫।৹

জের…… … ……………………………………………৫৫৫।০

৪। আষাঢ়-শ্রাবণ—পাতা ভাঙ্গা

মুনিস ৪৮, ২৲ টাকা হিসাবে	....	৯৬৲
জোর বাঁধা-মুনিস ২৪, ২ টাকা হিসাবে	...	৪৮৲

৫। জলসেচন পৌষ হইতে ফাল্গুন

মুনিস ১৫, ২ টাকা হিসাবে	....	৩০৲

৬। আক কাটা, আক বাড়ীতে বহন, মাড়াই,
গুড় তৈয়ারী ইত্যাদি, মুনিস ৭২,

১॥০ টাকা হিসাবে	...	১০৮৲

মোট ৮৩৭।০ টাকা

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি-মজুর ও ভাগদার

ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা হইবে প্রায় দুই লক্ষ। ইহারা জিলার স্থায়ী অধিবাসী। ধান রোপণের সময় বা কাটিবার সময় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুমকা ও মানভূম অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক সাঁওতাল সাময়িক ভাবে এ জিলায় আসে; ধান রোপণ বা কাটা হইয়া গেলে তাহারা আবার দেশে ফিরিয়া যায়। এই শ্রেণীর ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা হইবে প্রায় ১৫০০০ হাজার।

কৃষি-মজুর বা ক্ষেত-মজুর

ক্ষেত-মজুর শ্রেণীকে নিম্ন ভাবে বিভক্ত করা যায়:

ক। **কিসান বা মাহিন্দর:**

ইহারা বেতন-ভুক। সাধারণতঃ সারা বৎসরের জন্য ইহাদের নিযুক্ত করা হয়। মাহিনা ও সম্বৎসর চুক্তিতে কোথায়ও বা ৯৬৲ টাকা আবার কোথায়ও বেশী। ইহারা নিয়োগকারী হইতে আহার পায় আর পায় বৎসরে দুই জোড়া ধুতি আর দুই জোড়া গামছা। মাত্র অবস্থাপন্ন কৃষকই ইহাদের নিযুক্ত করেন। কিসান বা মাহিন্দরের কাজ হইল জমিতে সার বহন, ধুলোর চাষ, আইল মেরামত, আবার জমির উদ্বৃত্ত জল নিকাশ ইত্যাদি। ফসল জমি হইতে খামারে আনিবার কাজেও সময় সময় তাহাদেরকে নিযুক্ত করা হয়।

কিসান বা মাহিন্দর

খ। **রাখাল বা বাগাল:**

ইহারাও সম্বৎসর চুক্তিতে কৃষকের গৃহে নিযুক্ত হয়। মাহিনার হার সাধারণতঃ বৎসরে ৫০ টাকা, কোথায় বা ইহার বেশী। কিসানের ন্যায় ইহারাও বৎসরে ধুতি ও গামছা পায়। গৃহস্থের গো মহিষাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করাই ইহাদের কাজ।

রাখাল বা বাগাল

গ। **মুনিস ও মজুর:**

যাঁহারা ভাগ প্রথায় জমি আবাদ করান তাঁহারা ব্যতীত অন্য সব কৃষকই চারা রোপণ, জমি নিড়ান, ফসল কাটা ইত্যাদি কাজে মুনিস নিযুক্ত করেন। যে সকল কৃষক নিজ হস্তে জমি চাষ করেন তাঁহারাও

মুনিস বা মজুর

অনেক স্থলে বিশেষতঃ "জো"-এর সময় মুনিস রাখিতে বাধ্য হন। মুনিসের পারিশ্রমিক সাধারণতঃ দৈনিক এক টাকা ও খোরাকি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণী সাধারণতঃ বাগ্‌দি, বাউরি ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। মুনিসের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সংখ্যাবাহুল্য দেখা যায় এবং প্রতিবৎসর এই কাজ করিবার জন্য বাহির হইতে বহু সাঁওতাল পরিবার এই অঞ্চলে আগমন করে।

ক্ষেত-মজুরের সাধারণ অবস্থা

ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর অধিকাংশই ভূমিহীন ও সমাজের নিম্নস্তরের লোক। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম উপভোগ তাহাদের নাই বলিলেই চলে। যে কৃষক-গৃহস্থ তাহাদেরকে নিযুক্ত করে, তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া তাহাদের থাকিতে হয়। সুতরাং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বা বন্যার বৎসরে যখন কৃষিকর্মের চাহিদা থাকে না বা অতিশয় কম থাকে ক্ষেত-মজুরই তখন সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ইং ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের অসহায়তার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। ইং ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন সুপারিশ করেন যে ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হওয়া উচিত ও ইহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্তরও উন্নত হওয়া আবশ্যক। কমিশনের মতে কৃষি-মজুরের সমবায় গঠন হওয়া প্রয়োজন আর সরকারের পক্ষে এই সমবায়ের সুষ্ঠু গঠন কিভাবে হইতে পারে ও সমবায়ের সভ্যশ্রেণীভুক্ত কৃষি-মজুরের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কমিশন মন্তব্য করেন যে, এইরূপ সমবায় সমূহের মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ও সরকার বিবেচনা করিতে পারেন। এই বিষয়ে আর বিশেষ কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

ভাগদার বা বর্গাদার

ভাগদার ক্ষেত-মজুর পর্যায়ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ভাগদার যে জমি ভাগপ্রথায় চাষ করে, তাহাতে তাহার কোনই স্বত্ব নাই। জমির অধিকারী সাধারণতঃ এই চুক্তিতে ভাগদার নিয়োগ করে যে, উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক তাহার প্রাপ্য, অপর অর্ধেক পাইবে ভাগদার। এই চুক্তি অনুযায়ী চাষের বলদ, লাঙ্গল ও বীজ সরবরাহ করিবে ভাগদার, জমিতে যদি সার প্রয়োগ প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যয়

উভয় পক্ষে সমভাবে বহন করিবে। ভাগদার অপারগ হইলে, বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতি জমির মালিকেরই সরবরাহ করিতে হয় আর এরূপ ক্ষেত্রে মালিকের প্রাপ্য হয় উৎপন্ন ফসলের তিন-চতুর্থাংশ ও ভাগদার পায় অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার ইহার ব্যতিক্রম হয়; তখন ভাগদার হয় তিন-চতুর্থাংশ পাইবার হকদার। কিন্তু এই তে-ভাগা প্রথা বর্ধমানে প্রসার লাভ করে নাই।

ভাগ প্রথা পুরাতন কিন্তু ইহার প্রসার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যাঁহারা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রণীত "বাংলার কৃষক জীবন" (Bengal Peasant Life) পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কাহিনীর নায়ক গোবিন্দ সামন্ত ও তাঁহার পিতা বদন ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ স্বহস্তে জমি চাষ আবাদ করিতেছে। এই সামন্ত পরিবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু বর্তমান যুগে এই সম্প্রদায়ের অতি অল্প সংখ্যককেই নিজ হাতে লাঙ্গল ধরিয়া জমি চাষ করিতে দেখা যায়। তাহাদের জমি চাষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগদার। ভাগদারের মধ্যে আছে সাঁওতাল, বাউরি, বাগ্‌দি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী বা মুসলমান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নানা কারণে কৃষি সমস্যার পরিবর্তনের সূচনা হইয়া ভাগ-চাষ প্রথার সম্প্রসার হয়। ইং ১৯২৬-১৯৩২ সালে জিলায় যে জরিপ কার্য চলে, তাহার রিপোর্টে এই প্রথার আধিক্যের উল্লেখ আছে। বিগত ইং ১৯৫১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে ভূমিসংযুক্ত কৃষিজীবীর এক-তৃতীয়াংশ ভাগদার মাধ্যমে জমি চাষ আবাদ করে। বর্তমানে জিলার সর্বত্রই ভাগ প্রথায় চাষের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু আসানসোল মহকুমার যে অঞ্চলে সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণী কৃষিজীবীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, সেখানে ভাগ প্রথার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম।

কয়েকটি বিশেষ কারণে ভাগদারকে জমির মালিক বা জোতদারের উপর নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। যদিও প্রথানুসারে ভাগদার সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাইবার হকদার, ইহাদের খুব কমই তাহা পাইয়া থাকে। ফসল ভাগ হইবার সময় জমির মালিকের নিকট হইতে ভাগদার ইতিপূর্বে যে ধান বারী প্রথায় ঋণ লইয়াছিল, প্রথমতঃ তাহা সুদ

সমেত আদায় করিয়া লওয়া হয় ; তারপর অবশিষ্ট ফসল ভাগ হয়। এই ঋণ একরূপ চিরন্তন বলিলেই চলে। ঋণের কারণ, প্রথমতঃ অধিকাংশ ভাগদারই যে জমি চাষ করে, তাহা হইতে প্রাপ্ত ফসলে সম্বৎসর সংসার চালাইতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ চাষ আবাদ ছাড়া অন্য কোনও কাজে তাহারা বিশেষ আকৃষ্ট হয় না। খোরাকীর যখন অভাব হয়, তখন মালিক বা জোতদারের নিকট বারী প্রথায় ধান লয়, ইহার সুদ সাধারণতঃ মণ প্রতি দশ সের। অজন্মার বৎসর বাধ্য হইয়া বেশী পরিমাণে ধান লইবার আবশ্যক হয়। বহুকাল ধরিয়া এইরূপ ঋণ লইতে লইতে অনেক সময় অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে ভাগদারের প্রাপ্য অংশের ফসলে তাহার তিন চার মাসের অধিক চলিতে পাবে না। এই অবস্থায় কেহ কেহ আবার বারী লয়, কেহ বা অর্ধাহার বা অনাহারে থাকে, আবার কেহ বা কর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ কবে। ভাগদারের জীবন চিরপরমুখাপেক্ষী দাসেব জীবন। ইহার অবসানের চেষ্টা বহুবার করা হইয়াছে কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাই এযাবৎ ফল-দায়ক হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাগদাব যে জমি চাষ করে তাহাতে তাহাকে প্রজাই স্বত্ব প্রদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব পরিণামে গৃহীত হয় নাই। ইং ১৯৫৫ সালেব জমিদারী বিলোপেব সঙ্গে বহুক্ষেত্রে ধাবণা জন্মে যে উদ্বৃত্ত কৃষি বা কৃষি-যোগ্য জমি ভাগদারের সহিত প্রজাই স্বত্বে বন্দোবস্ত হইবে এবং ইহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ নগণ্য এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে ইহার স্থান নিতান্তই কম। সুতরাং ভাগদার সমস্যা পূর্বের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষক-জীবন

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁহার "বাংলার কৃষক-জীবন" (Bengal Peasant Life) নামক গ্রন্থে বর্ধমানের পল্লী ও পল্লী-জীবনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। প্রায় সুদীর্ঘ একশত বৎসর পরেও এই আলেখ্যের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় নাই।

কৃষক-পল্লী

"কাঞ্চনপুর একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বসবাস, তাহাদের অধিকাংশই শ্রোত্রিয় শ্রেণীর। কায়স্থের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উগ্রক্ষত্রিয়গণ—সাধারণ ভাষায় যাহাদের "আগুরি" বলা হয়—সকলেই কৃষিজীবী; সংখ্যায় সদ্‌গোপ সম্প্রদায় হইতে কম হইলেও, তাহারা গ্রামের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী। ইহা ছাড়াও গ্রামে আছে অনেক জাতি, যেমন—বৈদ্য, কর্মকার, নাপিত, তন্তুবায়, বেনিয়া, তিলি, বাগ্‌দি, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি।

"বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক গ্রামের ন্যায় কাঞ্চনপুর চারিভাগে বা পাড়ায় বিভক্ত—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত; পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ অধিকতর বড়। একটি রাস্তা গ্রামের উত্তর দিক হইতে বাহির হইয়া সোজা দক্ষিণদিকে গিয়াছে আর ইহার সহিত মিশিয়াছে ছোট বড় বহু রাস্তা পূর্ব ও পশ্চিম হইতে। গ্রামের অধিকাংশ গৃহই মাটির, উপরে খড়ের চাল। কয়েকটি পাকা বাড়ীও আছে, ইহাদের মালিক কায়স্থ অথবা মহাজন শ্রেণী। প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে পাকা কিম্বা কাঁচা বাড়ীর সারি; প্রতি বাড়ীতে আঙ্গিনা আছে, আঙ্গিনায় দুই একটি গাছও আছে, যেমন—কুল, আম, পেয়ারা, লেবু, পেপে অথবা কলা গাছ। গ্রামের বাহিরে প্রধান রাস্তাটি দুইদিকে প্রায় একপোয়া মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, আর ইহার দুইদিকে আছে অশ্বত্থ গাছের মনোরম সারি। গ্রামের মধ্যস্থলে আছে দুইটি শিব মন্দির পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া। ...... প্রত্যেক পাড়ায়

কেন্দ্রস্থলে আছে একটি করিয়া বকুল গাছ ; গাছের মূলদেশ তিন-চার ফুট উঁচু করিয়া বৃত্তাকারে বাঁধান, মধ্যে গাছের গুড়ি। বৃত্তের পরিধি বার ফুটের কম নহে আর বহুলোক ইহার উপর বেশ স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। অপরাহ্নের দিকে দেখা যায় যে, গ্রামবৃদ্ধেরা এখানে মাতুর অথবা সতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া আছেন ও গ্রাম্য রাজনীতি আলোচনায় অথবা তাস, পাশা ও দাবা খেলায় মত্ত হইয়াছেন।

"গ্রামে পাঁচ ছয়টির বেশী দোকান নাই। দোকানে বাঙালী জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য, যেমন—চাউল, লবণ, সরিষার তেল, তামাক প্রভৃতি বিক্রয় হয়। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলা জায়গায় সপ্তাহে তুইদিন—মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার—হাট বসে আর এই হাট গ্রামবাসীকে তরকারি, বস্ত্র, মসলা, ছুরী-কাঁচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক-গৃহ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

কৃষক-গৃহ

"রাস্তার উপর আমকাঠের ছোট একটি দরজা ; তাহার ভিতর দিয়া পূর্বমুখী হইয়া বদনের গৃহে প্রবেশ করিলে প্রথমেই পড়িবে উঠান। দেশের সব কৃষক-গৃহেই উঠান অপরিহার্য। উঠানের পশ্চিম পার্শ্বে বড় ঘর ; ঘরের দেয়াল প্রশস্ত, মাটির তৈয়ারী, আর উপরে এক হাতেরও বেশী গভীর খড়ের চাল। এই ঘর প্রায় ষোল হাত দীর্ঘ ও বারান্দা-সহ বার হাত প্রশস্ত। বারান্দা উঠানের দিকে, ইহার খুঁটি তাল গাছের। ঘরটির মধ্যে তুইটি কামরা, একটি বড় আর একটি ছোট। বড় কামরাটি বদনের শয়ন কক্ষ, ছোটটি ভাঁড়ার। ভাঁড়ারে আছে অনেকগুলি মাটির হাঁড়ি, আহার্য সামগ্রীতে পূর্ণ। বারান্দাটি হইতেছে পরিবারের মেয়েদের বৈঠকখানা, এখানে তাহাদের বান্ধবী বা পরিচিতা স্ত্রীলোকগণ মাতুরে উপবেশন করে। গৃহের কাঁসার বাসন ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র বদনের শয়ন কক্ষে রাখা হয়। এই কক্ষে কোনও খাট বা তক্তপোষ নাই; বদন মাতুরের উপর তোষক বিছাইয়া মেজের উপরেই শয়ন করে। ঘরের ভিতর সূর্যালোকের প্রবেশ কম, কারণ বারান্দার চাল আলো প্রবেশের বাধা জন্মায়। ঘরে জানালা আছে বটে, কিন্তু ইহা মাত্র একটি ক্ষুদ্রকায় গবাক্ষ, রাস্তা সংলগ্ন দেয়ালের উপরের দিকে অবস্থিত। ঘরের ভিতর কোনও আসবাব-

পত্র নাই তাহা বলা বাহুল্য। কোনও টেবিল নাই, চেয়ার নাই; আলমারি, আনলা, টুল কিছুই নাই। এক কোণে আছে মাত্র একটি কাঠের তোরঙ্গ।

"উঠানের দক্ষিণ দিকে একখানা ছোট ঘর আছে, ইহা গুদাম হিসাবে অর্থাৎ কৃষির যন্ত্রপাতি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ছোট ঘরটির বারান্দায় ঢেঁকি আছে আর সেইজন্য এই ঘরকে বলা হয় ঢেঁকিশালা—চলতি কথায় 'ঢেঁকশাল'।

"উঠানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একখানা ঘর আছে, ইহার বারান্দায় রান্না হয় বলিয়া ঘরটিকে বলা হয় পাকশালা। কিন্তু বদন ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট এই ঘর রান্নাঘর নামেই পরিচিত। বাড়ীর মধ্যে আর একটি ছোট ঘর আছে তাহা হইতেছে গোশালা, সাধারণ কথায় গোয়াল। কতকগুলি বড় মাটির গামলা, যাহাকে বলা হয় "নান্দ", গোয়াল ঘরে মেঝের উপর মাটির ঢিবিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে, এগুলিতে গবাদি পশুর খাদ্য ও পানীয় জল দেওয়া হয়। ইহাদের নিকটই গরু বাঁধিবার জন্য বাঁশের খুঁটি মাটিতে পোঁতা আছে। গোয়ালের এক পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় একটি জায়গা—এখানে গবাদি পশুকে মশা-মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিকালে ঘুটে পোড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়া হয়। বাড়ীর পূর্বদিকে ছোট একটি ডোবা; বদনের গৃহের লোক ও নিকটস্থ অন্যান্য প্রতিবেশী এই ডোবাকে নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের জন্য ব্যবহার করে। পানীয় জল আনা হয় গ্রামের বাহিরের বড় পুকুর হইতে।

"উঠানের প্রায় মধ্যভাগে গোয়াল ঘরের নিকট ধানের গোলা—বর্ধমান জিলায় ইহাকে বলা হয় মরাই। মরাই-এর আকৃতি অনেকটা স্তূপের ন্যায়; খড় পাকাইয়া দড়ির মত লম্বা করিয়া মরাই তৈয়ার হয়, উপরে থাকে গোলাকার খড়ের চাল। সম্বৎসরের প্রয়োজন মত ধান এই মরাইতে রাখা হয়। মরাই-এর কিছু দূরেই খড়ের গাদা যাহাকে বলা হয় পালুই। এখানে যে খড় স্তূপীকৃত থাকে তাহা গো-মহিষাদি গৃহ-পালিত পশুর সারা বৎসরের আহার।

"রান্নাঘরের পিছন দিকে ডোবার নিকট সারকুর। সারকুর হইতেছে একটি বড় অগভীর গর্ত আর এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হয় গৃহের যাবতীয়

জঞ্জাল, উনুনের ছাই. গোয়াল ঘরের আবর্জনা আর তরকারীর খোসা। এই সারকুর স্বাস্থ্যের দিক হইতে অনিষ্টকর হইলেও কৃষকের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ জমিতে প্রয়োগ করার জন্য যে সারের দরকার তাহা এখান হইতেই পাওয়া যায়।"

কাহিনী পাঠে মনে হয় ইহা যেন বর্তমান কৃষক জীবনেরই কথা। কৃষক পুরাতনপন্থী, সুতরাং ভাবধারার কিছু পরিবর্তন হইলেও ব্যবহারিক জগতে পুরাতন সংস্কার, রীতিনীতি পূর্বের ন্যায়ই বজায় আছে।

কৃষকের অর্থ-নৈতিক জীবন

কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৮ জন হইবে ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিজ জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালাইতে সক্ষম বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহাদের সংখ্যা হইবে শতকরা প্রায় ৪৮ জন। অবশিষ্ট যাহারা রহিল. তাঁহাদের বিন্যাস এইরূপ : (১) যাহাদের জমি সংসার চালাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং যাহাদের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, (২) যাহাদের মাত্র যৎসামান্য কৃষি জমি আছে কিন্তু ইহা প্রধান উপজীবিকার পর্যায়ে আসে না, (৩) ভূমিহীন কৃষিজীবী। প্রথম শ্রেণীর দখলে যে কৃষি জমি আছে তাহার পরিমাণ পরিবার প্রতি ১৫ বিঘা বা তাহার অধিক। দ্বিতীয়-শ্রেণীর কৃষি জমির পরিমাণ পরিবার প্রতি নয় হইতে পনের বিঘার মধ্যে এবং তৃতীয় শ্রেণীর পরিবার প্রতি নয় বিঘার কম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী নিজ নিজ ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্য অপরের জমি ভাগে চাষ করে, কৃষি মজুব বা অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করে কিম্বা সামান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। চতুর্থ শ্রেণী প্রধানতঃ ভাগদার অথবা কৃষি-মজুর হিসাবে কাজ করে।

কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৮ জনকে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীল বলা হইয়াছে। ইহাদের এক প্রধান অংশের আবাদি জমির পরিমাণ পরিবার প্রতি ১৫ হইতে ২০ বিঘার মধ্যে। এই পরিমাণ জমি বর্তমান যুগে সাধারণ কৃষক পরিবারের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তাহা বিচারের বিষয়। পুরাতন অর্থনীতি অনুসারে পাঁচ একর বা পনের বিঘা জমি সাধারণ কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক জীবনের মূলসূত্র ও স্বয়ংনির্ভরতার পরিচায়ক। ইহাতে কৃষক পরিবারের

লোকসংখ্যা ধরা হইয়াছে গড়ে পাঁচজন, এবং এই মতে ১৫ বিঘা জমি এই পরিবারের পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই মত প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে লোকের আয়ু বৃদ্ধি হইয়াছে ; পোষ্যবর্গের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। তারপর জীবন-যাত্রার ধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে। কৃষক এখন আর মাত্র ধুতি ও গামছায় অঙ্গ আচ্ছাদনে সন্তুষ্ট নহে। পুত্র-কন্যা যে বিদ্যায়তনের বাহিরে থাকিবে সেই ধারণা এখন আর গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যাধির প্রতিকার ও নিরাময়ের জন্য কৃষক আর গ্রাম্য দেবতা বা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহে না। রাত্রিতে যে গৃহে বাতি জলিবে না সে দুঃস্বপ্ন এখন আর তাহার মনে স্থান পায় না। পুরাতন অর্থনৈতিক তথ্য এই সকল করণীয় দায়গুলির অধিকাংশ ইহার তালিকা হইতে বাদ দিয়াছে, কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অযৌক্তিক। সুতরাং একুশ বিঘার কম কৃষি-জমি সাধারণ কৃষকের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে হয়।

ঋণ

উপরোক্ত কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে অনেকে আবার জমির আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না, সুতরাং ঋণের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেকগুলি অনিবার্য কারণে ঋণ প্রয়োজন হয়। অজন্মা বা অন্য কোনও কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণ শস্যহানি হইলে ঋণ আবশ্যক। কৃষি কার্যের উপযোগী মহিষ, বলদ বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য নগদ টাকার সঙ্কুলান অনেক সময় হয় না, তখন কৃষক ঋণ করে। কোনও সময় আবার ঋণ করিয়া বীজ ধান খরিদ করিতে হয়। তারপর আছে পিতৃদায় অথবা মাতৃদায়, চিকিৎসা, পুত্র কন্যার বিবাহ অথবা তাহাদের শিক্ষার ভার বহন। ইহার জন্যও অনেক সময় ঋণের প্রয়োজন হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের স্পৃহা প্রভৃতি কারণও সময় সময় ঋণ সংগ্রহ করিতে কৃষককে প্ররোচনা দেয়। পূর্বে গ্রামের মহাজন শ্রেণী ঋণ জোগাইত, কিন্তু বর্তমানে তাহাদের নিকট ঋণ পাওয়া দুষ্কর কারণ কারবারে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্নি করা তাহারা অধিকতর লাভজনক মনে করে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণ সংগ্রহ হয় নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে :

পল্লী ঋণ সমবায় সমিতি

বারী প্রথা

সরকারী কৃষি ঋণ

খাই খালাসি বন্ধক।

অপরিহায কারণে জমি বিক্রয় হয়। পুত্র কন্যার বিবাহে যদি অত্যধিক ব্যয় অনিবার্য হইয়া পড়ে, অথবা যদি নৈসর্গিক কারণে বিস্তৃত শস্যহানি হয়, তবে জমি হস্তান্তর করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় থাকে না।

বারী প্রথায় ঋণ গ্রহণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ দরিদ্র বা অসচ্ছল কৃষকের মধ্যেই এই প্রথার প্রচলন বেশী। তাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের নিকট হইতে ধান ধার কবে এই চুক্তিতে যে পরবর্তী উৎপন্ন শস্য হইতে আসল ঋণ এবং তাহা ছাড়াও সুদ স্বরূপ মণ প্রতি দশ সেব পরিমাণ শস্য মহাজনকে দিবে। এই প্রথা ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণীর পক্ষে অনেক সময় দুঃসহ হইয়া পড়ে, কারণ সুদসহ আসল ধান পবিশোধ করার সামর্থ্য সব সময় থাকে না, এবং এই জন্য পরিশেষে বাধ্য হইয়া জমি হস্তান্তর কবিতে হয়।

আমোদ-প্রমোদ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে কৃষকের জীবন নীরস, বৈচিত্র্যহীন। জমি চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন, উৎপন্ন শস্য গোলাজাত বা বাজারে বিক্রয়, গৃহপালিত গো-মহিষাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতিই তাহার যাবতীয় কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে অভিভূত করিয়া রাখে। সুতরাং শিমুল ও পলাশেব লাল রঙ যখন পল্লীর বনরেখায় আগুন ধরাইয়া দেয় অথবা জ্যোৎস্নারাত্রে পাপিয়ার কণ্ঠ যখন পল্লীব নিঃস্তব্ধ আকাশ মুখরিত করে, কৃষকের বাস্তব প্রাণে তখন কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বা রেখাপাত হয় না। বর্ষায় নূতন তৃণদলে যখন বাদলের ছায়াপাত হয় তখন কোনও কবি-সুলভ পুলকের স্পর্শ তাহার প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। ইহা কিছু পরিমাণে সত্য হইলেও কৃষক তাহার অবসর যাপনের আনন্দ অন্যভাবে উপভোগ করে। পূর্বকালের কবিগান, ল'টে, যাত্রা, ভাসান বা চণ্ডীগান এখন বিরল হইলেও, অষ্ট-প্রহর নামকীর্তন প্রভৃতি এখনও বজায় আছে। প্রথম ধান যখন কৃষকেব গৃহে আনিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার আনন্দ প্রতিফলিত হয় "নবানে"। এই নবান বা নবান্ন মহা সমারোহে

প্রতিপালিত হয়। তারপর পৌষ মাসের সহিত আসে এক আনন্দের হিল্লোল। পৌষ মাসের অবসান কল্পনা কৃষকের পক্ষে পীড়াদায়ক, তাই পৌষ-সংক্রান্তির সময় কৃষক-সন্তান পল্লীর পথে পথে পৌষকে আবেদন জানায়—

"এস পৌষ যেও না
জন্মে জন্মে ছেড়ো না।"

গাজনের সময় যখন পল্লীবাসীর প্রাণে এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি করে, তখন কৃষক তাহার বাহিরে থাকে না। ঝাঁপান, কালী পূজা ও দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে কৃষকের গতানুগতিক জীবনে বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটায়। কখনও বা দূরের সিনেমা কৃষকের আকর্ষণের বিষয় হয়, যেমন হয় মেলা। এই মেলার বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র ও মেলা

বাজার ও ব্যবসা-কেন্দ্র

বর্ধমানের প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান। আলু ও আকও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাহা ছাড়া পাট ও নানাপ্রকার ডাল ও অন্যান্য রবিশস্য এই জিলার উৎপন্ন শস্যের ভিতর এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। আসানসোল অঞ্চলে কয়লা একটি বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্য। এখানে বহু শিল্পসংস্থাও বিগুমান। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া বহু বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান, তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১। ধান ও চাউল

বর্ধমান সদর মহকুমা :	বুদবুদ	গলসি
	ভেদিয়া	গুসকরা
	ভাতার	বলগোনা
	কেশবগঞ্জ চটি	বাজে প্রতাপপুর
	সদরঘাট	মেমারি
	সেহারা বাজার	রসুলপুর
	শক্তিগড়	থানা
কাটোয়া মহকুমা :	রামজীবনপুর	
	কাটোয়া	নিগন
	শ্রীখণ্ড	কইচর
কালনা মহকুমা :	পাটুলি	নাদন ঘাট
	মন্তেশ্বর	কালনা
		কুসুম গ্রাম
আসানসোল মহকুমা :	জামুরিয়া	রাণীগঞ্জ
	দুর্গাপুর	পানাগড়

এই সব স্থানে বৎসরে বহুলক্ষ মণ ধান ও চাউল খরিদ বিক্রি হয়। ধানের প্রধান ক্রেতা হইল চাউল-কল। চাউলের ক্রেতার মধ্যে প্রধান হইল ব্যবসায়িগণ ও শিল্প-সংস্থা সমূহ। পূর্বে আমদানি চাউলের মধ্যে ঢেঁকিছাটা চাউলের প্রাধান্য ছিল কিন্তু ইদানীং ধানভাঙ্গা কল প্রচলনের

বাহুল্য হেতু ইহার আমদানি কমিয়াছে। আসানসোল মহকুমায় এক প্রকার মোটা আছাঁটা চাউল পাওয়া যায় ; শ্রমিকগণ এই চাউল বিশেষ পছন্দ করে। এই চাউল আবার পচাই প্রস্তুতির একান্ত উপযুক্ত বলিয়া শিল্পাঞ্চলের পচাই দোকানগুলি ইহার এক প্রধান ক্রেতা।

২। **আলু ও আক :**

জিলার প্রায় সর্বত্রই এই দুইটি বেশী বা কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার পর বহু পরিমাণে আলু ও আকের গুড় বাহিরে রপ্তানি হয়।

প্রধান প্রধান বাজার হইল—

বর্ধমান সদর মহকুমা :	জামালপুর	মেমারি
	রসুলপুব	গুসকবা
	বাজে প্রতাপপুব	
কালনা মহকুমা :		কালনা
		নাদনঘাট
কাটোয়া মহকুমা :		কাটোয়া

৩। **পাট :**

পাট চাষের ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে। প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রের মধ্যে আছে—

বর্ধমান সদব মহকুমা :	জামালপুর
কালনা ,,	কালনা
	নাদনঘাট
কাটোয়া ,,	দাঁইহাট
	কাটোয়া

৪। কাটোয়া ও কালনার চর অঞ্চলে এবং দামোদরের মানায় অড়হর, ছোলা, মুসুর, যব ও গম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রধান প্রধান বাজার হইতেছে—

কালনা মহকুমা :	নাদনঘাট
কাটোয়া ,,	কাটোয়া

৫। শিল্পাঞ্চলের নিম্নলিখিত ব্যবসাকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সকলেরই অবস্থান আসানসোল মহকুমায়।

বরাকর	সীতারামপুর
আসানসোল	জামুরিয়া
বরাবনি	রাণীগঞ্জ
উথরা	

প্রসিদ্ধ মেলা

মেলার উৎপত্তি হইতেছে ধর্ম বিশ্বাস বা প্রাচীন কোনও কাহিনী উপলক্ষ করিয়া। পল্লী-জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে মেলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে মেলা অনুষ্ঠানের সময়ের সহিত প্রধান শস্য আহরণের সময়ের সামঞ্জস্য থাকে। তখন পল্লীবাসী কৃষকের অবস্থা থাকে স্বচ্ছল সুতরাং সম্বৎসরের জন্য গার্হস্থ্য জীবনের বা চাষাবাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার কোন অসুবিধা হয় না। আর মেলায় সেইগুলির আমদানি হয় যথেষ্ট। মেলার অপর একদিক হইতেছে পল্লীবাসীর গতানুগতিক জীবনে কিছু ব্যতিক্রম। মেলার সময়ের এক সাধারণ দৃশ্য—কৃষক পরিবার গো-যানে বা পদব্রজে চলিতেছে এক আনন্দের সন্ধানে, বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসাদ দূর করিতে।

জিলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ মেলার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। দধিয়া বৈরাগিতলা মেলা ঃ

দধিয়ার অবস্থান কেতুগ্রাম থানায়, বীরভূম জিলার প্রান্তে। মেলার সময় মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি। মূল উৎসবে বৈষ্ণব প্রাধান্য বর্তমান। বাউল বৈষ্ণবের সমারোহও হয় প্রচুর। মেলার স্থিতিকাল মাসাধিক। এই মেলায় দশ সহস্রাধিক লোক সমাগম হয়। সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিন্ন মেলায় আসে নানা প্রকার কাঠের আসবাব। মেলার অন্নকূট মহোৎসব আকর্ষণীয়।

২। নৈহাটির গাজন মেলা ঃ

নৈহাটি কাটোয়া মহকুমার একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহার অবস্থান ভাগীরথী তীরে। বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পিতৃভূমি এই নৈহাটি। এখানে বাৎসরিক গাজনের সময় চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। মেলার আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত বহু গাজন সন্ন্যাসী ও মনোহারী এবং খাবারের দোকানের শ্রেণী। গ্রামবাসীদের ব্যবহার্য যাবতীয় তৈজসপত্রাদিও এখানে পাওয়া যায়।

৩। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মেলা ঃ

ক্ষীরগ্রামের অবস্থান কাটোয়া মহকুমায়, বর্ধমান-কাটোয়া রেল পথের কইচর ষ্টেশনের নিকট। পুরাণোক্ত বাহান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ ক্ষীরগ্রাম। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিব যখন তাঁহার দেহ স্কন্ধে করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করেন, তখন বিষ্ণু চক্রে সতীর দেহ বাহান্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে; যেখানে সতীর কোনও না কোন দেহখণ্ড পতিত হয়, সেই স্থান হয় পীঠস্থান। ক্ষীরগ্রাম এইরূপ একটি পীঠস্থান, দেবী যোগাদ্যা। দেবী সারাবৎসর নিকটস্থ ক্ষীর দীঘির জলে নিমগ্না থাকেন। বৎসরে মাত্র একবার বৈশাখী সংক্রান্তির সময় তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া পূজা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে বহু যাত্রী সমাগম হয়।

৪। জামালপুরের বুড়োরাজ মেলা ঃ

বুড়োরাজকে স্থানীয় জনসাধারণ পুরাণোক্ত শিব ঠাকুরের সহিত অভিন্ন মনে করে। মতান্তরে তিনি ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর ভিন্ন আর কেহ নহেন। বুড়োরাজের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয় বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। তখন তাঁহার পীঠ কালনা মহকুমার জামালপুরে প্রভূত জনসমাগম হয়। এই উপলক্ষে যে মেলা বসে তাহার স্থিতিকাল এক সপ্তাহ। মেলার আকর্ষণীয় বস্তু হইলগাজন সন্ন্যাসীর প্রচুর সমাবেশ ও অসংখ্য ছাগ বলি। পল্লীবাসীর অবশ্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য মেলায় আমদানি হয়।

৫। কাটোয়ার কার্তিক মেলা ঃ

এই মেলা প্রতিবৎসর কার্তিক পূজার সময় কাটোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। স্থিতিকাল মাত্র দুইদিন। দ্বিতীয় দিনের উৎসবই হয় বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ। নানারূপের ও নানা আকৃতির কার্তিক ঠাকুরের মূর্তির শোভাযাত্রা এই দিনের বৈশিষ্ট্য। কোন্ মূর্তি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও গ্রহণ-যোগ্য তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা ও তুমুল বাগবিতণ্ডা হয় এবং সাধারণ ভাষায় ইহার নাম "কার্তিকের লড়াই"। সহস্র সহস্র পল্লীবাসী এই উপলক্ষে কাটোয়া সহরে সমবেত হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই রাত্রিকালে গৃহে ফিরিতে অসমর্থ হইয়া সহরের যেখানে স্থান পায় সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করে।

৬। ছোটখণ্ডের ঝাঁপান মেলা :

ছোটখণ্ড স্থানটি হইতেছে মেমারি হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্বে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর। প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে মনসা পূজার সময় এখানে মেলা বসে। মেলার প্রধান দ্রষ্টব্য হইল নানা জাতীয় সাপের বিপুল সমাবেশ। মাল বা মাল বৈগুেরা সাপের নানারূপ খেলা দেখায়। মনোহারী ও মিষ্টির দোকানের শ্রেণী মেলার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

৭। বোহারের পীর গদাই সাহেবের মেলা :

বোহারের অবস্থান বর্ধমান কালনা রাস্তায় সাতগাছিয়ার কিছু পূর্বে। ইহা একটি প্রাচীন পল্লী ও মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে পীর গদাই সাহেবের স্মৃতিতে এখানে মেলা হয় ও ইহাতে বহু লোকসমাগম হয়।

৮। উখরার ঝুলন মেলা :

উখরা আসানসোল মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে গোপীনাথ ও বৃন্দাবন ঠাকুরের মন্দির আছে। প্রতিবৎসর ঝুলন পুর্ণিমায় এখানে মেলা বসে ও তাহাতে লোকসমাগম হয় প্রচুর। মেলায় মনোহারী ও নানাবিধ খাবারের দোকানের প্রাচুর্য দেখা যায়।

৯। শিবচতুর্দশী মেলা : নবাবহাট, বর্ধমান :

শিবরাত্রি উপলক্ষে বর্ধমানের বিখ্যাত ১০৮ শিব মন্দির কেন্দ্র করিয়া মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় বহু সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ভিন্নও এখানে বহু মনোহারী ও মিষ্টির দোকানের সমারোহ হয়।

জিলায় আরও বহু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন কসবা-চম্পাই নগরীর মেলা, ইছুভাগরার বুড়োরাজ মেলা ইত্যাদি। কয়েকটি মেলার তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

চতুর্থ পর্ব

শিল্প ও শিল্পাঞ্চল

প্রথম অধ্যায়

ক্ষুদ্র শিল্প

বর্ধমানের প্রাচীন কুটীর-শিল্প

পূর্বে বর্ধমানে নানাবিধ শিল্পের প্রচলন ছিল। নেতের বসন ও পট্টবস্ত্রের উল্লেখ রামাই পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের বহু কবি করিয়া গিয়াছেন। কবি-কঙ্কণ চণ্ডী ও চৈতন্য চরিতামৃতে বহু প্রকার অলঙ্কারের প্রচলন দৃষ্ট হয়। শঙ্খ ও কাংস্য শিল্প, ইস্পাত-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, নৌ-শিল্পেও বর্ধমান সমৃদ্ধিশালী ছিল। সুদক্ষ শিল্পীরও অভাব ছিল না। শিল্প ছিল বংশগত, পুরুষানুক্রমিক। তন্তুবায়, স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক প্রভৃতি বহু শ্রেণীর মধ্যে ছিল ইহা সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাস্কর্যের গৌড়ীয় রীতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল বর্ধমান। এখনও পুরাতন মন্দিরেব বহির্ভাগে পোড়ামাটির কারুকার্য বিস্ময়কর স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দেয়। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহ, বর্ধমানের রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রভৃতি দাঁইহাটের ভাস্করগণের অপূর্ব প্রতিভার সাক্ষ্য। বর্ধমান যখন কোম্পানির অধিকারে আসে তখন ইহার রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, পিতল-কাঁসার বাসন, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি ইস্পাত দ্রব্য সর্বত্র সমাদর লাভ করিত। ইং ১৯০৮-৯ সালে জিলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের সময় এই সকল শিল্প অবনতির পথে হইলেও ইহাদের প্রসার কম ছিল না। তারপর আরও অবনতি ঘটে এবং কুটীরশিল্পের পূর্ব গৌরব ক্রমশঃ লোপ পায়। কয়েকটি কুটীরশিল্পের বর্তমান পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

শিল্পের বর্তমান পরিচয়

তাঁত-শিল্প

তাঁত শিল্প অতি প্রাচীন। পূর্বে জিলায় বহু দক্ষ তাঁতির আবাস ছিল। কাটোয়া, দাঁইহাট, মেমারি প্রভৃতি অঞ্চল এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। মানকরের চেলি দেশ দেশান্তরে খ্যাতি অর্জন করিত। কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় গুটি পোকার চাষ হইত ও তসরের বস্ত্র উৎপন্ন হইত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সুতিবস্ত্র উৎপাদন করিয়া বহুসংখ্যক লোক জীবিকা অর্জন করিত। পূর্বস্থলী, কালনা, মেমারি, মন্তেশ্বর, জামালপুর ও কাটোয়া থানায় বহু তাঁতি এই কার্যে নিযুক্ত থাকিত। ইং ১৯০৮-৯ সালে এই জিলায় ২৫৮৫৪০০ গজ সুতি

কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। তারপর নানা কারণে এই শিল্পের অবনতি হয় ও বর্তমানে অল্পসংখ্যক লোকই তাঁতের উপর নির্ভর করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব-বঙ্গের বাস্তহারা তাঁতিও আছে। সমবায় প্রথার মাধ্যমে তন্তুবায় শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা হইতেছে। বর্তমানে এই সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১২০, কিন্তু সুতা সরবরাহ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আত্মনির্ভরশীল নহেন বলিয়া তাঁত শিল্প ব্যবসায় লাভজনক ও আকর্ষণীয় হইতে পারিতেছে না।

ইস্পাত-শিল্প

এক সময় বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী কাঞ্চন-নগর ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাঞ্চননগরে প্রস্তুত তরবারি, কাটারি, ছুরী, কাঁচি ও তালা এইরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করে যে কালস্রোত তাহা ম্লান করিতে পারে নাই। পরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কাঞ্চননগর বিধ্বস্ত হয়, ইহার শিল্পও বিনষ্ট হয়। কাঞ্চননগর ছাড়াও বনপাশ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান ইস্পাত শিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কালবশে তাহাদের গৌরবও ম্লান হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জিলায় মাত্র ১৪৫৮ ডজন ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বর্তমানে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবন ধারণ করে। পুরুষ পরম্পরা ধরিয়া যাহারা ইস্পাত শিল্পের কাজ করিয়া আসিতেছে তাহারা হইল কর্মকার বা কামার। কামার এখন ছুরী কাঁচি তৈয়ারী পূর্বের ন্যায় করে না বটে, কিন্তু কৃষক-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি দ্রব্যের জন্য পল্লী-সমাজে এখনও তাহার স্থান আছে। কাস্তে, লাঙ্গল বা লাঙ্গলের ফলা, কোদালি প্রভৃতি প্রতি বৎসর তৈয়ার বা কামারশালে দিয়া কার্যোপযোগী করার প্রয়োজন হয়; গরুর গাড়ীর চাকা প্রস্তুত বা মেরামত করিতে হয়; আক মাড়াই কল প্রভৃতিকে কর্মক্ষম করিয়া রাখিতে হয়। গ্রামের কামারই এইসব কাজ করে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমেও বনপাশ, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে কাঁসা পিতলের বাসন তৈয়ার হইত। বনপাশের বাসনের বিশেষ সমাদর ছিল ইহার সূক্ষ্ম কাজ ও আকর্ষণীয় পালিশের জন্য। ইং ১৯০৮-৯ সালে এই জিলায় উৎপন্ন বাসনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৪০০ মণ আর তখনকার মূল্যে ইহার দাম ছিল প্রায় ২৮০০০০ টাকা। শিল্প তখন অবনতির মুখে। এই অবনতি অব্যাহত থাকে, দক্ষ কারিগর

শ্রেণীও লোপ পায়। বর্তমানে এই শিল্পজাত দ্রবের পরিমাণ নগণ্য এবং ইহাতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র। কিন্তু অবনতি সত্ত্বেও দাঁইহাট ও বনপাশের বাসনের সমাদর এখনও আছে।

চাউল শিল্প

ঢেঁকি মাধ্যমে চাউল উৎপাদন বহুযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বহু বিধবা বা আশ্রয়হীনা গ্রাম্য স্ত্রীলোকের অন্ন জোগাইত এই ঢেঁকি। পূর্বে যখন চাউল কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা চাউল কলের প্রসার হয় নাই, তখন ঢেঁকি ছিল প্রতি গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক সামগ্রী, ঢেঁকিশাল ছিল গৃহের অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে চাউল কলের প্রাদুর্ভাবের সহিত ঢেঁকি লুপ্তপ্রায়।

চাউল কলের এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের পরিচালক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলধনের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চাউল কলের প্রসার ও ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে জিলায় কোনই চাউল কল ছিল না। কিন্তু ইং ১৯৩০ সালে দেখা যায় যে ইহাদের সংখ্যা হইয়াছে ৬৩।

তারপব সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে জিলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল চাউল কল আছে, তাহাদেব সংখ্যা ৮৭। বিভিন্ন মহকুমায় চাউল কলের সংখ্যা এইরূপ ঃ

বর্ধমান সদর	৫৮
কালনা	১৭
কাটোয়া	৮
আসানসোল	৪

ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৭টি বর্তমানে চাউল উৎপাদন করে না। চালু কলগুলি বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ মণ চাউল উৎপাদন করিতে সক্ষম। ইহাদের মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৭০০০, আর বিভিন্ন কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত। সাধাবণতঃ নিম্ন শ্রেণীর নরনারীই শ্রমিকের কাজ করে। শ্রমিকের দৈনিক বেতনের হার নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ সুদক্ষ	১.৭৫ টাকা
ঐ দক্ষ নহে	১.৩৭ „
স্ত্রীলোক	১.২৫ „

বেতন ভিন্ন শ্রমিকগণ কল হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চাউল পায়।

(১) এই হার ১৯৬০ সালের। বর্তমানে ইহার বৃদ্ধি হইয়াছে।

জিলার চাউল কলের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

ইহা ভিন্ন বহু সংখ্যক চাউল-ভাঙ্গা কল আছে। ইহাদের জন্য বিশেষ মূলধন প্রয়োজন হয় না এবং এই কারণে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু যুবক এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কৃষক ধান সিদ্ধ করিয়া ভাঙ্গাইবার জন্য এই সকল কলের আশ্রয় লয়। পল্লী অঞ্চলে ইহাদের বহুল প্রসার ঢেঁকির পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প

অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের ভিতর নিম্নলিখিতগুলির প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের সবগুলিই কুটীরশিল্প পর্যায়ের :

মাদুর তৈয়ারী ;

বাঁশের মোড়া ও ঝুড়ি তৈয়ারী।

সাধারণতঃ ভূমিহীন নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ এই দুই শিল্পে নিযুক্ত থাকে।

দারুশিল্প বা ছুতারের কাজ। জিলায় ছুতারের মোট সংখ্যা প্রায় ২৫০০ হাজার। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইহারাই প্রস্তুত করে।

সতরঞ্চ তৈয়ারী। ইহার প্রসার খুবই কম।

ঘানি হইতে তৈল বাহির করা বা কলুর কাজ। কলের তেলের সহিত প্রতিযোগিতায় এই শিল্প মৃতপ্রায়।

আকের গুড় বা তাল গুড় তৈয়ারী।

বিড়ি প্রস্তুত। বিড়ির কাজ একটি উদীয়মান কুটীর-শিল্প। বর্তমানে প্রায় ৪০০০ হাজার লোক বিড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্ন সংস্থান করে।

মুড়ি ও চিড়া প্রস্তুত। বহু অনাথা স্ত্রীলোক ইহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

মৃৎশিল্প : এই শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৮০০ শত। বর্ধমানের কুম্ভকার নানারূপ মাটির হাঁড়ি, বাসন প্রভৃতি তৈয়ারীতে যেমন নিপুণ, নানা প্রকার মূর্তি প্রস্তুতেও সেইরূপ কৌশলের পরিচয় দেয়।

বর্ধমানের মিষ্টান্ন শিল্প

বর্ধমানে যে সকল মুখরোচক মিষ্টি প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ না দিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। মিষ্টির জন্য বর্ধমান পুরাতন কাল হইতেই বিখ্যাত। কতকগুলির আবার আদিভূমিই হইতেছে এই অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে আছে,

বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা ;
মানকরের কদমা ;
জামালপুরের মাখা সন্দেশ ;
শক্তিগড়ের ল্যাংচা।

সীতাভোগ ও মিহিদানার পরিচয় অনাবশ্যক। বহুযুগ ধরিয়া ইহারা দেশে ও বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মানকরের কদমা তাহার পূর্বের বিশাল আকৃতি হারাইয়াছে ; বিশেষ নির্দেশ না দিলে পূর্বাকৃতির কদমা পাওয়া যায় না। মাখা সন্দেশ এক সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশেষ আদরণীয় ছিল ; বর্তমানে ইহার চাহিদা কম, উৎকর্ষও হ্রাস পাইয়াছে। ল্যাংচার সমাদর কিন্তু ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃহৎ শিল্পসংস্থা

বৃহৎ শিল্পগুলির সকলেরই অবস্থান আসানসোল মহকুমায়। নিম্নে তাহাদেব পরিচয় দেওয়া হইল।

কয়লা

বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কয়লার স্থান প্রথম। আসানসোল মহকুমায় প্রায় তিনশত কার্যোপযোগী কয়লার খনি আছে, কয়লার খনিতে নিযুক্ত লোক সংখ্যা প্রায় দেড লক্ষ।

ক য়লার কথা

পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে কয়লা আবিষ্কৃতির সহিত হার্টলি (Hartley) নামক একজন ইংরেজের নাম জড়িত আছে। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছোট নাগপুরের কলেক্টর। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে সীতারামপুরের নিকট কয়লা উত্তোলনেব অনুমতি প্রাপ্ত হন ও গার্নার নামক অন্য একজন ইংরেজের সহায়তায় সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে কয়লা শিল্পে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ কেহই এই বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই। ইং ১৮১৪ সালে তদানীন্তন বডলাট লর্ড হেষ্টিংস্ কয়লার অনুসন্ধান ও তদ্‌বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য রুপার্ট জোন্‌স্ নামক একজন ইংরেজকে এই অঞ্চলে প্রেরণ করেন। বিশেষ অনুসন্ধান কবিয়া তিনি এই অঞ্চলে কয়লার অস্তিত্ব ও কয়লা শিল্পের সম্ভাব্য সাফল্য সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্ট গৃহীত হয় এবং সরকারী সাহায্যে তিনি রাণীগঞ্জের নিকট এগাবা গ্রামে কয়লা উত্তোলন আরম্ভ করেন। ইং ১৮৩৫ সালে এই কয়লা খনি আলেকজাণ্ডার কোম্পানির হাতে যায়। ইতিমধ্যে ইং ১৮২৪ সালে জেসপ্ কোম্পানি দামুলিয়া ও নারায়ণপুবে খাদ খনন করিয়া কয়লা উত্তোলন আরম্ভ করে এবং ইং ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত খনির কাজ চালাইতে থাকে। এই বৎসরেই খনি গিলমোর হামফ্রে কোম্পানিকে হস্তান্তর কবা হয়। ইং ১৮৪৩ সালে এই কোম্পানি 'কার ঠাকুর' নামক অন্য এক কোম্পানির সহিত যুক্ত হয় এবং এই সংযুক্ত কোম্পানির নাম-করণ হয় 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'। বর্তমানে বেঙ্গল কোল কোম্পানি সারা ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কয়লা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা শিল্পের অন্য উদ্যোক্তা ছিল আপকার কোম্পানি। সীতারামপুরের নিকট দিশেরগড় স্তরে কাজ করিবার জন্য এই কোম্পানিই অগ্রণী হয়।

তখনকার দিনে কয়লা রপ্তানি সহজসাধ্য ছিল না। দামোদর তীরে বিভিন্নস্থানে কয়লার ডিপো বা গুদাম ছিল। বিভিন্ন খনির উৎপন্ন কয়লা গো-যানে বাহিত হইয়া এইসব ডিপোতে মজুত করা হইত এবং দামোদরের জল বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা নৌকা যোগে কলিকাতায় পাঠান হইত। বহু সহস্র দাঁড়ি মাঝি এই পরিবহণ কার্যে নিযুক্ত থাকিত। রপ্তানির এই অসুবিধা ছিল কয়লা শিল্পের উন্নতির অন্তরায়। ইং ১৮৫৫ সালে পূর্ব ভারতীয় রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে রপ্তানি ব্যবস্থার উন্নতি হয়। নূতন নূতন কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আবির্ভাবের সহিত কয়লার চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং কয়লা শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের পথ সুগম হয়। ইং ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত এই শিল্প প্রধানতঃ রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তারপর নূতন নূতন স্তর আবিষ্কার ও রেলপথ সম্প্রসারের সহিত অন্যান্য অঞ্চলেও ইহার বিস্তার হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে রাণীগঞ্জের এগারা গ্রামে প্রথম কোলিয়ারী স্থাপিত হয়। স্থানীয় বাউরি সম্প্রদায় এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। এই সম্প্রদায়ের পুরুষগণ সর্বপ্রথম কয়লার খাদে নামে; পরে ইহাদের স্ত্রীলোকও এই কার্যে যোগদান করে। খাদের কার্যে বাউরিগণ বিশেষ নৈপুণ্য দেখায় এবং এই সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে কয়লা শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। কয়লা খনি সম্প্রসারের সহিত আরও কয়েকটি নিম্ন-শ্রেণী ও আদিবাসী—কোরা, ভাঙ্গর, ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা—এই দিকে আকৃষ্ট হয়। বর্তমানে কয়লা খনিতে বহু সাঁওতাল শ্রমিক কাজ করে কিন্তু ইং ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের বহু পরে তাহারা এই শ্রমে যোগদান করে।

কয়লা খনির শ্রমিক

কয়লা খনির শ্রমিক তিন পর্যায়ে পড়ে। প্রথম শ্রেণী তাহারা, যাহারা খনি এলাকায়ই বসবাস করে। ইহারা কয়লা খনির চিরন্তন অধিবাসী হইয়া গিয়াছে। যে সকল শ্রমিক চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম হইতে খনি অঞ্চলে কাজ করিতে আসে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী। তাহারা

গ্রামেই বসবাস করে, কাজ শেষ করিয়া দৈনিক গ্রামেই ফিরিয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ব্যতীতও বহু শ্রমিক জিলার বাহির হইতে সাময়িকভাবে খনি অঞ্চলে কাজ করিতে আসে, কিছুদিন পর আবার দেশে ফিরিয়া যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুমকা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সাঁওতাল ও অন্যান্য শ্রেণী প্রতিবৎসর শীতকালে ধান কাটার পর খনিতে কাজ করিতে আসে, আবার চাষের সময় স্বদেশে ফিরিয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮০, ০০০ হাজার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৩৭, ০০০ হাজার ও ২৮,০০০ হাজার।

কয়লা খনির শ্রমিকের মজুরীর হার সাধারণতঃ দৈনিক ২·৬২ টাকা। কিন্তু কোনও শ্রমিককে মাসে গড়ে ৩ সপ্তাহের বেশী কাজ করিতে দেখা যায় না। শ্রমিক-প্রতি গড় মাসিক আয় খুব কম ক্ষেত্রেই ৫০ টাকায় বেশী হয়; কিন্তু শ্রমিক তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ কাজ করে বলিয়া পরিবার-প্রতি মাসিক আয় হয় অপেক্ষাকৃত বেশী। বহু শ্রমিক আবার চুক্তি হিসাবে কাজ করে, তাহাদের মাসিক আয় গড়ে প্রায় ৯০ টাকা।

কয়লা খনির স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

দিশেরগড়ের অনতিদূরে সাঁকতোরিয়ায় আধুনিক পর্যায়ের একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল ছাড়াও, কয়লাখনি-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (Coal Mines Welfare Organisation) প্রচেষ্টায় কল্লা নামক স্থানে একটি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সেয়ারসোল ও চোরায় আঞ্চলিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুষ্ঠ ব্যাধি প্রশমনের জন্য যে সকল চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত আছে তাহাদের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোক ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আসানসোল মহকুমায় আছে, তাহাদের মধ্যে এগারটির অবস্থান খনি অঞ্চলে। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খনি মালিকগণের পরিচালনায় পাঁচটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। খনি অঞ্চলের নিকটস্থ গ্রাম্য পাঠশালাও শ্রমিক-সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু শ্রমিকের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা সন্তানের শিক্ষাপথে এক বিরাট অন্তরায়।

দুর্গাপুর পরিকল্পনা সমূহ

দুর্গাপুর পরিকল্পনাগুলি হইতেছে দেশের শিল্পোন্নতির প্রতীক। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অরণ্য পরিবৃত এক অখ্যাত অঞ্চল একটি বিশাল

শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। শিল্প নগরী ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। ভারত সরকার প্রযোজিত ইস্পাতের কারখানা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোকচুল্লি এই দুইটিই যে বৃহৎ পরিকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন তাহার উৎপাদনের জন্য বহু শিল্পসংস্থা সরকারী বা বেসরকারী অর্থে স্থাপিত হইয়া বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলির সহায়তা করিতেছে। দামোদর নদের উপর বিরাট ব্যারাজ নির্মাণ দুর্গাপুর অঞ্চলেব উন্নতির প্রথম সোপান। ব্যারাজটি স্থপতি শিল্পের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। আধুনিক পদ্ধতির প্রশস্ত রাজপথ ইহার উপর প্রসারিত হইয়া সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। ব্যারাজের দুই প্রান্তে সেচ খালের প্রবাহ; উপরে বৈদ্যুতিক তারের শ্রেণী যাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো শত শত মাইল ব্যাপিয়া গ্রাম, নগর ও কয়লা খনি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। সুদীর্ঘ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেলপথের সান্নিধ্য উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবহণে সহায়তা করে। দামোদরেব সহিত ভাগীরথীর সংযোজক খাল চালু হইলে এই পরিবহণের আরও উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, পর্যাপ্ত জল সরবরাহের সুবিধা, অনতিদূরবর্তী কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ শিল্পাঞ্চল, ন্যায্য পারিশ্রমিকে শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা প্রভৃতি কারণে ও বিস্তীর্ণ কয়লা অঞ্চল নিকটে থাকায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কেন্দ্র হিসাবে এই অঞ্চল নির্বাচন অতি উপযুক্তই হইয়াছে মনে হয়।

দুর্গাপুর শিল্পসংস্থা—কোক চুল্লি ও অন্যান্য পরিকল্পনা

ইং ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় দুর্গাপুব শিল্পসংস্থা (Durgapur Industries Board) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পাদি কার্যের ব্যবহারোপযোগী কয়লা, আলকাতরা নির্যাস, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে প্রচলন ও পরোক্ষে কয়লা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক শিল্পে দেশের সাধারণ শিক্ষিত বা কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবশক্তিকে কার্যকরী ভাবে নিয়োগ। এই শিল্পসংস্থার পরিকল্পনাভুক্ত হইতেছে:

১৩০০ শত টন পরিমিত শুষ্ক কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ৯০০ শত

হইতে ১০০০ হাজার টন পরিমাণ ব্যবহারোপযোগী কয়লা উৎপাদনক্ষম কোক চুল্লি (Coke oven) ;

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমোনিয়া, আলকাতরা, সালফিউরিক এসিড, অপরিষ্কৃত বেঞ্জল এবং ইহা হইতে আবার বেনজাইন প্রভৃতি উৎপাদন ;

কয়লা হইতে প্রত্যহ ৫০ টন হইতে ১০০ শত টন আলকাতরা উৎপাদনক্ষম কারখানা :

একটি ৬০,০০০ হাজার K.W. শক্তিবিশিষ্ট থারমল কারখানা ; ইহা হইতে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হইবে তাহা স্থানীয় শিল্পসমূহের প্রয়োজন মিটাইবার পর পল্লী ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যে প্রয়োগ করা হইবে ও রেলপথ বৈদ্যুতিক করণে সাহায্য করিবে।

কোক চুল্লির প্রথম শক্তি চালু হয় ১৯৫৯ সালে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা-ভিত্তির উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলির উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। কোক চুল্লি হইতে যে পোড়া কয়লা বাহির হয় তাহা যাবতীয় ধাতব শিল্পের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। টাটা লৌহ কারখানা, রেলওয়ে ও যে সকল অন্যান্য শিল্প সংস্থার ঢালাই কাজের ও রাসায়নিক শিল্পের কারখানা আছে, এই কয়লা তাহাদের সরবরাহ করা হয়। পোড়া কয়লা ভিন্নও কোক চুল্লি হইতে কোল টার, বেঞ্জল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। কোক চুল্লির কার্যকরী ক্ষমতার আরও উন্নতি সাধন করার প্রয়াস চলিতেছে। পোড়া কয়লা প্রস্তুতের সময় যন্ত্রের মধ্যে বহু পরিমাণে গ্যাস জন্মে ; ইহার কিছু অংশ যন্ত্রের মধ্যেই ক্ষয় হয়, কিন্তু অধিকাংশই পড়িয়া থাকে। যে গ্যাস পড়িয়া থাকে তাহা গার্হস্থ্য ও শিল্পকার্যে ব্যবহারের জন্য সুদীর্ঘ পাইপের সাহায্যে কলিকাতা পাঠাইবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

১৯৬০ সালে দুইটি থারমল শক্তি কেন্দ্র খোলা হয়। ইহা হইতে উদ্ভূত বিদ্যুৎ-শক্তি ডি. ভি. সি. হইতে প্রাপ্ত শক্তির সহিত একত্রীকরণ করা আছে। ভবিষ্যতে ব্যাণ্ডেল থারমল কেন্দ্রের সহিত ইহার যোগ হইবে এইরূপ পরিকল্পনা আছে।

আলকাতরা পরিশোধনের কারখানা খোলা হয় ১৯৬২ সালে। ইহা হইতে কয়লাজাত আলকাতরার উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাহির করা হয় ও পরিস্রুত আলকাতরা দুর্গাপুরের নিকটে স্থাপিত অন্য একটি আধুনিক

কারখানায় সরবরাহ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর কয়লার ব্যবহারে অপব্যয় নিবারণের জন্য বিশালাকার কয়লা ধৌতাগার (Coal Washery) এবং কোকচুল্লি হইতে গৌণজাত দ্রব্যাদির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য একটি রাসায়নিক কারখানা নির্মিত হইতেছে।

দুর্গাপুর শিল্পসংস্থার পরিকল্পনার কাজ যখন শেষ হইবে, ইহা হইতে উৎপন্ন হইবে কষ্টিক সোডা (Caustic Soda), ক্লোরিন (Chlorine), ফিনাইল জাতীয় দ্রব্য ও আরও অনেক কিছু। ভারতের রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ইহা হইবে প্রথম পদক্ষেপ।

ভারত সরকার প্রযোজিত পরিকল্পনা

ভারত সরকার প্রযোজিত বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে আছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, কয়লা খনি অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি নির্মাণ পরিকল্পনা, খাদ মিশান ইস্পাত তৈয়ারী পরিকল্পনা ও চশমা প্রস্তুত পরিকল্পনা। এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কারখানার নির্মাণ কার্য হয় শেষ হইয়াছে, না হয় চলিতেছে। একটি সার তৈয়ারীর কারখানা ও একটি সিমেণ্টের কারখানা চালু করারও সঙ্কল্প আছে। ডি. ভি. সি.র একটি থারমল শক্তি কেন্দ্র এখানে আছে। ভারত সরকার এখানে একটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রথম কটাহ (furnace) উন্মুক্ত হয় ১৯৫৯ সালের ২রা ডিসেম্বর। তাহার পর হইতে বিভিন্ন উৎপাদনের ক্রমশঃ উন্নতি অব্যাহত থাকে। এই কারখানা হইতে উৎপন্ন পিগ আয়রণ, বিলেট প্রভৃতি লৌহজাত দ্রব্য, সুসম্পূর্ণ ইস্পাত খণ্ড প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়। ইস্পাত কারখানার সম্প্রসার হইতেছে ও ইহার সহিত ইস্পাত নগরীও প্রসার লাভ করিতেছে। এই নগরীতে ইস্পাত কারখানায় নিযুক্ত নানা শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ১৫০০০ বাড়ী ও খাদমিশান ইস্পাত তৈয়ারী পরিকল্পনার কর্মীদের জন্য ৩০৮৩ বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। নগরীর জন্য গৃহীত হইয়াছে প্রায় ১৬ বর্গমাইল পরিমিত জমি। নগরী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত; আবার প্রতি অঞ্চলে আছে বিভিন্ন অংশ। প্রতি অংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাজার ও অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে ইস্পাত নগরীতে আছে দুইটি বহু-মুখী উচ্চতর বিদ্যালয় ও সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কর্মী ও তাহাদের

পরিবারবর্গের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। দুইটি হাসপাতাল, দুইটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও এখানে আছে অবসর বিনোদন ও নানাবিধ কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনের সুবিধা সহ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, সিনেমা গৃহ, টাউন হল, ক্রীড়াক্ষেত্র, ষ্টেডিয়াম প্রভৃতি।

অর্থনীতির একদিক দিয়া দুর্গাপুর অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এখানে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত শিল্পসংস্থা-সমূহ দেশের অর্থনৈতিক ধারার পুনরুজ্জীবনের জন্য পাশাপাশি বর্তমান। উভয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে; একে অপরের প্রয়োজন মিটাইতেছে বা তাহাকে আরও শক্তিশালী করিতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জমি বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার হইতে বহু জমি গৃহীত হইয়াছে; জমি বণ্টনের পূর্বেই রাস্তা, নর্দমা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯৬১ সালে একটি আইন প্রণয়ন করিয়া "দুর্গাপুর উন্নয়ন আধিকারিক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর, কাঁকসা ও অণ্ডাল থানার প্রায় ৩০০ শত বর্গ মাইল ভূমির নিয়ন্ত্রণ ভার ইহার উপর। দুর্গাপুরের চতুষ্পার্শ্বে শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে ভূমি বণ্টনের দায়িত্বও ইহার। উপরোক্ত এলাকায় কোন নির্মাণ কার্য এই আধিকারিকের অনুমোদনসাপেক্ষ। ইহারই তত্ত্বাবধানে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উত্তরে প্রায় ১৫০০ একর জমি লইয়া নূতন উপনগরী নির্মিত হইতেছে। দুর্গাপুর পরিকল্পনায় নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থান লাভ করিয়া দেশের বেকার সমস্যার কিছু পরিমাণে সমাধান হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিতের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ হাজার।

ইস্পাত, কোকচুল্লি, নানাবিধ উৎপাদন কারখানা প্রভৃতি মৌলিক শিল্প সহ দুর্গাপুরে একটি প্রধান শিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ইহার সহিত শিল্প সংস্থার কর্মীদের বসবাসের জন্য উপনগরী স্থাপন, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের উপর অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। এই অঞ্চলের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার, লোক বণ্টনের নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিবর্তনের গুরুত্ব ও প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য ও বৃহত্তর দুর্গাপুর গঠনের

উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে যাহাতে এই অঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে।

লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান—বার্নপুর, কুলটি

আসানসোল অঞ্চলের কুলটি, হীরাপুর ও বার্নপুরে উল্লেখযোগ্য ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত। ইং ১৯৫৩ সালের পূর্বে ইহা ছিল দুইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানভুক্ত, কুলটি-হীরাপুরের ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান এবং বার্নপুরের বঙ্গীয় ইস্পাত প্রতিষ্ঠান। ইং ১৯৫৩ সালে দুইটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়। ইহার ফলে ইস্পাত ও লৌহের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিহারের গুয়া, জামদা প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহের মূল উপাদান এইখানে আমদানি হইয়া লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতির কার্যে প্রয়োগ হয়। বার্নপুরের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ২২,০০০ হাজার, তাহার মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ হাজার। কুলটির জনসংখ্যা প্রায় ৩১,০০০ হাজার, শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০ হাজার। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে উভয় স্থানেই চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, তাহাদের মধ্যে বার্নপুরের ২৫০ শয্যাযুক্ত আধুনিক শ্রেণীর হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ব্যতীতও কুলটি ও বার্নপুরে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

রাণীগঞ্জ পেপার মিল বা কাগজের কল

ভারতে কাগজ প্রস্তুত করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে রাণীগঞ্জের কাগজ কল (Bengal Paper Mill, Ranigunge) এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১২০০ শত টন কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য এবং শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২০০০ হাজার।

এলুমিনিয়াম প্রতিষ্ঠান—জেমেরি

আসানসোলের প্রায় তিন মাইল পূর্বে জেমেরি নামক স্থানে অবস্থিত সুবৃহৎ ভারতীয় এলুমিনিয়াম প্রতিষ্ঠান (Alluminium Corporation of India)। এখানে এলুমিনিয়ামের নানা প্রকার দ্রব্য, বাসন ও পাত প্রস্তুত হয়। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে প্রায় ১,১০,০০০ পাউণ্ড ওজনের দ্রব্য ও ৫০০ টন ওজনের পাত। শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২০০০ হাজার।

চিত্তরঞ্জন

রেলগাড়ীর বয়লার ও ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য যতগুলি প্রতিষ্ঠান ভারতে আছে তাহাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিব কারখানা সর্ববৃহৎ। ইহার অবস্থান রূপনারায়ণপুরের অদূরে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযোগ

স্থলে। আয়তন প্রায় সাত বর্গ মাইল। এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প সংস্থা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে ও ইতিমধ্যেই ইহার জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩০,০০০ হাজার। তাহার মধ্যে শ্রমিক সংখ্যাই প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

সেন র‍্যালে শিল্প প্রতিষ্ঠান, কন্যাপুর

আসানসোলের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে কন্যাপুরে সেনর‍্যালে শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। বাই সাইকেল ও ইহার অংশ প্রস্তুত করিয়া এ বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী করাই এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষত্ব। ইহার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হাজার।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতিত আরও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আসানসোল অঞ্চলে অবস্থিত আছে। ইহারাও বৃহৎ শিল্প সংস্থার পর্যায়ভুক্ত এবং ইহাদের পরিচয় এইরূপ :

হিন্দুস্থান পিকলিংটন কাচ প্রতিষ্ঠান
র‍্যাকেট কোলম্যান কোম্পানি
ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কল
হিন্দুস্থান কেবেল্‌স্‌
বিহার পটারি
রাণীগঞ্জ ও দুর্গাপুরের বার্ন কোম্পানি
বাঁশা বঙ্গের কারখানা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পাঞ্চলে সমাজ-জীবন

আসানসোল মহকুমায়ই শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ প্রসার হইয়াছে; ইহার প্রতিক্রিয়া এই অঞ্চলের সমাজ-জীবনেই সমধিক প্রতিফলিত।

শিল্প সংস্থার প্রসার

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ পল্লী-শ্রী-মণ্ডিত ও অরণ্যবহুল। কিঞ্চিদূর্ধ্ব একশত কয়লাব খনি, কেন্দুয়ায় আয়রণ ষ্টীলের কারখানা, রাণীগঞ্জে বার্ন কোম্পানির পটারি ও বেঙ্গল পেপার মিল, অণ্ডাল ও দুর্গাপুরে বার্ন কোম্পানির চুন ও ইট-টালির কারখানা ব্যতীত অন্য কোন শিল্পই এখানে ছিল না। তখন মহকুমার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ, আর ইহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোক শিল্প-সংস্থায় বা কলকাবখানায় আকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চলে শিল্পসংস্থার প্রসার অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইং ১৯৫১ সালে ইহার লোকসংখ্যা পবিগণিত হয় ৭৬৯,২৬৫, ইহার মধ্যে শিল্প বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়েব উপব নির্ভবশীল লোকেব সংখ্যা ছিল ৩৮১০০০ হাজার। তারপব শিল্পেব আরও প্রসার হইয়াছে, দুর্গাপুর অঞ্চলে ইস্পাত প্রতিষ্ঠান ও কোকচুল্লি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চিত্তরঞ্জন ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে নূতন নূতন শিল্প-সংস্থার আবিভাব হইয়াছে। ইং ১৯৬১ সালে আসানসোল মহকুমার লোক-সংখ্যা পবিগণিত হয় প্রায় এগার লক্ষ, ইহাব প্রায় অর্ধেকই নানাবিধ শিল্প বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের উপব নির্ভব করিয়া অন্ন সংস্থান করে।

শিল্পাঞ্চলের সমাজন্যাস

শিল্প-সংস্থায় যে শ্রেণীব লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহারা নানা জাতি, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিব অন্তর্ভূক্ত। ইহাদেব মধ্যে বহিরাগত অবাঙালী সম্প্রদায়ের সংখ্যা-প্রাবল্য দেখা যায়। শিল্পাঞ্চলের জনগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

শ্রমিক শ্রেণী

শিল্পপতি গোষ্ঠী

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

শ্রমিক শ্রেণী

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাঙালী, অবাঙালী দুই-ই আছে। আসানসোলের পশ্চিমাঞ্চলে সাঁওতাল, বাউরি প্রভৃতি বহু নিম্ন জাতি পুরুষ পরম্পরায় বসবাস করিয়া আসিতেছে; তাহাদের এক বিশাল অংশ পিতা পিতামহের কৃষি জমি হারাইয়া বর্তমানে ভূমিহীন শ্রমিকের পর্যায়ে নামিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তাহাদের অধিকাংশের বাস। ইহা ব্যতীত এরূপ অনেক কৃষক পরিবার আছে যাহাদের আবাদি জমির পরিমাণ নিতান্ত কম। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহারা সাময়িক শ্রমিক হিসাবে শিল্পাঞ্চলে কায়িক পরিশ্রম করিয়া অভাব পরিপূরণ করে। ভূমির পরিমাণ সামান্য হইলেও ইহাব সহিত এই শ্রেণীর সংস্রব ভূমিহীন শ্রমিকের ন্যায় একেবারে ছিন্ন হয় নাই। এই দুই শ্রেণীর স্থানীয় শ্রমিক ব্যতীত শিল্পাঞ্চলে আছে বহু বহিরাগত শ্রমজীবী; ভারতের বহু স্থান হইতে তাহারা শিল্পাঞ্চলে অন্ন সংস্থানের জন্য আসিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বসবাস; তাহার পরিবেশও অপ্রীতিকর।

ভূমিহীন শ্রমিকের সমাজ-জীবন কৃত্রিম। ইহার সহিত তাহাদের মূল কৃষ্টি, ভাবধারা ও আচার ব্যবহারের সম্বন্ধ ক্ষীণ। সাংসারিক বা সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা এখানে শিথিল। ইহাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের যে দৈন্য পরিলক্ষিত হয় তাহার ভিতর জুয়া খেলা ও মাদক সেবনের আতিশয্য অন্যতম। এই দুইটিই তাহাদের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইতে আসে আর্থিক দৈন্য। এই দুরবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া শ্রমিকের পক্ষে দুষ্কর। সপ্তাহের শেষে শ্রমিক যে পারিশ্রমিক অর্জন করে তাহা নিঃশেষ হইতে সময় লাগে না, তখন কাবুলিওয়ালা বা অন্যান্য মহাজনের নিকট সে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। ঋণের সুদ থাকে উচ্চ হারে। পরের সপ্তাহে মহাজনের ঋণ বা সুদ বাবদ প্রাপ্য মিটাইয়া সে যখন আবার নেশায় বা জুয়ায় অর্থ নষ্ট করে, তখন দেখা যায় যে সে নিঃস্ব। তখন সংসার চালাইবার জন্য আবার ঋণ করিতে বাধ্য হয়। এই ঋণভার পরিশোধ হয় না এবং মহাজন তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করে তাহা সপ্তাহের শেষ দিনে কোনও কোলিয়ারী এলাকা বা কুলটি-বার্নপুরের শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন করিলেই

লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকের পারিবারিক জীবন অতি নিম্ন স্তরের। পুত্র-কন্যার শিক্ষার কথা সে ভাবিতে পারে না; তাহার স্ত্রী অভাব মোচনের জন্য শ্রমিকের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়, পুত্রকন্যাও অল্প বয়সেই শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ, পুত্র-কন্যার অবহেলা প্রভৃতি শ্রমিক জীবনে অতি সাধারণ ঘটনা। কয়লা খনিঅঞ্চলের শ্রমিকদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু ইহা দ্বারা শ্রমিক চরিত্রে বা তাহার জীবনে কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ সময় শ্রমিক জীবনে আনন্দ উপভোগ করার প্রেরণা আসে। রামনবমী, হোলি, দশেরা, ইদ বা দেওয়ালি, শ্রমিকের প্রাণে চাঞ্চল্য জাগায়। ভাদু পরব বাউরি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী অতি সমারোহে পালন করে। গতানুগতিক বিরক্তি-কর জীবনের গ্লানি লাঘব করে সায়াহ্নকালীন রামায়ণের গাওনা বা মিলাদ সরিফ। সপ্তাহের শেষে আনন্দের অনুসন্ধানে সিনেমা গৃহে প্রচুর ভীড় হয় এবং নবীন শ্রমিকের পক্ষে সিনেমার ছবি প্রবল আকর্ষণ। আবার পথিপার্শ্বের কোনও শ্রমিক নেতার বক্তৃতাও শ্রমিকের অবসর বিনোদনের সাহায্য করে।

শিল্পপতি বা মালিক শ্রেণী

সরকার পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অথবা মার্টিন বার্নস-এর ন্যায় শিল্পসংস্থা বাদ দিলে, শিল্পপতি অথবা মালিক গোষ্ঠী নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। ইহাদের মধ্যে আছে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, বিহার ও উত্তর প্রদেশবাসী, গুজরাটি ও বাঙালী। বাঙালী শিল্পপতিগণের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা বহুপূর্বেই ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া-ছেন। আবার আছেন ভূতপূর্ব অভিজাত বা জমিদার শ্রেণী যাঁহারা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে শিল্পে ও ব্যবসায়ে নামিয়াছেন। এই শিল্পপতি শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা স্থানীয় অধিবাসী, তাঁহারা স্বীয় আচার ব্যবহার, কৃষ্টি বা সামাজিক অনুশাসন এখনও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু বহিরাগত বাঙালী বা অন্য সম্প্রদায় স্থানীয় কৃষ্টি বা সমাজ-জীবন অথবা সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত কোনই সংস্রব রাখেন না; তাঁহাদের সমাজ-জীবন কৃত্রিম, জীবন যাত্রার মান ও ধারা উচ্চ পর্যায়ের। জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন।

শিল্পপতিগণ ছাড়া আছেন বিরাট ব্যবসায়িগণ। তাঁহাদের মধ্যে অবাঙালী প্রাধান্য দেখা যায়। বহিরাগত অবাঙালী শিল্প মালিকগণের ন্যায় এই শ্রেণীও এদেশের কৃষ্টি, সমাজ-জীবন বা গণ-স্বার্থের সহিত কোনও যোগাযোগ রক্ষা করেন না; তাঁহাদের সমাজ ও কৃষ্টি এক সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় প্রবাহিত। এ দেশের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ মাত্র একটি স্বার্থের, তাহা হইল অর্থ উপার্জন।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, ভূতপূর্ব নিম্ন-স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠন করে। আসানসোল অঞ্চলে জমির উর্বরতা শক্তি কম; অনেক সময় বৃষ্টি হয় অনিয়মিত বা অপর্যাপ্ত। সেচনের সুবিধা নাই। জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ নগণ্য। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ ইহার পশ্চিম ভাগে, কৃষি বিশেষ লাভজনক বলিয়া গণ্য হয় না বা ইহা কৃষিজীবীর অর্থনৈতিক সহায়ক হয় না। সুতরাং শিক্ষিত ভদ্র পরিবার বা অন্যান্য মধ্যবিত্ত সন্তানের পক্ষে কর্মসংস্থান একরূপ অবশ্য করণীয়। কিন্তু কর্মসংস্থান সহজসাধ্য নহে বলিয়া বেকার সমস্যা প্রবল। সম্প্রতি দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্প প্রসারের জন্য যাঁহারা ভূমিচ্যুত হইয়াছেন, তাহাদের অবস্থাও এইরূপ। এই সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র আসানসোল মহকুমাই যে শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন কৃষি জীবন ধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত গণ্য হইবে। ভূমির সহিত সাধারণের সম্বন্ধ হইলে ক্ষীণতর। সামাজিক জীবনেও কৃষ্টির অভিব্যক্তির পক্ষে ইহা কল্যাণকর হইবে কিনা তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। যেখানে জন-সাধারণের জীবন যাত্রার স্তর নিম্ন ও যেখানে নাগরিক জীবনের আদর্শ উদ্বুদ্ধ নহে, সেখানে মাত্র শিল্পপতি ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব সামাজিক বিপর্যয়, শিথিল পরিবারিক বন্ধন, অমিতব্যয়িতা ও বেকার সমস্যার প্রসার সৃষ্টি করে।

এই সম্বন্ধে বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়,

তাহার সহিত উপরোক্ত বিবরণীর সাদৃশ্য আছে। সেখানে এযাবৎ কাল সাধারণ লোক ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল, জমি ও গ্রামের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়ায় কৃষি কার্যের গুরুত্ব কমিয়া যায়। গ্রামীন ও কৃষি-প্রধান কৃষ্টির স্থান লাভ করিল নগর কেন্দ্রিক শিল্প-নির্ভর কৃষ্টি। পল্লী অঞ্চল শ্রীহীন হইল। কবি খেদ করিলেন।

"Sweet Auburn ! Loveliest village of the plain"

(Goldsmith—Deserted Village)

গ্রামাঞ্চল হইতে লোক শহরের শিল্পাঞ্চলে আসিয়া কর্ম প্রত্যাশায় ঘুরিতে লাগিল কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমের বেশী প্রয়োজন না হওয়ায় বেকার সমস্যা দেখা দিল। শিল্প বিস্তারের ফলে মালিক শ্রেণী হইলেন লাভবান এবং ইহার ফলে মালিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইল। মালিকগণ হইলেন ঐশ্বর্যশালী আর শ্রমিকগণ ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া জীবনের আনন্দ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র হারাইল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করিল। শিল্পপতিগণ যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ গ্রহণ করিল, শ্রমিক শ্রেণীও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইহাতে প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য অগ্রসর হইল। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইংলণ্ডের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব ও আন্দোলনে তাহাদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ-ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে মালিক ও শ্রমিককে ভিত্তি করিয়া যে মতবাদ সৃষ্ট হয় তাহা হইল সমাজতন্ত্রবাদ ; ইহার উদ্দেশ্য হইল সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণী-বৈষম্য লোপ করিয়া সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সাম্য প্রবর্তন।

পরিশিষ্ট—১

কবি, পাঁচালি ও যাত্রাগানে বর্ধমানের অবদান

বাংলা সংস্কৃতির এক অভিনব সম্পদ হইল কবিগান, পাঁচালি ও যাত্রাগান। সংস্কৃতির এই ধারাটির বিকাশে বর্ধমানের যে এক বিশেষ অবদান আছে তাহা অনস্বীকার্য। জিলায় বহু কবিগায়ক, পাঁচালিকার ও যাত্রাওয়ালা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিচয় জানা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচিত হইল।

প্রথমে বলা যায় কবি গায়কদের কথা। এই কবিগায়ক বা কবিওয়ালাদের যুগ ধরা যায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর। এই দীর্ঘকাল কত কবিগায়ক যে দেশের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। বর্ধমানের প্রথম শ্রেণীর কবিওয়ালাদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাই ময়রা। তাঁহার জন্মভূমি ছিল খেড়ুর বা খেরার, অধুনালুপ্ত সাহেবগঞ্জ, বর্তমান মন্তেশ্বর থানায়। প্রথম জীবনে নবাই মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গা ময়রার দোকানে মাসিক তিনটাকা বেতনে কাজ করিতেন। একদিন ভিয়ান করিবার সময় নবাই গান রচনা করিতে গিয়া ভিয়ান নষ্ট করেন। গানটি হইতেছে এই

> "গুরুদত্ত গুড় লয়ে ভিয়ান কর মন ময়রা হ'য়ে
> সন্দেশ তৈরী হ'লে ভেট দিবি শমনে গিয়ে।
> রসনারে ঝাঁঝরি করে ভ্রান্তিগাদ দাও উঠায়ে।
> খেরারগ্রামে বসতবাটী গুড চিনিনে ময়রা বটি
> নবাইচন্দ্র কহে খাঁটি সন্দেশ হয় কি যেথায় সেথায়।"

ভিয়ান নষ্ট হওয়ায় নবাই মনিব কর্তৃক ভৎ'সিত হন ও চাকরি ত্যাগ করেন। পরে তিনি কবির দল গঠন করিয়া চণ্ডীগানে অবতীর্ণ হন। বর্ধমানের শ্রেষ্ঠ চণ্ডীগায়ক রামনারায়ণ স্বর্ণকার হইলেন দলের গায়ক, খেড়ুর গ্রামের শ্রীনিবাস তন্তুবায় ও বৈদ্যনাথ রায় হইলেন

সাহায্যকারী। নবাই শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রচনা ছিল উচ্চাঙ্গের। তিনি ছিলেন ভক্ত ও সাধক। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়াছেন, আবার বহু বৈষ্ণব সঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ছিল শ্যামা ও শ্যাম অভিন্ন। তখনকার শাক্ত ও বৈষ্ণবের কলহের দিনে এই ভাবধারা উদার বলিতে হইবে। কথিত আছে যে নবাই বাগনাপাড়ার বলদেব মন্দিরে গান করিতে আহুত হইয়া কালী ও কৃষ্ণের অভেদাত্মক এই সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন :

"হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
(একবার) হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
হৃদ মাঝারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি
অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী চরণে চরণ থুয়ে।"

অনেকে মনে করেন যে মুসলমান সত্যপীরের হিন্দুসংস্করণ হইতেছেন সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণের পূজাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট হয় সত্যনারায়ণের পাঁচালি। সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখিয়া বর্ধমানের অনেকেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় এইরূপ কয়েকজন পাঁচালিকারের পরিচয় দিয়াছেন :

দ্বিজ গিরিধর	মন্তেশ্বর থানার ভারুহা গ্রাম
মৌজিরাম ঘোষাল	পাটুলি—নারায়ণপুর
কৃষ্ণকান্ত	ধাত্রীগ্রাম
রামশঙ্কর সেন	সাতসৈকা—সাহাপুর
দ্বিজ কৃপারাম	দেবগ্রাম
গুণনিধি চক্রবর্তী	নারায়ণপুর
কাশিনাথ ভট্টাচার্য্য	নাসিগ্রাম

পাঁচালি ও পাঁচালিগান নবরূপ পায় দাশরথি রায়ের রচনায় ও গানে।

দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন কাটোয়া মহকুমার বাঁদমুড়া গ্রামে কিন্তু তিনি পরিবর্ধিত হন মাতুলালয়ে, পাটুলির নিকটে পিলে গ্রামে। অল্প বয়সেই তিনি কবির দলে যোগদান করেন ; পরে এই দল ত্যাগ করিয়া পাঁচালি রচনায় মন দেন ও পাঁচালির দল গঠন করেন।

দাশরথির পাঁচালি এক সময় বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আনন্দ দান করিত। শিক্ষিত ও নিরক্ষর সমানভাবে ইহার রস উপভোগ করিত। তাঁহার গানেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলন গীতি পরিস্ফুট হইয়াছে। আর একজন খ্যাতনামা পাঁচালিকার ছিলেন কৃষ্ণধন দে। তাঁহার নিবাস ছিল কাটোয়া। প্রথম জীবনে তিনি দাশরথি রায়ের পাঁচালি গান করিতেন কিন্তু পরে তিনি নিজেই গান রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার রচনায় ও গানে তিনি ভক্তিরসের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন।

তারপর বলা হইতেছে যাত্রাগানের কথা। অনেকে মনে করেন যে যাত্রাগানের সৃষ্টি হয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বা তাহারও পূর্বে। কিন্তু ইহার যথার্থ বিকাশ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। প্রাচীন যাত্রাগান ছিল কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে। পরে এই কৃষ্ণযাত্রাব অনুকবণে আত্মপ্রকাশ করে চণ্ডীযাত্রা, বামযাত্রা, ভাসান যাত্রা। প্রাচীন যাত্রাগানের রচয়িতার মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেন গোবিন্দ অধিকাবী, লাউসেন বড়াল ও নীলকণ্ঠ। ইঁহারা অভিনযও কবিতেন। লাউসেন বড়াল মনসার ভাসান যাত্রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা গান করিয়া জনসাধারণকে এরূপ মুগ্ধ করেন যে তখনকার দিনের প্রাচীনেরা বলিতেন যে গোবিন্দের কণ্ঠে শ্রীগোবিন্দ অধিষ্ঠান করেন। গোবিন্দ অধিকারীর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কীর্তনাঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার পূর্ণাঙ্গ মৌলিক পালা প্রথম রচনা করেন তাঁহার ভাবশিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। নীলকণ্ঠেব জন্ম হয় ধোয়াবুনি বা ধবনি গ্রামে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, তাঁহার কণ্ঠও ছিল মধুর। বাৎসল্য, সখ্য, মধুর বসের বহু পালা নীলকণ্ঠ রচনা করেন। তাঁহার পালাগুলি ছিল গীতিবহুল। নীলকণ্ঠ ছিলেন স্বভাব কবি, তাঁহার সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। আসরে দাঁড়াইয়া তিনি প্রয়োজনমত ভাবের আবেগে গান বচনা করিতে পারিতেন। সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার কোন কোন গানে শক্তি ও বিষ্ণুর অভেদতত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে :

"রামরূপে ধনু শ্যামরূপে বেণু
শ্যামারূপে অসি ধর অসিতা ·…"

নীলকণ্ঠের পুত্র কমলাকান্ত পিতার দলে অভিনয় করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই যাত্রাদল পরিচালনা করেন। কমলাকান্তের পর তাঁহার জামাতা ইহার ভার গ্রহণ করেন; তাঁহার নিবাস ছিল মানকর।

নীলকণ্ঠের রীতি অনুসরণ করিয়া আর একজন কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন করেন; তিনি হইতেছেন গোবিন্দ চাটুজ্যে; নিবাস ছিল গল্সির নিকট জয়কৃষ্ণপুর।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে উপরোক্ত কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশিই এক নূতন ধরনের যাত্রাভিনয় আত্মপ্রকাশ করে। থিয়েটার ও যাত্রার মধ্যবর্তী এই অভিনয় গীতাভিনয় নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গীতাভিনয় যাত্রাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার মূলে ছিলেন মতিলাল রায়। মতিলাল রায়ের জন্মভূমি ছিল কালনা মহকুমার ভাতশালা। দোগাছিয়া গ্রামের জমিদার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর সখের যাত্রাদলের সহিত কিছুকাল সংশ্লিষ্ট থাকিবার পর মতিলাল নিজেই এক যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত করেন ও সঙ্গে সঙ্গে বহু গীতাভিনয় রচনা করেন। রচনার উৎকর্ষতা ও মাধুর্যগুণে এব' মতিলালের অভিনব অভিনয় ও পরিচালনায় তাঁহার যাত্রাদল শীঘ্রই সুখ্যাতি লাভ করে। মতিলাল ত্রিশখানিরও অধিকসংখ্যক গীতাভিনয় এবং সহস্রাধিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। থিয়েটার, যাত্রা এবং কথকতার সমন্বয়ে তাঁহার গীতাভিনয়গুলি রচিত। মতিলালের পর তাঁহার পুত্রদ্বয় ধর্মদাস ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ যাত্রাদল পরিচালনা করেন। তাঁহারাও বহু পালাগান রচনা করেন।

মতিলালের অনুসরণে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বহু যাত্রাদল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জিলাতেও কয়টি দল গড়িয়া ওঠে ও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মতিলালের খুল্লতাত হরিচরণ রায়ের পুত্র ব্রজলাল কলিকাতায় এক পৃথক যাত্রাদল গঠন করেন। তিনিও ছিলেন একজন সুদক্ষ অভিনেতা; নিজেই পালা লিখিতেন।

শশিভূষণ অধিকারীর যাত্রাদল মতিলালের জীবদ্দশাতেই জনপ্রিয় হয়। তাঁহার নিবাস ছিল কালনার পুরাতন হাটে। কালনার অভয় বাগদি স্থানীয় লোক লইয়া একটি যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন; শোনা

যায় যে, শশী এই দলে নর্তক ছিলেন। পরে তিনি কালনায় চকবাজারে নিজেই যাত্রার দল খুলিলেন। এই দল শীঘ্রই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং যাত্রাদলের অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে শশী মতিলাল প্রবর্তিত রীতিতে "জুড়ি" এবং "ছেলে"র গান সহ যাত্রাভিনয় চালাইতে থাকেন কিন্তু জনরুচির পরিবর্তনের সহিত এই রীতি পরিবর্তিত হয় এবং যাত্রাগান থিয়েটারের বিকল্প হিসাবে "থিয়েট্রিকাল অপেরা"-তে পরিণত হয়। শশিভূষণ নিজে লেখক ছিলেন না, অভিনয়ও তিনি করেন নাই। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর বেহালা বাদক, আর বেহালা বাজাইয়াই তিনি তাঁহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন।

মতিলাল রায়ের রচনা রীতিকে অনুসরণ করিয়া আর একজন যাত্রাওয়ালা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি হইতেছেন অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার নিবাস ছিল পূর্বস্থলী থানায় কোক্‌সিলমা। যাত্রাদল গঠন ছাড়াও বহু পালাগান লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি মতিলালকে অনুসরণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে নাটকের রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গীতাভিনয় লেখক হিসাবে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার রচনা হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতার হরিতকি বাগান ছিল অহিভূষণের যাত্রার দলের কর্মকেন্দ্র। সাঁতরা বাবুরা যাত্রাদলের জন্য অর্থাদি ব্যবস্থা করিতেন; কালক্রমে যাত্রাদলটি সাঁতরা কোম্পানির যাত্রাদল নামে প্রসিদ্ধ হয়। অহিভূষণ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাঁতরা কোম্পানির যাত্রাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই যাত্রাদলটি পরে অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়।

অন্য একটি যাত্রাদল মতিলালের সমকালেই সুখ্যাতি লাভ করে। ইহা হইল পাইন কোম্পানির যাত্রাদল; ইহার প্রতিষ্ঠা করেন পীতাম্বর পাইন, বর্ধমানেরই অধিবাসী। এই দলে ধনকৃষ্ণ সেন প্রণীত সত্যনারায়ণ লীলাভিনয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

বর্ধমানের যাত্রাভিনয় লেখকদের মধ্যে মতি রায় ও তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরই ধনকৃষ্ণ সেন স্থান পাইবার যোগ্য।

শক্তিগড় রেল ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে খাঁড়গ্রামে ছিল তাঁহার বাস। বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও উপন্যাস লেখার উপর তাঁহার আগ্রহ ছিল। কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন ও পরে বহু গীতাভিনয় রচনা করিয়া যশস্বী হন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ধনকৃষ্ণের লোকান্তর হয়।

কালনা মহকুমার আমুখালের ভূষণ চন্দ্র দাস ছিলেন শশী অধিকারীর সম-সাময়িক। প্রথম জীবনে তিনি ঐ গ্রামের তারিণী পালের সখের যাত্রাদলে অভিনয় করিতেন; পরে নিজেই যাত্রাদল গঠন করেন। যাত্রাদলের কর্মস্থল ছিল কলিকাতা, নাথের বাগান। ভূষণ নিজে ছিলেন উৎকৃষ্ট গায়ক, জুড়িতেও গাহিতেন, এককও গাহিতেন। তাঁহার দলে পালা লিখিতেন মতিলাল ঘোষ। মতিলাল ঘোষের বহু পালাগান ভূষণের দলে অভিনীত হইয়া ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। ভূষণের মৃত্যুর পর এই যাত্রাদল অপেরায় রূপান্তরিত হয়। ভূষণ দাসের যাত্রায় 'মাতৃপূজা' নামক পালাটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়; ইংরেজ-সরকার এই পালার অভিনয় নিষিদ্ধ করেন।

কালনার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন গণেশ ঘোষ। তিনি চন্দননগরেব প্রসন্ন নিয়োগীর প্রসিদ্ধ যাত্রাদল খরিদ করিয়া ইহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গণেশ ঘোষেব দলে পালা লিখিতেন হারাধন রায়। প্রথম প্রথম গণেশের যাত্রাদলে জুড়ি ও ছেলের গান ছিল; কিন্তু পরে এইগুলি পরিত্যক্ত হয় ও যাত্রাদল অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়। "গণেশ অপেরা পার্টিতে" অভিনীত ভোলানাথ রায়ের "কালচক্র" ও "পৃথিবী" বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ভোলানাথ রায় (কাব্যশাস্ত্রী) ছিলেন রায়ানগ্রামের অধিবাসী। বহু যাত্রা পালা লিখিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন।

বাগনাপাড়ার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাদলে অভিনয় করিতেন। পরে তিনি প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদলের ম্যানেজার ও অভিনেতা হন। একজন দক্ষ অভিনেতা হিসাবে সতীশ সুনাম অর্জন করেন। তারপর তিনি নিজেই যাত্রাদল গঠন করিলেন। যাত্রাদলের নাম হইল "রামকৃষ্ণ নাট্ট সমিতি" আর ইহার কর্মকেন্দ্র হইল কলিকাতা, নাথের বাগান। প্রথম প্রথম

হারাধন রায়ের পালাগুলি এই যাত্রাদলে অভিনীত হইত, পরে অন্যান্য লেখকগণের রচনাও অভিনীত হয়। এই যাত্রাদলে বহু খ্যাতনামা গায়ক, বাদ্যকর, অভিনেতা ও নৃত্য-শিল্পী যোগদান করিয়া ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। যাত্রাদলটি পরে অপেরায় রূপান্তরিত হয়।

শশী হাজরার যাত্রাদল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। শশী হাজরার বাড়ী ছিল বলগোনার নিকট। "শান্তি সম্প্রদায়" নামে যাত্রাদল গঠন করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন রীতিতেই যাত্রাগান আরম্ভ করেন ও দেশে সুনাম অর্জন করেন। পরে এই দলও অপেরায় পরিবর্তিত হয়।

বহুকাল ধরিয়া জিলার অভিজাত সম্প্রদায় যাত্রাগানের পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে ইহার উৎসাহ বর্ধন করিতেন। প্রতিবৎসর ঝুলন যাত্রার সময় বর্ধমান-রাজের উইল বাড়ীতে, রাধাবল্লভজিউ-এর বাড়ীতে, মোহান্ত মহারাজের ও লক্ষ্মীনারায়ণজিউএর বাড়ীতে একাদিক্রমে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হইত। ঝুলন হইতে আবম্ভ করিয়া জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব পর্যন্ত চলিত যাত্রাগানের অনুষ্ঠান। নন্দোৎসবেব দিন মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীতে বসিযা গান শুনিতেন। ঐদিন বিভিন্ন যাত্রাদলের শ্রেষ্ঠ পালার কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য অভিনীত হইত, আর মহারাজা বিচাব করিয়া শ্রেষ্ঠ যাত্রাদলকে পুরস্কৃত করিতেন। ইহাকে নন্দোৎসবের বাঁধাই গান বলা হইত।

অন্যান্য বহু জমিদার গৃহেও যাত্রাগানের আদর ছিল। শিয়ারশোল রাজবাড়ীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী অহোরাত্র নৃত্যগীত বাদ্যের আয়োজন হইত, তিন দিনই হইত যাত্রাগানের অনুষ্ঠান। মহারাণী হরসুন্দরী ও কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মতি রায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এখানে মতি রায় ও তাঁহার পুত্রগণের স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। চকদীঘির জমিদার গৃহে দুর্গাপূজার সময় সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত চারদিন যাত্রাগানের ব্যবস্থা ছিল। এখানে মতি রায়ের একটি স্থায়ী আসর ছিল। অণ্ডাল গ্রামে রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাসন্তী পূজার সময় যাত্রাগানের আসর বসিত। এখানেও মতিরায়ের যাত্রার স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। ধর্মদাস এবং শশী অধিকারীও এখানে গান করিয়াছেন, নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা রায় সাহেবের উৎসব প্রাঙ্গণের

পরিশিষ্ট—২

কতিপয় খ্যাতনামা মনীষীর পরিচয়

১। ভবদেব ভট্ট

বর্মণ রাজবংশের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের আদি নিবাস ছিল রাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সিদ্ধল হইতেছে বর্তমান সিধলে, গুসকরার নিকট একটি গ্রাম। ভবদেব ভট্ট ছিলেন ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধ প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার নীতি। সময় আনুমানিক দশম খৃষ্টাব্দ।

২। রামাই পণ্ডিত

রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রচলন করেন বল্লুকা তীরে। মেমারির অদূরে বরোঁয়ায় ও কালনা মহকুমার বাগনা পাড়ার নিম্নে বল্লুকার ক্ষীণ ধারা এখনও বিদ্যমান। রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তক। তাঁহার প্রণীত ধর্মপূজা পদ্ধতি শূন্য-পুরাণ নামে খ্যাত। তিনি পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের সম-সাময়িক ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন (নবম খৃষ্টাব্দ)।

৩। মালাধর বসু

তাঁহার জন্মস্থান বর্ধমান সদর মহকুমার কুলিনগ্রাম। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও কবি। "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" পুঁথি লিখিয়া তিনি যশস্বী হন ও সুলতান হুসেনসাহের নিকট "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। সময়—পঞ্চদশ-ষোড়শ খৃষ্টাব্দ।

৪। রূপ ও সনাতন গোস্বামী

এই দুই ভ্রাতার পিতৃভূমি কাটোয়ার অন্তর্গত নৈহাটি—ভাগীরথী তীরে। সুলতান হুশেন সাহের দরবারে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পরে তাঁহারা হইলেন পরম বৈষ্ণব এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী।

৫। মহাকবি দামোদর

তিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ও রূপ-সনাতন গোস্বামীর

সম-সাময়িক। পাণ্ডিত্যের জন্য গৌড়ের সুলতান তাঁহাকে "যশোরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

৬। কেশব ভারতী

পরম বৈষ্ণব কেশব ভারতী ছিলেন মন্তেশ্বরের অদূরবর্তী দেনুড়ের অধিবাসী। চৈতন্য কাটোয়ায় তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করেন।

৭। বংশীবদন গোস্বামী

তিনি ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব ও চৈতন্য দেবের একজন পার্ষদ। তাঁহার আদিবাস ছিল কালনার অন্তর্গত পাটুলি। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী বাগনাপাড়া গ্রাম স্থাপন ও তথায় দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮। গোবিন্দ দাস

তাঁহার নিবাস ছিল বর্ধমানের কাঞ্চননগর। তিনি জাতিতে ছিলেন কর্মকার। সেবকরূপে চৈতন্যেব নিত্যসঙ্গী থাকিয়া দৈনন্দিন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা "কড়চা" নামে পরিচিত হয়। গোবিন্দ দাসের কড়চা বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ আদরণীয়।

৯। বৃন্দাবন দাস

"চৈতন্য-ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাসও ছিলেন দেনুড়ের অধিবাসী। তাঁহাব রচনার জন্য তিনি "চৈতন্যযুগের বেদব্যাস" আখ্যা পান। তিনিও ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক।

১০। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

তিনিও ছিলেন চৈতন্যের সম-সাময়িক। তাঁহার নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকট ঝামাটপুর। তিনি "চৈতন্য চরিতামৃত" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১১। লোচন দাস

তিনি চৈতন্যের সম-সাময়িক আর একজন পরম বৈষ্ণব। উচ্চ শ্রেণীর একজন পদকর্তা হিসাবেও তিনি বিখ্যাত হন। তাঁহার রচিত "চৈতন্য-মঙ্গল" চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট অবদান। তাঁহার জন্মভূমি মঙ্গলকোটের অদূরে কোগ্রাম।

১২। নরহরি সরকার ঠাকুর

তিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ও চৈতন্যের সমসাময়িক। পার্শ্বচর হিসাবে বহুকাল চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন। পদাবলী রচনা করিয়া নরহরি ঠাকুর বিখ্যাত হইয়াছেন।

১৩। জ্ঞানদাস

চৈতন্য-যুগের অন্য একজন বিশিষ্ট পদকর্তা। জন্মভূমি ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত কাঁদরা। জ্ঞানদাসের পদাবলী চণ্ডীদাসের রচনার ন্যায়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী।

১৪। জয়ানন্দ

চৈতন্য-যুগের অন্য একজন বৈষ্ণব কবি। লোচন দাসের ন্যায় তিনিও একখানি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহাব নিবাস ছিল আমাইপুর

১৫। রঘুনাথ শিরোমণি

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও নবন্যায়ের জনকহিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক। মানকরের অদূরে কোটা তাঁহার পিতৃভূমি।

১৬। জাহ্নবী দেবী

তিনি ছিলেন চৈতন্যযুগেব একজন বিশিষ্টা মহিলা। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অম্বিকা কালনা তাঁহার পিতৃভূমি।

১৭। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কন)।

তাঁহার জন্মভূমি ছিল রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যা দামোদর তীরে। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের সিলাই নদীর অপরতীরে আড়রায় বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেখানে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এক বিচিত্র আলেখ্য। সময়—ষোড়শ শতাব্দী।

১৮। রূপরাম চক্রবর্ত্তী

প্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার নিবাস ছিল রায়না থানার কাইতি—শ্রীরামপুর।

১৯। কনাদ ভট্টাচার্য্য

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও সদর মহকুমার জৌগ্রামের অধিবাসী। তাঁহার সময়ও ষোড়শ শতাব্দী। তাঁহার নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বহুদুর হইতে ছাত্র সমাগম হইত।

২০। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

মনসা মঙ্গলের রচয়িতা হিসাবে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁহার নিবাস ছিল দামোদরের অপর তীরে ও সময় সপ্তদশ শতাব্দী। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

২১। কাশিরাম দাস

তাঁহার আদি বাস ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত সিঙ্গি। সময়—সপ্তদশ শতাব্দী। কোনও অনিবার্য কারণে তিনি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও মেদিনীপুরের আউশগড রাজবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত মহাভারত রচনা করেন। প্রাঞ্জল ভাষায় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লিখিয়া তিনি অমর হইয়াছেন।

২২। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

রূপরামের ন্যায় তিনিও একজন ধর্মমঙ্গল প্রণেতা। তাঁহার জন্মভূমি ছিল দামোদরের অপর তীরে কৈয়ড়। সময়—অষ্টাদশ শতাব্দী। তিনি ছিলেন মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক।

২৩। কমলাকান্ত

তাঁহার জন্মভূমি ছিল অম্বিকা কালনা কিন্তু কর্মজীবন অতিবাহিত হয় বর্ধমান শহরে। কমলাকান্ত ছিলেন একাধারে কবি, ভাবুক ও ভক্ত। তিনি মহারাজা তেজচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন (অষ্টাদশ শতাব্দী) এবং মহারাজা ছিলেন তাঁহাব একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

২৪। রঘুনন্দন গোস্বামী

তাঁহার নিবাস ছিল মানকরের সন্নিকট মাড়ো। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন ও রাম রসায়ন নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। সময় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম।

২৫। বুনো রামনাথ

এই বিখ্যাত নৈয়ায়িকের বাসস্থান ছিল কালনার অন্তর্গত সমুদ্রগড়। পাণ্ডিত্য ও সরলতার আদর্শ স্বরূপ এই নৈয়ায়িক

বনপ্রান্তে নির্জন পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া অনাড়ম্বরভাবে বিদ্যাচর্চা করিতেন ও এইজন্য তাঁহার নামকরণ হয় "বুনো রামনাথ"।

২৬। গোবিন্দ কবিরাজ

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা। আদি নিবাস ছিল কুমার গ্রাম, পরে শ্রীখণ্ডে আসিয়া বসবাস করেন।

২৭। বাসুদেব ঘোষ

গৌর চন্দ্রিকাপদের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বাসুদেব ঘোষের নিবাস ছিল কুলুই। তিনি ছিলেন নরহরি ঠাকুরের সাহিত্য-শিষ্য।

২৮। মনোহর দাস

তাঁহার নিবাস ছিল কাটোয়া-বেগুনকোলা। 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

২৯। রূপ মঞ্জুরী

এই বিদুষী মহিলার চতুষ্পাঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার পিত্রালয় ছিল কোটার সন্নিকট। তিনি কৌমার্য ব্রতচারিণী হইয়া সমস্ত জীবন অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী ছিলেন ও লোক সমাজে "মেয়ে পণ্ডিত" নামে সুপরিচিতা ছিলেন।

৩০। দাশরথি রায়

প্রসিদ্ধ পাঁচালি গানের স্রষ্টা দাশরথি রায়ের জন্মস্থান ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত বাঁধমুড়া। দাশরথির পাঁচালি গান এক সময় পশ্চিমবঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই অতি প্রিয় ছিল।

৩১। কালিদাস সার্বভৌম

তাঁহার নিবাস ছিল অম্বিকা কালনা। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনু এবং মিতাক্ষরার অনুবাদক ও ভাষ্যকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম।

৩২। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্য একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তাঁহার নিবাস ছিল বড়বেলুন। গৌরচন্দ্রামৃত, মুক্তিদীপিকা, মনোদূতম্ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

৩৩। কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ

তিনিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক, নিবাস ছিল মাহাতা। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ছিলেন।

৩৪। রাধাকান্ত বাচস্পতি

তাঁহার সময়ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম। নিবাস ছিল চানক। 'নিকুঞ্জ বিলাস' প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৩৫। রামকমল কবিভূষণ

বর্ধমান শহরে তাঁহার বাস ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা ছাড়াও তিনি মহারাজা তেজচন্দ্রের জীবন অবলম্বন করিয়া একখানা সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

৩৬। কুড়ুনি দেবী

প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জননী। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার স্বামীর চতুষ্পাঠী ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেই অধ্যাপনা করিতেন। নিবাস ছিল দক্ষিণ দামোদর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম।

৩৭। হটি তর্কালঙ্কার

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মহিলা পণ্ডিত। তিনি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিতেন। বাসস্থান ছিল আউশগ্রাম থানার সোঁয়াই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম।

বিগত শতাব্দী হইতে বর্ধমান আরও বহু প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর জন্মভূমি বা আদিভূমি বলিয়া গৌরব লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

৩৮। ভগবতী দেবী

দক্ষিণ দামোদরের আর একজন বিদুষী। বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন।

৩৯। নবাই ময়রা

মন্তেশ্বর থানার খেজুর ছিল তাহার বাসভূমি। প্রথম জীবনে তিনি মালডাঙ্গার হাটে মাসিক তিন টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন। তিনি সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন ও পরে বহু গান রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হন। নবাই শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহার রচনা ছিল উচ্চাঙ্গের।

৪০। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

তাঁহার নিবাস ছিল ধোয়াবুনি বা ধবনি। তিনি ছিলেন একজন কবি, সাধক ও প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশই আধ্যাত্মিক বিষয়ে। এক সময় নীলকণ্ঠের গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৪১। গোবিন্দ অধিকারী

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ যাত্রা লেখক ও যাত্রাওয়ালা। তাঁহার রচনা, অভিনয় ও গান ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। অভিনয় ও গানে তিনি এইরূপ সুখ্যাতি অর্জন করেন যে লোকে বলিত যে গোবিন্দের কণ্ঠে, গোবিন্দেব অধিষ্টান।

৪২। শশিভূষণ অধিকারী

বিশিষ্ট যাত্রাকার ও বেহালা-বাদক। নিবাস ছিল কালনা, পুরাতন হাট।

৪৩। দেওয়ান রঘুনাথ রায়

চুপির দেওয়ান রঘুনাথ রায় ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৪৪। মতিলাল রায়

কানলার অন্তর্গত ভাতছালা ছিল তাঁহার বাসভূমি। তিনি ছিলেন অন্য একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ও সঙ্গীত রচয়িতা।

৪৫। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত সঙ্গীত লেখক। নিবাস ছিল দেবীপুর।

৪৬। স্বামী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার পিতৃভূমি ছিল অম্বিকা কালনার নিকট দত্ত-দেরিয়া-টোন।

৪৭। তারানাথ তর্কবাচস্পতি

তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। সংস্কৃত ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁহার নিবাস ছিল, অম্বিকা কালনা।

৪৮। রাজকৃষ্ণ মিশ্র

তাঁহার নিবাস ছিল দেবগ্রাম। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত লেখক।

৪৯। অক্ষয়কুমার দত্ত

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের নিবাস ছিল চুপি। তিনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ছিলেন সুপরিচিত কবি সতেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ।

৫০। যোগেশচন্দ্র বসু

তাঁহার নিবাস ছিল বেড়ুগ্রাম দক্ষিণ-দামোদর। তিনি ছিলেন অধুনালুপ্ত বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রবর্তক। মডেল ভগিনী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

৫১। রেঃ লালবিহারী দে

তাঁহার জন্মভূমি সোনা পলাশি। তাঁহার রচিত "গোবিন্দ সামন্ত" বা "বাংলার কৃষক জীবন" তৎকালের পল্লীজীবনের অনুপম আলেখ্য। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ হইতেছে "বাংলাদেশের রূপকথা"। দুইখানি গ্রন্থই প্রাঞ্জল ইংবেজীতে লিখিত। ইনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

৫২। প্রতাপচন্দ্র রায়

তাঁহার জন্মভূমি ছিল সাকো, মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

৫৩। খোদাবকস্ মল্লিক

তিনি মানু মিঞা নামেও পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত রসিক সমাজে তিনি পরিচিত কে. মল্লিক নামে। শ্যামা সঙ্গীত ও গজল গানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার নিবাস ছিল কুসুম গ্রাম।

৫৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনজীবী হইয়াও তিনি রস-সাহিত্যে সুনাম অর্জন করেন। "পঞ্চানন্দ" নামে বহু রঙ্গ-সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাসস্থান ছিল গঙ্গাটিকুরি।

৫৫। রাসবিহারী বসু

এই সুবিখ্যাত বিপ্লবীর আদিবাস ছিল সুবলদহ—দক্ষিণ-দামোদর। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তর প্রদেশ। পরে আত্মগোপন করিয়া জাপানে

উপস্থিত হন ও তথায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৫৬। রাসবিহারী ঘোষ

তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তার বিকাশ ও সম্প্রসারের জন্য তাঁহার দান অতুলনীয়। জন্মভূমি তোড়কোনা দক্ষিণ দামোদর।

৫৭। দুর্গাদাস লাহিড়ী

বেদের বাংলা অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল পূর্বস্থলী থানার চকবামনগড়িয়া।

৫৮। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিশারদের পিতৃভূমি ছিল আমাদপুর।

৫৯। প্রফেসর প্রমথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদীর নিবাস ছিল দাঁইহাটের নিকট চাণ্ডুলি। পরজীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত "ইতিহাস ও অভিব্যক্তি", "যপসূত্রম্" প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের গৌরব।

৬০। প্রফেসর কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার জন্মস্থান কাটোয়ার নিকট দুর্গা। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং "বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

৬১। কাজি নজরুল ইসলাম

আসানসোলের চুরুলিয়া তাঁহার জন্মভূমি। তিনি একজন বিপ্লববাদী কবি। তাঁহাব বচনা ও সঙ্গীত বাংলাদেশের গৌরব এবং এখনও গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৬২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; চুপি তাঁহার পিতৃভূমি। মনোরম ও অভিনব ছন্দে কবিতা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছেন।

৬৩। কালিদাস রায় কবিশেখর

তাঁহার জন্মভূমি কাটোয়ার অন্তর্গত কড়ুই। তিনি প্রসিদ্ধ কবি ও বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল। তাঁহার রচনা ও ছন্দ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

৬৪। কুমুদরঞ্জন মল্লিক

"উজানী"র কবি মুকুদরঞ্জন মল্লিকের নিবাস মঙ্গলকোটের অদূরে কোগ্রাম। পল্লীদরদী এই কবির রচনা ও ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ অবদান।

৬৫। ডাঃ সুকুমার সেন

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের পিতৃভূমি রায়না থানার অন্তর্গত গোতান। তাঁহার নিবাস বর্ধমান শহরেই। তিনি একজন খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্বজ্ঞ এবং "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

৬৬। আবুল কাশেম

প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম-সাময়িক। ইহার নিবাস ছিল কাশিয়ারা, বর্তমান কাশেমনগর।

৬৭। রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্

স্বনামধন্য সাহিত্যিক। বেদের বাংলা অনুবাদ ও বহু সাহিত্য ও উপন্যাস রচনা করেন। ইহার মাতৃভূমি ছিল আঝাপুর। আঝাপুরের বিখ্যাত সপ্তদেউল ইহারই পূর্বপুরুষ নির্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

৬৮। রসময় মিত্র

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। চানকের অধিবাসী।

পরিশিষ্ট—৩

বর্ধমানের কয়েকটি পল্লী, নগরী ও উপনগরী

ক। **আসানসোল মহকুমা ঃ**

১। **অণ্ডাল**—পূর্বরেলপথের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল। এই কারণে ও বহু রেলকর্মচারীর বসবাস বিধায় অণ্ডাল ক্রমশঃ একটি উপনগরীর আকার ধারণ করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় অণ্ডালের অদূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে যে বিরাট বিমান অবতরণ ক্ষেত্র নির্মিত হয়, তাহা এখনও বিদ্যমান। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর সন্নিহিত হওয়ায় অণ্ডালের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

২। **আসানসোল**—মহকুমার সদরস্থান। ইং ১৮৮১ সালের পূর্বে আসানসোল ছিল একটি পল্লী। শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের জন্য ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হয় এবং ইং ১৮৯৬ সালে এখানে মিউনিসিপালিটি বা পৌর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহার পর ইং ১৯০৬ সালে মহকুমা হাকিমের অফিস রাণীগঞ্জ হইতে আসানসোলে স্থানান্তরিত হয় ও এইস্থান মহকুমার সদর বলিয়া পরিগণিত হয়। শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রস্থল হিসাবে আসানসোলের গুরুত্ব খুব বেশী। পূর্ব-রেলপথ ও পূর্ব-দক্ষিণ রেলপথের প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও আসানসোল একটি বিশি[illegible] স্থান অধিকার করে। এখানকার রেল কলোনি বা বসতি উল্লেখযোগ্য। আসানসোল বাণিজ্য-কেন্দ্রও বটে। বহু জাতীয় বিবিধ শ্রেণীর লোক এখানে বসবাস করে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানটিকে সর্বভারতীয় বলা যায়। আসানসোল এক সময় মিশনরিগণের কার্যকলাপের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, ইহার নিদর্শন এখনও আছে। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় ভিন্নও এখানে একটি কলেজ আছে। শিল্পাঞ্চলের বিস্তৃতির সহিত আসানসোলও প্রসার লাভ করিতেছে।

৩। **আড়রা**—বাঁকসা থানার একটি পল্লী। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে যে রাস্তা মালানদীঘি হইয়া অজয় নদের দিকে গিয়াছে তাহা

পার্শ্বেই আড়রার অবস্থান। রাঢ়েশ্বর বা কালেশ্বর নামে শিবের প্রখ্যাত মন্দির এখানে অবস্থিত। মন্দিরটি বহু প্রাচীন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ইহার নির্মাতা বাংলার শেষ স্বাধীন রাজগণ—সেন রাজবংশ। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজগণই ইহা নির্মাণ করেন।

৪। **ইখোরা**—আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে কাশিমবাজারের মহারাজার দপ্তর ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি খনি-বিদ্যালয় (Mining School) অবস্থিত ছিল। দপ্তর বা বিদ্যালয় এখন আর নাই। স্থানীয় অধিবাসিগণের কিছুসংখ্যক লোকের কৃষিকার্য আছে; অবশিষ্ট সকলে প্রধানতঃ শিল্পাঞ্চলে কাজ করিয়া জীবিকার্জন করে।

৫। **উখরা**—কয়লা খনি অঞ্চলে অবস্থিত একটি খ্যাতনামা পল্লী। একসময় উখরা ছিল বিশিষ্ট পল্লী-অঞ্চল ও বহু শিক্ষিতের বাসস্থান। বর্তমানে ইহা প্রধানতঃ একটি শিল্প-কেন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। লালসিং উপাধিধারী প্রাক্তন জমিদার বংশের বাসস্থান এখানে। ইঁহাদের পূর্ব-পুরুষ ষোড়শ শতাব্দীতে সুদূর পঞ্জাব হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করেন ও বর্ধমান রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

৬। **উষাগ্রাম**—আসানসোল শহরের উপকণ্ঠে একটি ক্রম-বর্ধমান পল্লী। সম্প্রতি বহুলোক এখানে বসতি স্থাপন করিতেছেন। হিন্দুস্থান পিকলিংটন কোম্পানির কাঁচের কারখানা এখানে অবস্থিত। উষাগ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

৭। **কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থান**—বরাকর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে সদ্যনির্মিত মাইথন বাঁধের প্রবেশ পথে বরাকর নদের উপর অবস্থিত। এই নামীয় দেবী হইতে স্থানটির নাম কল্যাণেশ্বরী হইয়াছে। দেবীর মন্দির এইস্থানেই অবস্থিত। পূর্বকালে কল্যাণেশ্বরী ছিল তন্ত্র উপাসনার একটি কেন্দ্র। এখনও সহস্র সহস্র দর্শনার্থী মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

৮। **কন্যাপুর**—কয়েক বৎসর পূর্বেও স্থানটি ছিল একটি অখ্যাত

পল্লী। সেন র‍্যালে কোম্পানির সাইকেল কারখানা স্থাপনের পর হইতে স্থানটি খ্যাতিলাভ করে। বর্তমানে ইহা একটি শিল্পকেন্দ্র।

৯। **কাজোরা**—কাজোরা-কয়লাক্ষেত্র নামীয় বিস্তৃত খনি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রখ্যাত স্থান। ইহাও পূর্বে ছিল সম্পূর্ণ পল্লীশ্রীমণ্ডিত। এখানকার প্রাক্তন জমিদার হাজরা বংশ পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর। ইঁহাদের পূর্ববাস ছিল উড়িষ্যা; পরে ইঁহারা ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া এখানে বসতি স্থাপন করেন।

১০। **কাঁকসা**—এই নামীয় থানার সদর। কাঁকসা একটি প্রাচীন স্থান। অমরার গড়ের সদ্গোপ রাজবংশের একটি শাখা এখানে রাজধানী স্থাপন করে। এই রাজবংশের বহু কীর্তি এখানে বর্তমান। ইংরেজী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ কাঁকসা জয় করেন এবং ইহার পর এইস্থান মুসলমান সংস্কৃতির এক কেন্দ্র-স্থান হইয়া উঠে। মুসলমান আয়মাদারের বংশধরগণ এখনও বিশেষ প্রভাবশালী। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও বোলপুরগামী রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত থাকায় কাঁকসা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কাঁকসার অদূরে একটি বিমানঘাঁটি প্রস্তুত হয়।

১১। **কুলটি**—কুলটি থানার সদর। শিল্পাঞ্চলে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কোম্পানির (Indian Iron and Steel Company) কারখানা এখানে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে একটি আধুনিক পর্যায়ের শিল্প নগরী।

১২। **গৌরাংডি**—অবস্থান বরাবনি থানায়, অজয় তীরে। কয়লা শিল্পের একটি কেন্দ্র। প্রখ্যাত জমিদার ও শিল্পপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বাসস্থান। গৌরাংডির সংলগ্ন পাঙুরিয়া একটি বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্র।

১৩। **গৌরাঙ্গপুর**—কাঁকসা থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহার অবস্থান পানাগড—ইলামবাজার রাস্তার উপরিস্থিত সাতকাহানিয়া হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে, অজয় তীরে। দুর্গাপুর-মালানদীঘি অজয় রাস্তার বিষ্ণুপুর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। এখানে যে রেখ-দেউলটি আছে তাহার নির্মাতা ছিলেন ইছাই ঘোষ। দেউলে প্রাচীন কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪। **চিত্তরঞ্জন**—বিহার ও পশ্চিম বাংলার সংযোগস্থলে অবস্থিত প্রখ্যাত শিল্পনগরী। রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্য এখানে যে কারখানা আছে তাহা সারাভারতে সর্ববৃহৎ। রূপনারায়ণপুর ও মিহিজাম ষ্টেশনের সহিত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত রাস্তাদ্বারা চিত্তরঞ্জন সংযুক্ত। এখানে শিল্পনগরীর জন্য একটি থানা প্রতিষ্ঠিত আছে।

১৫। **চুরুলিয়া**—কবি নজরুল ইসলামের জন্মভূমি চুরুলিয়ার অবস্থান জামুরিয়া থানায়, অজয় তীরে। স্থানটি অতি প্রাচীন ও মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হিন্দু রাজগণের রাজধানী ছিল। নরোত্তম নামে কোনও রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। মুসলমান বিজয়ের পর স্থানটি একটি মুসলমান সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহু আয়মাদার শ্রেণীর মুসলমানের বাস ছিল এখানে ; তাঁহাদের বংশধরগণ চুরুলিয়ার বিশিষ্ট অধিবাসী।

১৬। **জামুরিয়া**—এই নামীয় থানার সদর। কয়লাশিল্প অঞ্চলের একটি কেন্দ্র ও বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থল।

১৭। **দিশের গড় বা ডিসের গড়**—দামোদর ও বরাকর নদের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইহার পূর্বনাম ছিল ডিহি সেরগড। প্রাক্ ইংরেজ যুগে ইহা রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র ছিল। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গও ছিল। বর্তমানে দিশের গড একটি প্রখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও ভারতীয় খনি সংস্থার (Indian Mining Association) সদর কার্যালয়।

১৮। **দুর্গাপুর**—পূর্ব-রেলপথের উপর অবস্থিত দুর্গাপুর কয়েক বৎসর পূর্বেও ছিল একটি সাধারণ শ্রেণীর ব্যবসায় কেন্দ্র। বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চল হইতে বহু ধান, চাউল দুর্গাপুর বাজারে আমদানি হইত, আর নিকটস্থ অরণ্যজাত শাল প্রভৃতি কাঠ এখান হইতে কলিকাতায় ও অন্যত্র রপ্তানি হইত। বর্তমানে দুর্গাপুর একটি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ইস্পাত নগরী ও কোক চুল্লির অবস্থান দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করিয়া। এখানে দামোদরের ওপর ব্যারাজ বা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ইহার জলরাশিকে সেচন ও নৌ-পরিবহণ কার্যে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডি. ভি. সি প্রযোজিত দামোদর খাল সমষ্টির উৎস হইতেছে দুর্গাপুর। শিল্পকলার প্রসারের সহিত দুর্গাপুরের

প্রাচীন অরণ্যভূমি বিলুপ্ত প্রায়, আর ইহার সহিত অবসান ঘটিয়াছে শান্ত পল্লী-জীবনের।

১৯। **দোমোহানি**—কয়লা শিল্প কেন্দ্র ও বিশিষ্ট ব্যবসায় স্থল। পূর্বে ইহা ছিল একটি কৃষি-পল্লী, কিন্তু শিল্প প্রসারের সহিত ইহার পল্লীশ্রী লোপ পাইতেছে এবং কৃষি আর পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

২০। **নেয়ামতপুর**—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর আসানসোল হইতে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে ইহার অবস্থান। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কয়লা শিল্প-কেন্দ্র ও ব্যবসায় স্থল। ইহাও ছিল পূর্বে পল্লীশ্রীমণ্ডিত। শিল্প প্রসার ও বহিরাগতদের আগমনের সহিত স্থানীয় অধিবাসিগণ পূর্ব গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

২১। **নডিহা**—অবস্থান দুর্গাপুরেব প্রায় দুই মাইল পূর্বে দামোদর তীরে। ইহা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের বাসস্থান। প্রাক্তন জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের বসবাস এখানে; এই বংশের অনেকে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে ও ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। দুর্গাপুরের উন্নতির সহিত নডিহাও উন্নতি লাভ কবিতেছে।

২২। **পাণ্ডবেশ্বর**—রাণীগঞ্জ-সিউড়ী রাস্তার উপর অজয়-তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কয়লা শিল্প-কেন্দ্র। ইহা ভিন্নও স্থানটির অন্য পরিচয় আছে। এখানে অজয়-তীরে যে পাণ্ডবেশ্বর শিব মন্দির আছে তাহা হইতেই স্থানটির নাম। কথিত আছে যে মহাভারতের পঞ্চ-পাণ্ডব তাহাদের বনবাসের সময় এই স্থানে কিছুদিন যাপন করেন ও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবের নাম পাণ্ডবেশ্বর শিব। শিব মন্দিরও তাঁদের নির্মিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

২৩। **বরাকর**—বরাকর নদের উপর অবস্থিত প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র ও ব্যবসায় স্থল। বিহার সীমান্তে অবস্থিত থাকায় ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিব আছে; ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যকলা হিসাবে ইহাদের খ্যাতি আছে। ইহাদেব কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

২৪। **বার্ণপুর**—প্রসিদ্ধ শিল্প উপনগরী। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত (Indian Iron and Steel) ও ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগানের বিস্তৃত

কারখানা এখানে অবস্থিত। শিল্প প্রসারের সহিত বার্ণপুরেরও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

২৫। **রাণীগঞ্জ**—একটি প্রসিদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্র। বার্ণ কোম্পানির পটারি কারখানা এবং বেঙ্গল পেপার মিল নামক প্রসিদ্ধ কাগজের কারখানা এখানে অবস্থিত। রাণীগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে আছে বিস্তীর্ণ কয়লা ক্ষেত্র। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্বেও অর্থাৎ কিঞ্চিদূর্ধ একশত বৎসর আগে বর্তমান শহরের কেন্দ্রস্থল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। শহরের খাঁটস্থলি অঞ্চলে ছিল মাত্র কয়েক ঘর গোয়ালা ও মুসলমানের বাস। আর কুমারবাজার অঞ্চল একটি কৃষি-পল্লী। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাণীগঞ্জ পূর্ব ভারতীয় রেলপথের শেষ ষ্টেশন ছিল; তখন উত্তর ভারতগামী সৈন্যদলের এখানে রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে হইত এবং এই উদ্দেশ্যে খাঁটস্থলি অঞ্চলে একটি সাময়িক সৈন্যাবাস তৈয়ার করা হয় ও সেই অনুসারে অঞ্চলটি পরিচিত হয় "গোরা বাজার" নামে। রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার পর রাণীগঞ্জের সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। তখন ফৌজদারী আদালত, থানা ও পোষ্ট অফিস স্থাপিত ছিল মঙ্গলপুরে আর দেওয়ানি আদালত ছিল উখরায়। ইং ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রাণীগঞ্জ ছিল মহকুমার সদর শহর, তাহার পর মহকুমার সদর আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। রাণীগঞ্জে নানাদেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বসবাস এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য দেখা যায়।

২৬। **রূপনারায়ণপুর**—পশ্চিম বাংলার পূর্ব-রেলপথের প্রধান শাখার শেষ ষ্টেশন। জলবায়ুর উৎকর্ষতার জন্য এই স্থান পূর্বে স্বাস্থ্য-নিবাস রূপে পরিগণিত ছিল। পরে বিহার পটারি ও বেঙ্গল পটারি স্থাপিত হইয়া স্থানটি পরিণত হয় একটি শিল্পকেন্দ্রে। বর্তমানে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বিস্তৃত কারখানা স্থাপিত হইবার পর রূপনারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলের সামিল হইয়া গিয়াছে।

২৭। **সাঁকতোরিয়া**—অবস্থান বরাকরের অনতিদূরে। বেঙ্গল কোল কোম্পানির প্রধান কার্যালয় এখানে অবস্থিত। কোল বোর্ডের পরিচালনায় এখানে স্থাপিত হইয়াছে একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল।

২৮। **শ্যামারূপার গড়**—দুর্গাপুর-মালানদীঘি-অজয় রাস্তার উপর বিষ্ণুপুরের অরণ্যপরিবৃত অঞ্চলে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম ছিল ঢেকুর। পরে সদ্‌গোপ বংশীয় মহামাণ্ডলিক ইছাই ঘোষ এখানে দুর্গ নির্মাণ করেন ও তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামারূপাকে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামারূপার নামানুসারে স্থানটি পরিচিত হয় "শ্যামারূপার গড়"। ইছাই ঘোষ এখানে যে মন্দির নির্মাণ করেন, বর্তমানে যে মন্দির দৃষ্ট হয় ইহা সেই মন্দির কি না তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ অছে। শ্যামারূপার গড়টি একটি উচ্চ ভূখণ্ডে বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল।

২৯। **সালালপুর**—এই নামীয় থানার কেন্দ্রস্থল। পূর্বে ইহা ছিল শান্ত পরিবেশযুক্ত স্বাস্থ্য-নিবাস। বর্তমানে শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত হইতেছে।

৩০। **সিয়ারশোল**—রাণীগঞ্জের উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ পল্লী ও বহু শিক্ষিত পরিবারের বাসস্থান। এখানকার মালিয়া উপাধিধারী অভিজাত বংশ প্রাক্তন জমিদার ছিলেন; শিল্প জগতে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের আদি বাসস্থান পঞ্জাব।

খ। কাটোয়া মহকুমা ঃ

১। **অগ্রদ্বীপ**—ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। একসময় অগ্রদ্বীপ একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী ও পণ্ডিত সমাজের বাসস্থান ছিল। এখানকার ভাগীরথী স্রোত অতিশয় পবিত্র বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রবাদ আছে যে মহারাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ তাঁহার উজ্জয়িনী প্রাসাদ হইতে এই স্থানে অবগাহণ করিতে আসিতেন। মনে হয় যে এই বিক্রমাদিত্য প্রকৃতপক্ষে ছিলেন রাজা বিক্রমজিৎ; নবদ্বীপে মুসলমান অভিযানের সময় ইনি মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন। অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজেও প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করে; এখানকার গোপীনাথ বিগ্রহ বাংলা ভাস্কর্যের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

২। **আমাদপুর**—বিশিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র; প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি।

৩। **আলমপুর**—কাটোয়া থানার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী, উর্বর কৃষিজমির জন্য বিখ্যাত। এখানে উৎপন্ন ডাঁটার যথেষ্ট সুনাম। সেন-বরাট উপাধিধারী প্রাক্তন জমিদার ও অভিজাত বংশের বাসস্থান।

৪। **করুই**—প্রখ্যাত কবি কালিদাস রায়ের জন্মভূমি করুই একটি বর্ধিষ্ণু ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম। বহু শিক্ষিত লোকের বাসস্থান হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি সমৃদ্ধিযুক্ত কৃষিপল্লী।

৫। **কইথন**—করুইয়ের সন্নিকটবর্তী অপর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এক সময় ইহা প্রভাবশালী মুসলমান আয়মাদারগণের বাসস্থান ছিল।

৬। **কইচর**—একটি প্রসিদ্ধ বাজার ও ব্যবসায়কেন্দ্র। এখানে ধান, চাউল ও আলুর বিশেষ আমদানি হয়।

৭। **কোগ্রাম**—কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান ও আবাস। অজয় ও কুনুরের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি মনোরম পল্লী। কোগ্রামের সহিত প্রাচীন উজানির সম্বন্ধ আছে। উজানিতে বাস করিতেন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলোক্ত বৈশ্য সদাগরগণ। বহু বৈষ্ণব কবি ও ভাবুক এখানে জন্মগ্রহণ করেন। উজানি এক সময় জৈন, বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাধনাব কেন্দ্র ছিল মনে হয়। কোগ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর প্রাচীনমূর্তি এখনও পূজিত হয়; ইহারই পার্শ্বে আছেন বজ্রাসনে আসীন প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি। এখানে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল, তাহা এখন বঙ্গীয় সাহিত্য ভবনে স্থানান্তরিত।

৮। **কাটোয়া**—মহকুমার সদর, অজয় ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। অবস্থানেব দিক দিয়া কাটোয়াব গুরুত্ব প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃতি পায় এবং মুসলমান বিজেতাগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া প্রথম হইতেই ইহাকে একটি কেন্দ্র হিসাবে পরিণত করেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইহা মুর্শিদাবাদের প্রবেশ দ্বার বলিয়া বিবেচিত হয় এবং আলিবরদি খাঁ মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এইস্থান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেন। ইং ১৭৪২ সালে নবাব কাটোয়া দুর্গের বাহিরেই বর্গী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন। ইং ১৭৫৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর বরাবর সৈন্য পরিচালনা করিয়া কাটোয়ায় উপস্থিত হন ও দুর্গ

অধিকার করেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী শহরেই শিবির স্থাপন করে এবং শহরের উপকণ্ঠে আম্রকাননে ক্লাইভ বহু চিন্তার পর যে সিদ্ধান্তে আসিলেন তাহাতে পলাশীর রণক্ষেত্রে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় হয়। কাটোয়া দুর্গের চিহ্ন এখন আর নাই বলিলেই চলে। কিন্তু মুসলমান আমলে নির্মিত মসজিদ এখনও বর্তমান। জাফর আলি খাঁ বা মুরশিদ কুলি খাঁ নির্মিত মসজিদটি উল্লেখযোগ্য। কাটোয়া একটি তীর্থস্থান, বৈষ্ণব সমাজে অতি পবিত্র। শ্রীচৈতন্য এইস্থানে কেশব ভারতী কর্তৃক দীক্ষিত হন। মধ্যযুগে কাটোয়া তন্ত্র সাধনার ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কাটোয়া ছিল প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র, কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে ইহা পূর্ব গৌরব হারাইয়াছে। তথাপি কাটোয়া ধান-চাউল, আলু ও আকের একটি বিশিষ্ট রপ্তানি-কেন্দ্র।

কাটোয়ায় একটি কলেজ আছে।

৯। **কেতুগ্রাম**—এই নামীয় থানার সদর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেতুগ্রাম ছিল তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল। কেতুগ্রামের বহুলার মন্দির ইহার স্মারক হিসাবে বিদ্যমান। কেতুগ্রাম একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী।

১০। **কাশেম নগর**—পূর্ব নাম ছিল কাশিয়ারা। জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল কাশেমের জন্মস্থান ছিল কাশিয়ারা ও তাঁহার নাম হইতে স্থানটির নূতন নামকরণ হয় কাশেম নগর। বহু সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মুসলমানের বাস ছিল এই স্থানে ও তাঁহাদের মধ্যে প্রতিপত্তি ও দানশীলতার জন্য নবাব আবদুল জব্বরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে এই মুসলমানগণ পূর্ব গৌরব হারাইয়াছেন।

১১। **গঙ্গাটিকরি**—কেতুগ্রাম থানাব একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। হাস্যরসাত্মক সাহিত্যিক ও জমিদার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভূমি। সাহিত্য জগতে ইনি “পঞ্চানন্দ” নামে খ্যাত ছিলেন।

১২। **চানক**—মঙ্গলকোট থানার একটি খ্যাতনামা গ্রাম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রসময় মিত্রের জন্মভূমি। পূর্বে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল এখানে।

১৩। **চৈতন্যপুর**—একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী ও বহু সঙ্গতিশালী পরিবারের বাসস্থান। এখানকার চৌধুরী বংশ প্রাক্তন জমিদার ও বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবী।

১৪। **দাঁইহাট**—কাটোয়া শহরের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন ব্যবসায় কেন্দ্র। ভাগীরথী প্রবাহ পূর্বকালে দাঁইহাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল কিন্তু বর্তমানে ইহা দূরে সরিয়া গিয়াছে। এক সময় এই স্থানের বস্ত্রশিল্প ও কাঁসা পিতলের কাজ সর্বত্র সমাদৃত ছিল; বস্ত্রশিল্প এখন ধ্বংসের দিকে, কাঁসা পিতলেরও আর পূর্ব গৌরব নাই। দাঁইহাটের ভাস্করগণ মধ্যযুগে ভাস্কর্য্য শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। বর্ধমান রাজপরিবারের আবু রায় হইতে জগতরাম পর্যন্ত সকলের সমাধি আছে এইখানে। দাঁইহাটের পৌর প্রতিষ্ঠান জিলার যাবতীয় পৌর প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম স্থান অধিকার করে।

১৫। **মাথরুণ**—কৈচরের সন্নিকট। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পিতৃভূমি। একটি বিশিষ্ট পল্লী।

১৬। **মঙ্গলকোট**—এই নামীয় থানার সদর। মঙ্গলকোট অতি প্রাচীন স্থান। অনেকে মনে করেন যে চণ্ডীমঙ্গলোক্ত মঙ্গলচণ্ডী হইতে স্থানটির নাম হইয়াছে। প্রাক্ মুসলমান যুগে ও মুসলমান যুগে মঙ্গলকোট প্রসিদ্ধি লাভ করে। কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ ভিন্নও মঙ্গলকোটের অভ্যন্তর ভাগ পুরাতন ধ্বংসাবশেষে আকীর্ণ। মধ্যযুগে স্থানটি হয় মুসলমান সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। বর্তমানেও এখানে মুসলমান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৭। **মাহাতা**—মঙ্গলকোট থানার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামে মুসলমান প্রাধান্য থাকলেও বহু পণ্ডিতের বাস ছিল এখানে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অ্যাডাম্স্ (Adams) সাহেব ইং ১৮৩৬ সালে মাহাতার পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

১৮। **মাজিগ্রাম**—মঙ্গলকোট থানার অন্য একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। প্রখ্যাত চিকিৎসক গণপতি পাঁজার জন্মভূমি।

১৯। **চুরপুনি**—কাটোয়া থানার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী, অবস্থান অজয় তীরে। বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিৎ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মস্থান।

২০। **যাগেশ্বর ডিহি**—মঙ্গলকোট থানার অপর একটি খ্যাতনামা কৃষিপল্লী। বহু সঙ্গতিশালী কৃষিজীবীর আবাস। এখানে যে বিশাল দীঘি আছে তাহার সহিত ক্ষীর গ্রামের ধামাস বা দক্ষিণ দামোদরের উচালনের দীঘির তুলনা করা যাইতে পারে।

২১। **রামজীবনপুর**—কাঁদরা। কেতুগ্রাম থানার একটি বিশিষ্ট স্থান ও ব্যবসায় কেন্দ্র। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস কাঁদরায় জন্মগ্রহণ করেন। কাঁদরা একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী।

২২। **দধিয়া**—কেতুগ্রাম থানার অন্য একটি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে এক বিরাট মেলা বসে আর তাহার বৈশিষ্ট্য হইল বহু বাউল বৈরাগীর সমাগম। মেলার নাম হইল বৈরাগীতলা মেলা।

২৩। **বিল্বেশ্বর**—অজয় তীরে অবস্থিত কেতুগ্রাম থানার অপর একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই শিব হইতেছেন অট্টহাসের ফুল্লরার ভৈরব।

২৪। **শ্রীবাটী**—কাটোয়া থানার একটি খ্যাতনামা ও সমৃদ্ধিশালী পল্লী। বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর বাসস্থান।

২৫। **শ্রীখণ্ড**—বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত শ্রীখণ্ড কাটোয়া থানায় অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান ছিল তন্ত্র-প্রধান, কেতুগ্রামের বহুলার ভৈরব শিব ভিরুক এইস্থানে অবস্থিত। একটি পঞ্চমুণ্ডি আসনও ছিল। মধ্যযুগে ইহা হয় বৈষ্ণব-সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। বহু বৈষ্ণব কবি ও ভাগবত এখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নরহরি সরকারের নাগরভাবে ভজন পদ্ধতি কাহারও মতে সহজিয়া সাধনা দ্বারা প্রভাবিত। বৈষ্ণব সংস্কৃতির ভাবধারা এখন রক্ষা করিতেছেন ঠাকুর বংশ।

২৬। **সিঙ্গি**—কাটোয়া থানার একটি খ্যাতনামা পল্লী। মহাভারত লেখক কাশিরাম দাসের জন্মস্থান হিসাবে সিঙ্গি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২৭। **ক্ষীরগ্রাম**—মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত একটি বিশাল পল্লী, অবস্থান কৈচর রেলষ্টেশনের অনতিদূরে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী

ক্ষীর ভবানীর নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে ক্ষীরগ্রাম। দেবী যোগাদ্যা নামে পরিচিত। দেবীমূর্তি সারাবৎসর নিকটস্থ ক্ষীর দীঘির জলে নিমজ্জিত রাখা হয়, বৎসরে মাত্র একবার মূর্তিটিকে জল হইতে তুলিয়া পূজা দেওয়া হয়। এই সময় ক্ষীরগ্রামে মেলা বসে ও গ্রামটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ক্ষীরগ্রামে ধামাস নামে যে বিশাল জলাশয় আছে তাহার তুলনা খুবই কম আছে। প্রবাদ আছে যে এই ধামাসের ঘাটেই দেবী যোগাদ্যা এক শাঁখারীকে প্রথম দর্শন দেন। ধামাস এক সময় জলসেচন কার্যে ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে সেরূপ কোনই ব্যবস্থা নাই, ধামাসও অযত্নে মজিয়া গিয়াছে।

গ। কালনা মহকুমা:

১। **অকাল পৌষ**—কালনা মহকুমার একটি বিশিষ্ট পল্লী ও শিক্ষিত ও বহু সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের আবাস ভূমি। এখানকার স্বনাম খ্যাত বসু বংশ ছিলেন প্রাক্তন প্রভাবশালী জমিদার।

২। **কালনা বা অম্বিকা কালনা**—মহকুমার সদর। অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা হইতে নাম হইয়াছে অম্বিকা কালনা। অনেকে মনে করেন যে দেবী আদিতে ছিলেন জৈন দেবতা, পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কেহ কেহ মনে করেন, বাঁকুড়া জিলার অম্বিকা নগর এই নামে পরিচিত হইয়াছে জৈন দেবতা অম্বিকা হইতে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কালনা যে এক সময় জৈন ধর্মদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা বিচিত্র নহে। এই মহকুমার পাতুনে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, আবার বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিও এখানে দেখা যায়। কালনা প্রথম খ্যাতিলাভ করে মধ্যযুগে। মনে হয় যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ইংরেজী পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেই এইস্থানে প্রবেশ করে। মজলিশ সাহেব ও বদর সাহেব নামে দুইজন মুসলমান সাধক এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এখনও সাধকদ্বয়ের দরগা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই পবিত্র। দরগা দুইটির অবস্থান ভাগীরথী তীরে

প্রায় ১ মাইল ব্যবধানে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই এক মাইল মধ্যে ভাগীরথী বক্ষে কোনই দুর্ঘটনা বা বিপদ হইতে পারে না। মুসলমান অনুপ্রবেশের সঙ্গে কালনা ইসলাম সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বহু মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত এখানে নির্মিত হয়। ইহাদের নিদর্শন কালনার সাসপুর অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। মজলিশ সাহেব নামক প্রসিদ্ধ মসজিদ সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে, এক সময় ঈদ্ পর্ব উপলক্ষে সন্নিহিত অভিজাত মুসলমানগণের প্রায় সাত আট শত শিবিকা ইহার প্রাঙ্গণে সমবেত হইত। কালনার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কলিকাতার বড় মসজিদ নির্মাণের জন্য ভূমি দান করেন, তাঁহার নাম মীর্জা মেহেদি।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই মধ্য যুগেই কালনা বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠে। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ কালনায় আগমন করেন ও গৌরীদাস পণ্ডিতের যে পাটে চৈতন্য তেঁতুলতলায় উপবেশন করেন তাহা আজও বর্তমান আছে। জনশ্রুতি আছে যে এই তেঁতুল গাছ একবার পুড়িয়া যায় কিন্তু পুনরুজ্জীবিত হয়। গৌরীদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবী দেবীর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। চৈতন্য ধর্ম কালনায় যে প্রভাব স্থাপন করে তাহা ম্লান হয় নাই এবং বেশী দিনের কথা নয়, পরম বৈষ্ণব ভগবান দাস বাবাজি এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কালনা আবার শাক্তভূমিও বটে। সাধক কমলাকান্ত এখানকারই অধিবাসী ছিলেন।

ইংরেজী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান-রাজ কালনা স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। রাজা চিত্রসেন রায় এখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ইং ১৭৪০ সালে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় কালনার বিখ্যাত শিব মন্দির। বর্ধমান রাজবংশের আরও বহু কীর্তি আছে কালনায়, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ প্রাসাদ, সমাজ বাড়ী ও লালজির মন্দির। গত উনবিংশ শতাব্দীতে কালনা নীলচাষের একটি কেন্দ্র হয়। নীলকর সাহেবগণ এখানে কুঠি স্থাপন করেন। বর্তমানে মহকুমা হাকিমের আবাসই এই কুঠি। মিশনারিগণও কালনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও গীর্জাঘর, স্কুল, চিকিৎসা-কেন্দ্র ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁহারা সুনাম অর্জন করেন এবং এই বিষয়ে

ডাঃ আম্বেট নামক একজন সুযোগ্য চিকিৎসক প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কালনা একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়-কেন্দ্র। প্রচুর পরিমাণে ধান, চাউল, পাট, আলু প্রভৃতি এস্থান হইতে বাহিরে রপ্তানি হয়। শিক্ষা বিষয়েও কালনা অগ্রগামী। এক সময় বহু পণ্ডিতের নিবাস ছিল এইস্থানে এবং তাঁহাদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি শুধু মাত্র সংস্কৃতেই নহে, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় ভিন্নও এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে।

৩। **আটঘরিয়া**—অবস্থান কালনা শহর হইতে প্রায় আট মাইল বর্ধমান রাস্তার উপর। মূলে আট ঘর সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রেণীর বাসস্থান হেতু নাম হইয়াছে আটঘরিয়া। ইহা একটি বর্ধিষ্ণু কৃষি-পল্লী।

৪। **আঙ্গারসন**—কালনা-পাণ্ডুয়া রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। ভূতপূর্ব প্রভাবশালী মুসলমান আয়মাদার বংশের বাসস্থান।

৫। **একচাকা**—কালনা শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে কালনা-পাণ্ডুয়া রাস্তার উপর অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইখানেই আবার বৈষ্ণব কীর্তনিয়াদের খোলের উৎপত্তি। কথিত আছে যে চৈতন্য-ভক্ত-মণ্ডলীর অন্যতম রাধাবিনোদ দাস একচাকার এঁটেল মাটি ও গঙ্গামাটি মিশ্রিত করিয়া খোল প্রস্তুত করেন। এখানে এক সময় তাম্রশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে একচাকা একটি কৃষি-পল্লী।

৬। **কাইগ্রাম**—মন্তেশ্বর থানার একটি খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত পল্লী। বসু উপাধিধারী অভিজাত পরিবারের বাসভূমি। এই পরিবারের দেবকী বসু সিনেমা জগতে স্বনাম খ্যাত।

৭। **কুসুমগ্রাম**—মন্তেশ্বর হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি খ্যাতনামা পল্লী। মধ্যযুগে কুসুমগ্রাম ইসলাম সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হয়। বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান আয়মাদার এখানে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে বসতি স্থাপন করেন। এখনও এই অঞ্চলে তাঁহাদের প্রভাব বর্তমান। কুসুমগ্রামের খোদাবক্স মল্লিক বা কে. মল্লিক এক সময়

সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত ছিলেন। মেমারী-মন্তেশ্বর রাস্তার উন্নতির সহিত কুসুম গ্রামও উন্নতি লাভ করিতেছে।

৮। **চুপি**—কালনা মহকুমার একটি প্রাচীন পল্লী, অবস্থান পূর্বস্থলীর অদূরে ভাগীরথী তীরে। একসময় বহু সঙ্গতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস ছিল এখানে। চুপির দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত-সৌন্দর্যের জন্য তাঁহাকে 'মহাশয়' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সুসাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থানও এখানে। সুকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁহার পৌত্র।

৯। **জামনা**—মন্তেশ্বর থানার একটি নাতিবৃহৎ কিন্তু শ্রীসম্পন্ন পল্লী। বিচারপতি এস. কে. মল্লিকের জন্মস্থান।

১০। **জামালপুর**—পূর্বস্থলী থানার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে "বুড়োরাজ" শিব আছেন, প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মহা সমারোহে তাঁহার পূজা হয়। এই সময় যে মেলা বসে তাহাতে সহস্র সহস্র লোক সমাগম হয়। মতান্তরে এই দেবতা ধর্মঠাকুর ব্যতীত আর কেহই নহেন।

১১। **ধাত্রীগ্রাম**—কালনা শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে বর্ধমান রাস্তার উপর অবস্থিত। এক সময় এখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসবাস ছিল এবং তাহাদের মধ্যে সত্যনারায়ণ পাঁচালি লেখক কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ধাত্রী গ্রামের অপর একজন সুসন্তান বেদ বিদ্যার গবেষণা ও বেদ ব্যাখ্যা দ্বারা পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি হইলেন সত্যব্রত সামশ্রমী।

১২। **নাদন ঘাট**—অবস্থান খড়ি নদীর উপরে, ভাগীরথীর সহিত খড়ির সংযোগস্থলের প্রায় দশ মাইল উপরে। এই অবস্থানের জন্য নাদন ঘাট জিলার একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে ধান চাউল, আকের গুড় ও পাট এস্থান হইতে বাহিরে যায়, আবার বাহির হইতে নানা প্রকারের ডাল, খেজুর গুড় প্রভৃতি ইহার মধ্য দিয়া জিলায় প্রবেশ করে। পূর্বে নাদন ঘাট পর্যন্ত খড়ি সারাবৎসর সুনাব্য ছিল। বর্তমানে গ্রীষ্মের সময় বৃহৎ মালবাহী নৌকায় নাদন ঘাটে প্রবেশ করিতে অসুবিধা হয়।

১৩। **দেনুড়**—মন্তেশ্বরের সন্নিকটবর্তী একটি গ্রাম। দেনুড় বিখ্যাত বৈষ্ণব পীঠ ও বৈষ্ণব চূড়ামণি বৃন্দাবন দাস এখানে তাঁহার "চৈতন্য ভাগবৎ" রচনা করেন।

১৪। **পাটুলি**—পূর্বস্থলী থানায় ভাগীরথী তীরে অবস্থিত একটি খ্যাতনামা গ্রাম। এক সময় বহু প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীপাট বাগনাপাড়া গ্রামের স্থাপয়িতা রামচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন পাটুলির চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পাটুলি ধ্বংসপ্রায় হয়। এখন আবার গ্রামটির শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

১৫। **পাতুন**—মন্তেশ্বরের অদূরে অবস্থিত। এখানে যে শিবমূর্তি আছে তাহার নাম পতঞ্জলীশ্বর বা পাতুনেশ্বর। কথিত হয় যে বিখ্যাত দার্শনিক মহর্ষী পতঞ্জলী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া এখানে উপস্থিত হন ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন করিতে থাকেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি "পাতঞ্জল দর্শন" রচনা করেন। পাতুন যে প্রাচীন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মনে হয় যে এক সময় জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্রের প্রতিপত্তি ছিল এখানে। পাতুনেশ্বর শিব মন্দিরের নিকটে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে আর আছে অবলোকিতেশ্বর ও অন্যান্য বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব দেবী মূর্তিও কূর্মাকারে ধর্ম ঠাকুর। পাতুন একটি ভাস্করপ্রধান গ্রাম ছিল।

১৬। **পিলা বা পিলে**—পাটুলির নিকট একটি গ্রাম। প্রসিদ্ধ পাঁচালি রচয়িতা দাশরথী রায় বাঁধমুড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও এখানে প্রতিপালিত হন।

১৭। **পূর্বস্থলী**—ভাগীরথী তীরস্থ একটি প্রাচীন স্থান ও এই নামীয় থানার সদর। পূর্বে পূর্বস্থলী বহু সম্ভ্রান্ত লোকের ও খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ইহা প্রায় জনশূন্য হয়। বর্তমানে ইহার শ্রী ফিরিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু ইহার বহুস্থান ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইতেছে।

১৮। **মন্তেশ্বর**—এই নামীয় থানার কেন্দ্রস্থল ও একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে যে 'মন্তেশ্বর শিব' আছেন তাহা হইতেই স্থানটির নাম। মন্তেশ্বরে চামুণ্ডা দেবীর উৎসব সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হয়।

চামুণ্ডা দেবী বৌদ্ধতন্ত্রের চার্চিকা দেবী ভিন্ন আর কেহই নহেন ইহা অনেকে বলেন। মেমারী-মন্তেশ্বর রাস্তার উন্নতির সহিত মন্তেশ্বরের শ্রী ও বৃদ্ধি হইতেছে।

১৯। **রাইগ্রাম**—একটি বিশিষ্ট মুসলমান পল্লী। এখানে আদি বরাহরূপধারী বিষ্ণুর বিরাট মন্দির ছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ও সুহৃৎ মহাসামন্তচূড়ামণি বটুকদাস। মুসলমান অভিযানের প্রথম বন্যায় মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয়। আদি বরাহের স্থান দখল করেন পীর গোরাচাঁদ।

২০। **বাগনাপাড়া**—একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। বাগনাপাড়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন রামচন্দ্র গোস্বামী। ইহার প্রাচীন নাম ছিল ব্যাঘ্রপাদাশ্রম; পরে পরিচিত হয় বাগনাপাড়া বা শ্রীপাট বাগনাপাড়া নামে। রামচন্দ্র গোস্বামীর খুল্লতাত বংশী বদনানন্দ গোস্বামী ছিলেন চৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত। বাগনাপাড়া গ্রাম ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে ও ইহার গোস্বামী বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। বাগনাপাড়ার বলরাম ও গোপেশ্বরের মন্দিরদ্বয় এই গোস্বামী বংশেরই প্রতিষ্ঠিত।

২১। **বৈদ্যপুর**—একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের বসবাস এখানে। বৈদ্যপুরের প্রাক্তন জমিদার নন্দিবংশ একসময় বিশেষ প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন ছিলেন। বৈদ্যপুরের যে সুপ্রাচীন শূন্যগর্ভ দেউল দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ মনে করেন যে তাহা বৌদ্ধবাদের স্মৃতিচিহ্ন।

২২। **বোহার**—মুসলমান অধিকারের পর যে সকল স্থান মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠে, বোহার তাহাদের অন্যতম। এখানে আরবি ও পারসি শিক্ষার জন্য একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দূর দূরান্তর হইতে মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য এখানে আসিতেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। বোহারে একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী বা পুস্তকালয় ছিল। ইহার বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর যে কামরায় সেগুলি রক্ষিত আছে তাহা "বোহার লাইব্রেরী" নামে পরিচিত।

২৩। **সমুদ্রগড়**—একটি বিশিষ্ট প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ভাগীরথী ইহার পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইত, বর্তমানে এই প্রবাহ দূরে সরিয়া গিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র শিরোমণি পরম পণ্ডিত "বুনো রামনাথ" ছিলেন সমুদ্রগড়ের অধিবাসী।

ঘ। বর্ধমান সদর মহকুমা ঃ

১। **আকুই**- দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলের একটি গ্রাম। এক সময় ইহা পণ্ডিত-সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত' রচয়িতা বলদেব বিদ্যাভূষণ এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

২। **অমরারগড়**—একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান। বহু শতাব্দী যাবৎ ইহা গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজগণের রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধি-লাভ করে। সদ্‌গোপ রাজগণ এইরূপ পরাক্রমশীল ছিলেন যে, একসময় ইঁহাদের রাজ্যসীমা পূর্বে ভাগীরথী হইতে পশ্চিমে আসানসোলের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বর্ধমানের উত্তরাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভল্লুপাদ। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রের সময়ই রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। মহেন্দ্রের পর সদ্‌গোপ রাজ্য খণ্ডিত হয় এবং এই রাজবংশের বিভিন্ন শাখা ভরতপুর ও কাঁকসায় রাজধানী স্থাপিত করে। মুসলমান অভিযানের অগ্রগতির সহিত, ভরতপুর ও কাঁকসা বিজিত হয় কিন্তু অমরারগড় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বর্তমান থাকে। অবশেষে বর্ধমানপতি রাজা চিত্রসেন রায় গোপভূম নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। সদ্‌গোপ রাজগণের প্রচেষ্টায় অমরারগড় বিশেষ সুরক্ষিত হয়। দুর্গ ও দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত শিবাক্ষা প্রমুখ দেবদেবীর মন্দির এখনও বর্তমান।

৩। **আত্রাহাটি**—গলসি থানার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট গ্রাম। স্থানটির নাম ছিল আত্রা কিন্তু খ্যাতনামা হাটি পরিবারের বসবাস হেতু ইহা আত্রাহাটি নামে পরিচিত।

৪। **কসবা-চম্পাই নগরী**—গলসি থানায় দামোদর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন স্থান। সাধারণের বিশ্বাস যে এই স্থানই

ছিল মনসামঙ্গল কাহিনীর চাঁদ সদাগরের রাজধানী চম্পাই নগরী। এখানে দুইটি সুউচ্চ ঢিবির একটি চাঁদ সদাগরের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও অন্য একটি লক্ষ্মীন্দরের বাসর সাতালি পর্বত বলিয়া কথিত হয়। একটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির এখানে অবস্থিত আছে; এই শিবলিঙ্গ চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই জনশ্রুতি।

৫। **কাঞ্চন-নগর**—বর্ধমান-শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রাচীন স্থান। একসময় কাঞ্চননগর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল এবং বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাঞ্চননগরের বিশিষ্ট বণিক ধুসদত্তের পিতৃশ্রাদ্ধে ইউরোপের নানাস্থান হইতে বহু বণিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে এক জোড়া অগ্নিফুলী বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। অগ্নিফুলী তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ বস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ কাঞ্চননগরের এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্বদেশে আমদানি করিতেন এবং ইহা তথাকার অভিজাতগণের বিশেষ আদরণীয় ছিল। কাঞ্চননগরের ইস্পাতশিল্প বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহার মর্যাদা রক্ষা করে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথমেও এই মর্যাদা একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। স্থপতি বিদ্যায়ও এই স্থান উৎকর্ষতা লাভ করে এবং ইহার নিদর্শন হিসাবে কঙ্কালী মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মূর্তি প্রস্তরে খোদিত কঙ্কালময়ী ভগবতী প্রতিমা; সুন্দরে-ভয়ঙ্করে মিশ্রিত একটি দুর্লভ মূর্তি।

সুপ্রসিদ্ধ "কড়চা" রচয়িতা গোবিন্দ দাস ছিলেন কাঞ্চননগরের অধিবাসী। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কাঞ্চননগর ধ্বংস হয়।

৬। **করজোনা**—সদর থানার একটি প্রাচীন গ্রাম। এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকদের একটি কেন্দ্র ছিল। কোম্পানির আমলের প্রথমভাগে ঠ্যাঙ্গারের উৎপাতের জন্য কুখ্যাত হয়। ইহারা পথচারীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত ও তাহাকে হত্যা করিয়া পথিপার্শ্বের দীঘিতে নিক্ষেপ করিত। এখনও ইহার কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত আছে

"যদি পেরুলি করজোনা মেয়ে ধুয়ে ঘর যানা
যদি না পেরুলি করজোনা দল চাপা দে ঘুম যানা।"

৭। **কামারপাড়া**—বনপাশ রেলষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত বৃহৎ পল্লী। এক সময় ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কামার পাড়ায় প্রস্তুত তরবারী এক সময় বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। কথিত আছে যে ইহাতে কখনও মরিচা ধরিত না এবং দুই প্রান্ত একত্রিত করিলেও ইহা ভাঙ্গিত না।

৮। **কুলিনগ্রাম**—জৌগ্রাম রেলষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত বৃহৎ পল্লী। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবি মালাধর বসুর বাসস্থান হিসাবে কলিনগ্রাম খ্যাতিলাভ করে। মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" পুঁথি লিখিয়া গৌড়ের সুলতান কর্তৃক "গুণবাজ খাঁ" উপাধিতে ভূষিত হন। কুলিনগ্রামেব বামানন্দগড ও প্রাচীন মন্দির প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

৯। **কোটা**—ইহাব অবস্থান মানকবের অদূরে। সুপ্রসিদ্ধ নৈযাযিক বঘুনাথ শিরোমণি এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিদূষী মহিলা রূপমঞ্জবীব পিত্রালয ছিল কোটা। রূপমঞ্জরী কৌমার্য্য ব্রতচারিণী হইয়া আজীবন অধ্যাপনা ব্রতে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

১০। **কোটশিমুল**—দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলের একটি প্রাচীন স্থান। এস্থানে যে সকল পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া তাহা মূল্যবান মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়েব আদিবাস ছিল কোটশিমুলের অদূরবর্তী।

১১। **কুরমুন**—স্থানটি অতি প্রাচীন। মনে হয় এক সময় তন্ত্রমন্তদ্বাবা বিশেষ প্রভাবান্বিত ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনে নরমুণ্ড লইয়া নৃত্য ইহারই স্মারক—বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়

"কেহ কেহ মানুষের ছিন্ন মুণ্ড লৈয়া
খড়্গ কবে নর্তন করয়ে মত্ত হৈয়া।"

কুরমুনেব ঈশানেশ্বর শিব মন্দিরে একটি প্রাচীন অপূর্ব "ইন্দ্রাণীর" মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের ফকিরডাঙ্গায় বাদশাহ্ সাজাহানের নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। রাজা রামমোহন রায় দ্বিতীয় বিবাহ করেন এই গ্রামে এবং এই স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাধাপ্রসাদ রায় ও রামপ্রসাদ রায়।

কুরমুন একটি উন্নতিশীল শিক্ষিত পল্লী।

১২। **খণ্ডঘোষ**—এই নামীয় থানার সদর। খণ্ডঘোষ এক সময় দক্ষিণ দামোদরের একটি সুবৃহৎ পল্লী ছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ইহা বিধ্বস্ত হয়। বর্তমানে ম্যালেরিয়া বিমুক্ত হইয়া পল্লী আবার শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

১৩। **গলসি**—বর্ধমান হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত ও গলসি থানার সদর। দামোদর খাল অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে গলসি। ইহা একটি রেলষ্টেশনও বটে। গুরুত্বপুর্ণ অবস্থান গলসিকে করিয়াছে সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায় কেন্দ্র।

১৪। **গোদা**—কথিত আছে যে এই স্থানটি রাজা গদাধরের রাজধানী ছিল। কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ এই রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। এই রাজা গদাধরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৫। **গুসকরা**—বর্ধমান-বোলপুর রেল রাস্তার উপর অবস্থিত একটি ক্রমোন্নতিশীল ব্যবসায় কেন্দ্র। যে সকল দ্রব্য এখানে আমদানি হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল ধান, চাউল, আক ও আলু। বহু চাউলকলের অবস্থান হেতু দুর দুরান্তর হইতে কৃষকগণ এখানে ধান বিক্রয় করিতে আসে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গুসকরার অনতিদূরে কুনুর নদীর তীরে নীলকুঠি ছিল।

১৬। **চকদীঘি**—জামালপুর থানার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী, স্বনামখ্যাত প্রাক্তন জমিদার সিংহ রায় পরিবারের আবাসস্থল। ইহারা ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশে বহু খ্যাতনামা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা মণিলাল সিংহ রায় ও বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় অন্যতম।

১৭। **জামালপুর**—এই নামীয় থানার সদর, দামোদর নদের উপর অবস্থিত। জামালপুর একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র। জামালপুরের কাঁচা গোল্লা এক সময় সর্বশ্রেণীর নিকট বিশেষ আদরণীয় ছিল।

১৮। **বনপাশ**—একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, বর্ধমান-বোলপুর রেল রাস্তার উপরে এই নামীয় রেল ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত। এক সময় কাঁসা পিতল শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে এই শিল্প লুপ্ত প্রায়।

১৯। **তোড়কোনা**—দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলের একটি খ্যাতনামা পল্লী। স্বনামখ্যাত রাসবিহারী ঘোষের পিতৃভূমি।

২০। **বর্ধমান**—জিলার প্রধান শহর। সেণ্ট মার্টিন সাহেবের (M. de St. Martin) মতে গ্রীক ভৌগোলিকগণ গঙ্গারিড়ি রাজ্যের রাজধানী বলিয়া যে পার্থালিস্ বা পোর্টালিস শহরের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ধমান শহর অভিন্ন। আবার ওয়াডেল সাহেব (Colonel Waddell) বলেন যে প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী বর্তমান শহরের উপকণ্ঠেই অবস্থিত ছিল (কাঞ্চননগর)। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে মেমারী থানার সাতগেছিয়ার অদূরে অবস্থিত সুপ্রাচীন গ্রাম বরোঁয়া ছিল পুরাতন বর্ধমান শহর, এবং ইহা হইতে বর্ধমান ভুক্তির নাম উৎপত্তি। বরোঁয়া দামোদরের শাখানদী বল্লুকার তীরে অবস্থিত। কোনও কারণে শহর বিধ্বস্ত ও নদী মজিয়া যাইবার ফলে রাজধানী আধুনিক বর্ধমানে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমান বর্ধমান শহরের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন দাউদ খাঁ-এর পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাদশাহ আকবরের সৈন্যবাহিনী বর্ধমান অধিকার করে। তাহার পর ইহার উল্লেখ হয় সের আফগানের এই স্থানে আগমন উপলক্ষে। সের আফগান ছিলেন মেহের উন্নেছার প্রথম স্বামী। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আদেশে বাংলার সুবেদার কুতবদ্দিন শহরের উপকণ্ঠেই সের আফগানকে আক্রমণ করেন ও নিহত করেন। প্রতি আক্রমণে কুতবদ্দিনও প্রাণ হারান। তাঁহাদের সমাধিস্থান এখনও বর্তমান। জাহাঙ্গীর পরে মেহেরউন্নেছাকে বিবাহ করেন ও ইহার পর মেহেরউন্নেছার নামকরণ হয় নুরজেহান।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ খুড়ম, যিনি পরে শা জাহান নামে দিল্লীর বাদশাহ হন, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমান অধিকার করেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় শোভা সিংহ ও রহিম খাঁ ১৬৯৫

খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জয় করেন। পরে রাজকুমারী সত্যবতী কর্তৃক শোভা সিংহ নিহত হন এবং রহিম খাঁ বাদশাহের পৌত্র আজিম-উ-শান এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন শহরেরই উপকণ্ঠে। রহিম খাঁকে নিহত করিয়া ও বিদ্রোহ দমন করিয়া আজিম-উ-শান তিন বৎসর যাবৎ বর্ধমান শহরে অতিবাহিত করেন। তাঁহাব সময় বর্ধমানের বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ নির্মিত হয়।

বর্ধমান শহরে কয়েকটি প্রাচীন সমাধিস্থান আছে, তাহাদের মধ্যে পীর বাহারম শা, খোজা আনওয়ার শা, সের আফগান ও কুতবদ্দিন সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। পীর বাহারমের নাম ছিল হজরত হাজি বাহারম সেক্কা। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের অধিবাসী। বাদশাহ আকবরের সময় তিনি দিল্লী আসেন ও ধর্মানুরাগের জন্য বাদশাহের ভক্তি ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কিন্তু বাদশাহের সভাসদ আবুল ফজল ও ফৈজি তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন ও তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। বিরক্ত হইয়া বাহারম সেক্কা দিল্লী ত্যাগ করিয়া বর্ধমান আসেন কিন্তু তিন দিনেব মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, সেই সময় বর্ধমানে জয়পাল নামক একজন সাধু বাস করিতেন। বাহারম তাঁহার সহিত পরিচয় করেন। মুসলমান ফকিবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জয়পাল তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। যে স্থানে বাহারমের সমাধিস্থান বর্তমান, সেই স্থানটি ছিল জয়পালের উদ্যান; বাহারম সেক্কাকে সর্বস্ব দান করিয়া উদ্যানের এক কোণে বাস স্থাপন করেন। বাহারম সেক্কার মৃত্যু সংবাদ যখন বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তিনি তাঁহাব স্মৃতি চিরস্মরণীয় করার জন্য কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব বরাদ্দ করেন। উদ্যান ও জলাশয় সংস্কার করা হয় এবং দৈনিক দুই টাকা দাতব্য কার্যের জন্য মঞ্জুর হয়। খোজা আনওয়ার ছিলেন একজন সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি বর্ধমান শহরের নিকট যুদ্ধে নিহত হন। বিশ্বস্ত ও সুনিপুণ এই রাজকর্মচারীর স্মৃতিতে বাদশাহ ফেরুক শা তাঁহার সমাধিস্থান নির্মাণ করেন।

পীর বাহারম শা-এর পূর্বেও কয়েকজন মুসলমান সাধুর বর্ধমানে আগমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন শাহ-খাজা খিজির রুমি। শোনা যায় যে তিনি ইটালির অধিবাসী

ছিলেন ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দামোদর নদ বাহিয়া বর্ধমান উপস্থিত হন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বর্ধমান রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে খকড়র সাহেবের আস্তানা আছে তিনি ইহার পর বর্ধমান আসেন। তিনি ছিলেন সুফী মতাবলম্বী।

বর্ধমান শহরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে আছে রাজপ্রাসাদ, দিলখুসা ও গোলাপ বাগ। এই সকল এখন নব প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত। কয়েকটি পুরাতন রমণীয় জলাশয় আছে; তাহাদের মধ্যে বিশালকায় কৃষ্ণসাগর খনন করেন রাজা কৃষ্ণরাম রায় আর রাণীসাগর রাণী ব্রজকিশোরী। লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষে মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করেন; তাহা বর্তমানে বিজয় তোরণ নামে পরিচিত। বর্ধমান শহরের অদূরে আছে বিখ্যাত ১০৮ শিব মন্দির। ইহা নির্মিত হয় মহারাজা তেজচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর সময়। আধুনিক পর্যায়ের একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল, একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, মহিলা কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুল বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

২১। **বরেঁায়া**—মেমারী থানার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে ধর্মঠাকুরের পূজা বিধানে ধর্ম-পীঠ-মালার মধ্যমণি বলিয়া যে শ্রীবর্ধমানের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা হইতেছে বরেঁায়া। ধর্মপীঠ হইতেছে বরেঁায়ার ধর্মরাজ; পাথরের মন্দিরের চিহ্নাবশেষ বিলুপ্তপ্রায় বল্লুকা নদীর পার্শ্বে বর্তমান। ধর্মমঙ্গলে বল্লুকার তীরেই ধর্মপূজার প্রথম প্রচলন বলিয়া কথিত আছে। নৈসর্গিক কারণে নদীখাত মজিয়া যাওয়ায় শ্রীবর্ধমান বর্তমান বর্ধমান শহরে স্থানান্তরিত হয়।

২২। **বড় বেলুন**—একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। স্থানটি বৈষ্ণব, অদ্বৈতবাদী ও শাক্তমতের মিলনক্ষেত্র। এখানে যেমন অনন্তপুরী গোস্বামীর কীর্তি রহিয়াছে, সেইরূপ অধিষ্ঠাত্রী কালী দেবীরও মন্দির আছে। এখানকার কালীপূজা বিখ্যাত। বড় বেলুনে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

২৩। **বৈনান**—দক্ষিণ দামোদরের একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী।

২৪। **বেরুগ্রাম**—দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের অন্য একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্মস্থান।

২৫। **বুদ্‌বুদ্**—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত উদীয়মান ব্যবসায় কেন্দ্র। পানাগড সামরিক ঘাঁটির সান্নিধ্য হেতু বুদ্‌বুদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইতেছে।

২৬। **দামুন্যা**—অবস্থান দামোদরতীরে, রায়না থানায়। একটি প্রাচীন গ্রাম। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা স্বকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবি-কঙ্কণের জন্মভূমি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২৭। **নাসিগ্রাম**—একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী। একসময় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার কাশিনাথ ভট্টাচার্য সত্যনারায়ণ পাঁচালি লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

২৮। **মণ্ডলগ্রাম**—একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী দেবতা বিখ্যাত। প্রতি বৎসর ইঁহার পূজা মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয। এই জগৎগৌরী ও বিষহরি বা মনসা অভিন্ন।

২৯। **মল্লসারুল**—গল্‌সি থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী সময়ের মহারাজা বিজয় সেনের যে তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয যে স্থানটী দত্ত উপাধিধারী বণিককুলের বাসস্থান ছিল।

৩০। **মানকর**—একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রাম। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির নিবাস ছিল মানকর। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। মধ্যযুগে এই স্থান বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত হয় ও এখানকাব প্রস্তুত চেলি সুনাম অর্জন করে। বহু তন্তুবায় ও সুদক্ষ স্বর্ণশিল্পীর বাস ছিল এখানে। মানকরের মিশ্র বংশের হিতলাল মিশ্র এখানে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ ও অজুর জন্য একটি জলাশয় খনন করেন।

মানকরে এখানকার প্রাচীন কবিরাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী দেবীর মন্দির আছে। বিগত শতাব্দীতে খৃষ্টান মিশনরিগণ এখানে একটি কেন্দ্র স্থাপিত করেন; যদিও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কেন্দ্রটি এখনও আছে। একসময় বৃহৎ আকৃতির ক

জন্য মানকরের সুখ্যাতি ছিল। বর্তমানে এই জাতীয় কদমার চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

৩১। **মেমারী**—এই নামীয় থানার সদর ও একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। মধ্যযুগে এই স্থান তাঁত বস্ত্র ও রেশম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত হয়। বহু সুদক্ষ তন্তুবায়ের বাস ছিল এখানে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাঁত ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার পর হইতে তাঁত শিল্পের অবনতি হয়। কিন্তু তন্তুবায় শ্রেণী এখনও প্রভাবশালী। তাহাদের সাধারণ উপাধি হইতেছে "বিষয়ী"।

৩২। **রণডিহা**—দামোদর তীরে একটি ক্ষুদ্র পল্লী। পুরাতন দামোদর-খাল সমষ্টির উৎস ছিল এখানে। দামোদর প্রবাহের দিকে মুখ করিয়া এখানে একটি মনোরম ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো অবস্থিত আছে।

৩৩। **রায়না বা রায়নগর**—একটি বৃহৎ পল্লী, অবস্থান দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চল। পুলিশ থানা শ্যামসুন্দরে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে, রায়না এই নামীয় থানার সদরস্থল ছিল। রায়নার অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ বাগ্‌দি সম্প্রদায়, পূর্বে সাহস এবং বলিষ্ঠতার জন্য বিখ্যাত ছিল। জমিদার বা স্থানীয় রাজবংশের সৈন্য বা পাইক বাহিনীতে তাহাদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যখন এই বাহিনীর বিলোপ হয়, তাহারা অন্নসংস্থানের জন্য দস্যুবৃত্তি অবম্বন করে। ঠগি বা ঠ্যাঙ্গারে নামে পরিচিত হইয়া তাহারা বহুকাল দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই দস্যুদলের সাহস ও শক্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী এখনও প্রচলিত।

৩৪। **সাঁকো**—একটি বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইংরাজীতে প্রথম মহাভারত অনুবাদক প্রতাপচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল সাঁকো।

৩৫। **সাকনাড়া বা শাঁকনাড়া**—দক্ষিণ দামোদরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জন্মভূমি। তাঁহার মাতা কুড়ুনি দেবীও একজন প্রখ্যাতা বিদূষী মহিলা ছিলেন এবং অনেক সময় স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেই তাঁহার স্বামীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার কার্য পরিচালনা করিতেন।

৩৬। **সেহারা বাজার**—দক্ষিণ দামোদরের একটি প্রসিদ্ধ

বাণিজ্য কেন্দ্র। বাঁকুড়া-দামোদর রেল পথের একটি ষ্টেশন। বাঁকুড়া-হুগলি-বর্ধমান জিলার সংযোগ স্থলে অবস্থিত এই স্থানটি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে।

৩৭। **সোঁয়াই**—প্রসিদ্ধা মহিলা পণ্ডিত হটি বিদ্যালঙ্কার এখানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন। পরে কাশীতে গিয়া টোল স্থাপনা করেন ও অধ্যাপনা কার্য করেন।

৩৮। **সোনা পলাশী**—ভাতার থানার একটি ক্ষুদ্র পল্লী। "বাংলার কৃষক জীবন" ও "বাংলার রূপ কথা" রচয়িতা রেঃ লালবিহারী দে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার রচনা দুইখানি ইংরাজীতে লিখা হইলেও ইহা বিশেষ অবদান বলিয়া স্বীকৃত হয়, বিশেষতঃ "বাংলার কৃষক জীবন" বা "গোবিন্দ সামন্ত"।

৩৯। **শ্যামসুন্দর**—পূর্ব নাম আহার বেলমা, একটি বিশিষ্ট পল্লী। এখানে প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে একটি বহুমুখী বিদ্যালয় ও একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

৪০। **বোরো**—মেমারী থানায় একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে যে "বলরাম" প্রতিষ্ঠিত, অনেকের মতে তাহা বুদ্ধ বা শূন্য মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। বলরামের চক্ষুদান উৎসবও এই মতে বৌদ্ধ উৎসব। গাজনও তাহাই।

৪১। **মাড়ো**—অবস্থান মানকরের অদূরে। মাড়োর গোস্বামী বংশের রঘুনন্দন গোস্বামী "রাম রসায়ন" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট—৪

বর্ধমানে খৃষ্টান মিশনরী

কোম্পানির আমলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বর্ধমানে খৃষ্টান মিশনরিগণের প্রবেশ। মিশনরিগণের কার্যকলাপ সমাজ জীবনে এক মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহার ফল হয় সুদূর প্রসারী।

ইং ১৮১৬ সালে চার্চ মিশনরী সোসাইটি (Church Missionary Society) সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বর্ধমানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ক্যাপটেন ষ্টুয়ার্ট নামক কোম্পানির একজন কর্মচারী এই মিশনের কার্যে বিশেষ আগ্রহশীল হন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় মিশন প্রথমে দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। দুই বৎসরের মধ্যে মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় দশটি ও মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। এই সব বিদ্যালয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালকদেরই ছিল সংখ্যা-প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মিশনরিগণের এই প্রচেষ্টা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার কারণও ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করা মিশনরিগণের পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুবালকগণ যাহাতে এইসব বিদ্যালয়ে না যায় সে সম্বন্ধে সমাজের শাসন ছিল কঠিন কিন্তু বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মিশনের এই বিদ্যালয়গুলি এইরূপ সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ইং ১৮৩৭ সালে অ্যাডামস্ নামে জনৈক শিক্ষাবিদ্ প্রকাশ করেন যে, সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বর্ধমানই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত জিলা। ইং ১৮১৯ সালে এই মিশনের জন্য বর্ধমানে একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয় এবং ইহার উপর গীর্জাঘর, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম ও মিশনগৃহ গড়িয়া উঠে এবং স্থানটি মিশন কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইং ১৮৩০ হইতে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত রেভারেণ্ড উইট ব্রেকট (Rev. Weitbrecht) নামে একজন পাদরির পরিচালনায় মিশনের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। কালনা শহরে, বাঁকুড়া ও নদীয়ায় মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানে এই মিশনের কর্তৃত্বে ১৪টি বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশে প্রথম স্থাপিত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্যে

একটি বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম পরিচালিত হইত। কিন্তু চার্চ মিশন বহুদিন ইহার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। ফ্রি চার্চ অব্ স্কটল্যাণ্ড (Free Church of Scotland) নামে অপর একটি খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান কালনা মিশনের ভার গ্রহণ করে আর ওয়েসলিয়েন সোসাইটি (Wesleyen Society) বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর "বর্ধমান জ্বর" আবির্ভাবের ফলে বর্ধমান শহর যখন প্রায় পরিত্যক্ত হয়, চার্চ মিশনের প্রতিষ্ঠান সমূহ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় ও ইহার শাখা সমূহ অন্যান্য মিশন সম্প্রদায়ের হস্তে যায়। চার্চ অব্ ইংলণ্ড জেনানা সোসাইটি (Church of England Zenana Society) নামে একটি মহিলা মিশন বর্ধমান শহরে ও মানকরে প্রতিষ্ঠিত হয়; বর্ধমানের প্রতিষ্ঠানটি অর্থাভাবে ইং ১৯০০ সালে বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু মানকরের প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান থাকে। কালনা শহরে ফ্রি চার্চ অব্ স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসা মিশন একটি হাসপাতাল ও চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করে ও ইহা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের জনৈক চিকিৎসক চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম ডাঃ অ্যাম্বেট।

ইং ১৮৭৮ সালে রাণীগঞ্জ শহরে ওয়েসলিয়েন মেথডিষ্ট (Wesleyan Methodist) মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের অধীন স্থাপিত হয় একটি ইংরেজ গীর্জা ও তিনটি দেশীয় লোকের জন্য প্রার্থনা মন্দির। একটি অনাথ আশ্রম ও আতুর আশ্রম এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ও মিশনের পরিচালনায় গড়িয়া ওঠে। স্থানীয় কুষ্ঠ আশ্রমটির ভারও মিশন গ্রহণ করে। ইং ১৮৭২-৭৩ সালে রোমান ক্যাথলিক মিশন (Roman Catholic Mission) আসানসোলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটি গীর্জাঘর নির্মিত হয় ও পরবৎসর স্থাপিত হয় একটি কনভেন্ট্ ও ইংরেজি বিদ্যালয়। ইং ১৮৮৩ সালে আসানসোলে সোসাইটি অব্ জেস্যাস্ (Society of Jesus) সম্প্রদায় কর্তৃক একটি পাদরি শিক্ষাবাস নির্মিত হয়। ইং ১৮৮৯ সালে এই শিক্ষা কেন্দ্র কার্সিয়াং-এ স্থানান্তরিত হইলে গৃহটি উপরোক্ত ক্যাথলিক মিশনকে প্রদান করা হয় ও এইস্থানে স্থাপিত হয় সেণ্ট প্যাট্রিক (St. Patrick) স্কুল। এই সময় মেথডিষ্ট এপিস্‌কোপাল্ সোসাইটি (Methodist Episcopal Society) নামে

অন্ত একটি খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান আসানসোলে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথমে একটি গীর্জাঘর নির্মিত হয়, পরে ইহার পরিচালনায় একটি বিদ্যালয় ও বালিকাদের জন্য আবাস গৃহ স্থাপিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকাগণের শিক্ষার ভারগ্রহণ ও ধর্ম প্রচারের দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে। পরে একটি কুষ্ঠাশ্রমও স্থাপিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই বহু কারণে মিশনরিগণের কর্মসূচী শ্লথ হইতে বাধ্য হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মিশনরিগণের প্রয়াস সত্ত্বেও বর্ধমানে ব্যাপক ধর্মান্তর হয় নাই।

উচ্চ বর্ণের হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর খৃষ্টের বাণী বিশেষ রেখাপাত করিতে পারে নাই। যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বর্ণহিন্দু খৃষ্ট ধর্ম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ধর্মান্তরিতের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের অনেকেই আবার অবস্থার গতিকে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। শোনা যায় যে কোন কোন মিশনরী পরিচালিত চিকিৎসা-কেন্দ্রে, বিশেষতঃ কুষ্ঠাশ্রমে, খৃষ্টান ভিন্ন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের চিকিৎসার বিধান ছিল না। খৃষ্ট ধর্ম যে সাধারণের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় হয় নাই, তাহা এই ধর্মাবলম্বিগণের বর্তমান নগণ্য সংখ্যা হইতেই প্রকাশ পায়। তারপর সরকারি উদ্যোগে ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের বা স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল গড়িয়া ওঠে, ফলে মিশনরিগণ আর এই সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের একমাত্র অংশীদার হইয়া থাকিলেন না ও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইল। এদিকে বিদেশের যে সকল কেন্দ্র হইতে তাঁহারা অর্থ সাহায্য পাইতেন, তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইল, কোথায়ও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে দেশে আসিল এক নব জাগরণের হিল্লোল এবং ইহার স্পর্শে বৈদেশিক প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িল।

মিশনরিগণ কিন্তু এক সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। নূতন চিন্তা ও কর্মধারার বাহক হিসাবে তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছেন; নানাবিধ লোকহিতকর কার্যে ব্রতী থাকিয়া তাঁহারা সাধারণের

হৃদয় জয় করিয়াছেন। আসানসোল অঞ্চলের কুষ্ঠাশ্রম এবং মানকর ও কালনার চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতাল, বহু পুরাতন শিক্ষা-কেন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের মানব ধর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। জন-সাধারণকে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে হয় তো তাঁহারা বিফল হইয়াছেন, কিন্তু এই ধর্মের মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বহু কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

পরিশিষ্ট—৫

বিশিষ্ট পাকা রাজপথ সমূহ

	রাজপথের নাম	জিলার মধ্যে দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
১।	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড	৯৮ মাইল	দেবীপুর হইতে বরাকর পর্যন্ত
২।	বর্ধমান—কাটোয়া	৩৬ „	
৩।	বর্ধমান—কালনা	৩৩ „	
৪।	বুদবুদ—মানকর-গুসকরা	১৮ „	
৫।	গুসকরা—বলগোনা	১৫ „	
৬।	মেমারী—চকদীঘি	২৮ „	তারকেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত
৭।	পানাগড—ইলামবাজার	১৪ „	শিউরী ও বোলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত
৮।	কালনা—পাণ্ডুয়া	৪ „	
৯।	বর্ধমান—সেহারা বাজার—আরামবাগ	১৬ „	
১০।	সগরাই—রায়না	৯ „	
১১।	মেমারী—মন্তেশ্বর	২০ „	
১২।	কালনা—পূর্বস্থলী-কাটোয়া	৩০ „	
১৩।	সমুদ্র গড—নাদনঘাট	৬ „	
১৪।	নূতনহাট—মূরতিপুর	৫ „	
১৫।	পানাগড়—রণডিহা	৪ „	
১৬।	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—দুর্গাপুর ব্যারাজ	৩ „	বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত
১৭।	রাজবাঁধ—গোপালপুর—রাঢ়েশ্বর	৩ „	
১৮।	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—মালান দীঘি—অজয়	১১ „	

	রাজপথের নাম	জিলার মধ্যে দৈর্ঘ্য
১৯।	রাণীগঞ্জ—পাণ্ডবেশ্বর	১২ মাইল
২০।	আসানসোল—দোমোহানি—গৌরাঙ্গডি	১২ "
২১।	রাণীগঞ্জ—দোমোহানি	৯
২২।	অণ্ডাল—বনবাহাল	১০ "
২৩।	নিয়ামতপুর—সালানপুর—রূপনারায়ণপুর	৮ মাইল
২৪।	আচরা—পানুরিয়া	৬ "
২৫।	রাধানগর—সাকতোরিয়া	৩ "
২৬।	সীতারামপুর—সামদি	৪ "
২৭।	ইথোরা—ধাদকা	৬ "
২৮।	আসানসোল—ধাদকা	২ "
২৯।	রূপনারায়ণপুর—সামদি	৩ "
৩০।	অণ্ডাল—উখরা	৬ "
৩১।	জামুরিয়া—নিঙ্গা	৪ "
৩২।	বরাকর—রূপনারায়ণপুর-চিত্তরঞ্জন	৯ "
৩৩।	পাঁচগাছিয়া—পানুরিয়া	১০ "
৩৪।	আসানসোল—রাধানগর	৫ "
৩৫।	ভিরিঙ্গি (দুর্গাপুর স্টীল)—নাচন	৪ "
৩৬।	দোমোহানি—চুরুলিয়া	৪ "
৩৭।	জামুরিয়া—ইকরা—ডোবরাণা	৫ "
৩৮।	ইথোরা—লালগঞ্জ	২ "
৩৯।	কাজোরা—হরিপুর	৩ "
৪০।	আসানসোল—বার্ণপুর—দামোদর	৪ "
৪১।	আসানসোল—কন্যাপুর	৪ "
৪২।	রাণীগঞ্জ—দামোদর	৩ "
৪৩।	বর্ধমান—বড় বেলুন	৮ "

পরিশিষ্ট—৬

বিশিষ্ট মেলার পরিচয়

মহকুমা	থানা	মেলার স্থান	পরিচয়	লোক-সমাগম
বর্ধমান সদর	বর্ধমান	নবাবহাট	শিবরাত্রির মেলা	প্রায় ১০,০০০
	"	সদরঘাট	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	" ৫,০০০
	"	কুড়মুন	চড়কের গাজন	" ৮,০০০
	মেমারী	বোহার	পীর গদাই সাহেবের মেলা	" ১০,০০০
	"	কেজা	মনসার ঝাঁপান	" ৮,০০০
	"	ছোট খণ্ড	মনসার ঝাঁপান	" ১৫,০০০
	জামালপুর	জোগ্রাম	শিবরাত্রির মেলা	" ৫,০০০
	রায়না	দামূন্যা	কল্পতরু "	" ৬,০০০
কালনা	পূর্বস্থলী	জামালপুর	বুড়োরাজের গাজন	" ১০,০০০
	"	"	শিবরাত্রির মেলা	" ঐ
	মন্তেশ্বর	রাইগ্রাম	পীর গোরাচাঁদের মেলা	" ৫,০০০
	"	ইছু ভাগরা	গাজন মেলা	" ঐ
কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া	কার্তিক মেলা	" ১০,০০০
	কেতুগ্রাম	উধারণপুর	পৌষ সংক্রান্তি	" ১৫,০০০
	"	দক্ষিণ ডিহি	রটন্তি মেলা	" ৮,০০০
	"	দধিয়া	বৈরাগীতলা মেলা	" ২৫,০০০
	"	নৈহাটি	গাজন মেলা	" ঐ
	মঙ্গল কোট	খারিজা ক্ষীরগ্রাম	ক্ষীরগ্রাম মেলা	" ৫,০০০
	"	ক্ষীরগ্রাম	যোগাদ্যা মেলা	" ৮,০০০
আসানসোল	জামুরিয়া	বানালি	রামরাজা মেলা	" ৫,০০০
	"	"	কেন্দুলি মেলা	" ঐ
	রাণীগঞ্জ	নারায়ণ বাড়ী	ধর্মরাজ মেলা	" ঐ

মহকুমা	থানা	মেলার স্থান	পরিচয়	প্রায় লোক সমাগম
আসানসোল	রাণীগঞ্জ	রোনাই	পীর সাহেবের মেলা	প্রায় ৮,০০০
	অণ্ডাল	উখরা	রথযাত্রা মেলা	„ ৮,০০০
	„	„	ঝুলন মেলা	„ ঐ
	„	কাজোরাগ্রাম	গাজন মেলা	„ ৫,০০০
	কুলটি	বরাকর	শিবরাত্রি মেলা	„ ৬,০০০
	„	কল্যাণেশ্বরী	সরস্বতী মেলা	„ ৬,০০০
	„	পল্টন ডাঙ্গা	পৌষ সংক্রান্তি মেলা	„ ঐ
	বরাবনি	দোমোহানি	গোশালা মেলা	„ ৫,০০০

পরিশিষ্ট—৭

চাউল কলের তালিকা

ক। বর্ধমান সদর মহকুমা

সর্বমঙ্গলা	রাইস মিল	বাবুর বাগ	বর্ধমান
নিউ	„	আলমগঞ্জ	„
জেশোরিয়া	„		„
ভুবনেশ্বর	„	„	„
ঈশ্বরী	„	„	„
শম্ভুনাথ	„	„	„
মহাবীর	„	„	„
নিত্যকালী	„	মতিবাগ	„
মহালক্ষ্মী	„	আলমগঞ্জ	„
বিজয়	„	„	„
শ্রীহরি	„	সদর ঘাট	„
শ্রীধর	„	সরাই টিকর	„
ভারতলক্ষ্মী	„	ভাতশালা	„
শ্রীগোবিন্দ	„	আলমগঞ্জ	„
শ্রীগনেশ	„	কেশবগঞ্জ চটি	„
হনুমান	„	বাজে প্রতাপপুর	„

হরকালী	রাইস মিল	থাজাআনোয়ার বেড়	বর্ধমান
			"
ক্ষেত্রনাথ	"	ভাতশালা	"
মণীন্দ্র	রাইস ও অয়েল মিল	দেওয়ান দীঘি	"
শ্রীগুরু	রাইস মিল	সদর ঘাট রোড	"
শ্রীগৌরী—শঙ্কর	"	কাটোয়া রোড	"
যতীন্দ্রমোহন	"	ইছলাবাদ	"
কমলা	"	আলমগঞ্জ	"
নীলকণ্ঠ	"	"	"
হরগৌরী	রাইস মিল	হটু দেওয়ান	"
শ্রীদুর্গা	"	সদর ঘাট	"
শ্রীবিষ্ণু	"	"	"
শ্রীজয় দুর্গা	"	হটু দেওয়ান	"
শ্রীদুর্গা	ফার্ম ও রাইস মিল	মেমারী	
জিলানি	রাইস মিল	"	
মহামায়া	"	"	
বাসন্তী	"	রসুলপুর	
জনার্দন	"	গুসকরা	
লক্ষ্মীনারায়ণ	"	"	
শ্রীজগদ্ধাত্রী	"	"	
রাজলক্ষ্মী	"	"	
শ্রীঅন্নপূর্ণা	"	"	
শ্রীবিশ্বনাথ	"	"	
ভারত মাতা	"	"	
গুসকরা	"	"	
দত্ত	"	উরো, খানো	
বাজাজ ইনডাসট্রীজ		মানকর	
শ্রীশঙ্কর	"	"	

শ্রীদুর্গা	রাইস মিল	গলিগ্রাম, গলসি	
শক্তিগড়	„	শক্তিগড়	
আনন্দময়ী	„	„	
শ্রীশক্তি	„	„	
নন্দরানী	„	„	
ধরণীধর	„	খানা জংশন	
অন্নপূর্ণা	„	ভেদিয়া	
বঙ্গশ্রী	„	„	
লক্ষ্মীজনার্দন	„	„	
বিনোদিনী	„	সুরে কালনা	
শ্রীলক্ষ্মী	„	জামালপুর	
বেঙ্গল	„	পুরসা	বর্ধমান
মহামায়া	„	নেকড়াই চণ্ডী	
বলগোনা	„	বলগোনা	
শ্রীলক্ষ্মী	„	বড় বেলগোনা	

খ। কালনা মহকুমা

পুরাতন হাট	রাইস মিল	নিভুজিবাজার	কালনা
লক্ষ্মীজনার্দন	„	„	
ছোট দেউরী	„	কালনা	
একপেরিয়া	„	„	
কালিতারা	„	„	
নিভুজি	„	„	
শ্রীমহাবীর	„	„	
সরস্বতী	„	„	
ওয়েষ্ট বেঙ্গল	„	বারুই পাড়া „	
শ্রীধর	„	„ „	
শ্রীরামপুর	„	শ্রীরামপুর	
এ, কে	„	পুরাতন হাট „	
দে, শেঠ কোং	রাইস মিল	নিভুজি বাজার	কালনা
অম্বিকা	„	„ „	„

ভাগ্যলক্ষ্মী	রাইস মিল	সাহাজাদপুর,	নাদনঘাট
সিংহ	"		"
ভৈদর পাড়া	"	ভৈদর পাড়া	"

গ। কাটোয়া মহকুমা

শ্রীসত্যনারায়ণ	রাইস মিল	ঘোঘাট	কাটোয়া
কমলা	"		"
বিহারী	"	"	"
বেঙ্গল	"		"
হেমরাজ	রাইস মিল		"
অন্নপূর্ণা	"		"
বুদ্ধদেব	"		"
সুরেন্দ্র	"	কৈচর	

ঘ। আসানসোল মহকুমা

শ্রীকল্যাণেশ্বরী	অয়েল ও রাইস মিল	সীতারামপুর
মহাদেওলাল রামনিবাস	"	রাণীগঞ্জ
শ্রীঅন্নপূর্ণা	"	দুর্গাপুর
শ্রীঅন্নপূর্ণা ইনডাস্ট্রীজ	"	রাণীগঞ্জ

পরিশিষ্ট—৮

পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান

জিলার বহুস্থানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পূর্তকীর্তি ও স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির পরিচয় মহকুমা ভিত্তিতে প্রদত্ত হইল।

ক। আসানসোল মহকুমা ঃ

১। **বরাকরের মন্দির**—মন্দির-সংখ্যা চারটি। এগুলি ভিন্ন আরও একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ অনতিদূরে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ

প্রত্নতাত্ত্বিক বেগলার (J. D. Beglar) সাহেবের মতে মন্দিরগুলির মধ্যে যেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহা বহু প্রাচীন, ষষ্ঠ-সপ্তম খৃষ্টাব্দেরও হইতে পারে। তিনি মনে করেন যে অন্য মন্দিরগুলির মধ্যে দুইটি মন্দিরের সহিত পুরুলিয়ার দামোদর তীরস্থ তেলকুপি মন্দিরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তেলকুপির মন্দির জৈন প্রভাবান্বিত। সুতরাং এই দুইটিও জৈনযুগের বলা হয়। তাহাদের একটিতে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে যে লিপি খোদিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম হরিশ্চন্দ্র। অন্য দুইটি মন্দিরের একটিতে আছে শায়িত মৎস্যমূর্তি আর তাহাতে স্থাপিত পাঁচটি শিবলিঙ্গ। অপরটিতে আছে শিবলিঙ্গ ও তৎসহ গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। কারুকার্যে ও গঠনভঙ্গিতে এই মন্দিরটির নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য আছে।

২। **কল্যাণেশ্বরীর মন্দির**—কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থানের অবস্থান বরাকরের পাঁচ মাইল উত্তরে বরাকর নদের বামতীরে। বর্তমানে মাইথনে বরাকরের উপর যে দৃঢ় বাঁধ বা ড্যাম নির্মিত হইয়াছে তাহা কল্যাণেশ্বরীর সংলগ্ন। কল্যাণেশ্বরীতে আছে সারি সারি তিনটি মন্দির, সবগুলিই পূর্বমুখী। প্রধান মন্দিরটির মধ্যে স্থাপিত দেবী কল্যাণেশ্বরীর বিগ্রহ। দেবীর মূর্তি পশ্চিমাস্য—পিছন দিকে মুখ। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে যে কোনও পুরোহিত কন্যা সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রদীপ দান করিবার সময় দেবী ভুল করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করেন ও তাহার পর হইতে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া থাকেন। এই কাহিনী প্রাচীন কালে দেবীর সম্মুখে যে নরবলি হইত, তাহারই স্মারক বলিয়া মনে হয়।

মন্দিরগুলির দুইটিতে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে যে লিপি খোদিত আছে তাহা হইতে মাত্র দুইটি কথা জানা যায়,—রাজা ও কল্যাণকোট। মনে হয় স্থানটির পূর্ব নাম ছিল কল্যাণকোট। দেবীর বিগ্রহে বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে—"শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরী-চরণ-পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্ম্মা"।

৩। **ডিহি সেরগড় বা ডিসেরগড়**—ডিসেরগড়ের অবস্থান দামোদর ও বরাকরের সংযোগস্থলে। বর্তমানে ডিসেরগড় একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র কিন্তু পূর্বে ইহা ছিল একটি দুর্গ ও ডিসেরগড়

পরগণার কেন্দ্রস্থল। দুর্গ ছিল মাটির, বর্তমানে তাহার চিহ্ন নাই। দুর্গ প্রথম নির্মাণ করেন পঞ্চকোট রাজগণ। মুসলমান যুগে যখন এই অঞ্চল বিজিত হয়, পঞ্চকোট শক্তির বিরুদ্ধে দুর্গ সুদৃঢ় করা হয় ও পরে রাজস্ব কেন্দ্র হিসাবে নামকরণ হয় ডিহি সেরগড়।

২। **চুরুলিয়ার দুর্গ**—কাজি নজরুল ইসলামের পল্লী চুরুলিয়া বরাবনি হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ "রাজা নরোত্তমের গড়" নামে পরিচিত। রাজা নরোত্তমের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না তবে মনে হয় তাঁহার সময় মুসলমান বিজয়ের পূর্বেকার। ওল্ডহাম (Oldham) সাহেবের মতে দুর্গটি প্রথম নির্মাণ করেন পঞ্চকোটরাজগণ।

৫। **পাণ্ডবেশ্বর**—পাণ্ডবেশ্বরের অবস্থান অজয় নদের উপর। রাণীগঞ্জ হইতে রাণীগঞ্জ-সিউড়ি রাস্তা বরাবর পাণ্ডবেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। নদীতীরে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকারের শিব মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় এইস্থানে কিছুকাল যাপন করেন ও পাঁচটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরগুলি খুব পুরাতন মনে হয় না। অণ্ডাল হইতেও পাণ্ডবেশ্বর যাওয়া যায়।

৬। **কাঁকসা**—পানাগড়ের অদূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বেই কাঁকসা। অমরার গড়ের সদ্গোপ রাজগণের একটি শাখা কাঁকসায় রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কাঁকসায় মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়। সদ্গোপরাজগণ-নির্মিত কঙ্কেশ্বর গড়ের চিহ্ন, শিবমন্দির ও গড়ের সংলগ্ন "রাজার মসজিদ" নামে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

৭। **রাজগড়**—রাজগড়ের অবস্থান পানাগড়-ইলামবাজার রাস্তার উপরে তিলকচন্দ্রপুরে। বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই গড়টির নির্মাতা। সিউড়ি-ইলামবাজার—বিষ্ণুপুর রাস্তার উপর গড়টির অবস্থান তৎকালে বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গড়ের বাহিরের ও ভিতরের মনোরম কারুকার্য ভগ্নাবস্থায় হইলেও আকর্ষণীয়।

৮। **সিলিমপুর—বারাখাঁ গাজির সমাধি**—বারাখাঁ বাদশাহ সাজাহানের সময় এই অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহত

হন ও তাঁহার সমাধি প্রথম হইতেই পীরস্থানে পরিণত হইয়া হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা অর্জন করে।

৯। **শ্যামারূপার গড়**—ইহার প্রাচীন নাম ছিল ঢেকুর। ঢেকুর ছিল ইছাই ঘোষের রাজধানী। ইছাই ঘোষের আরাধ্যা দেবী শ্যামারূপা-ভবানীর নামানুসারে স্থানটির পরিচয় হয় শ্যামরূপার গড়। ইহার অবস্থান দুর্গাপুর-মালানদীঘি অজয় রাস্তাটির উপর বিষ্ণুপুরে অরণ্যময় পরিবেশে। রাস্তা হইতে শ্যামারূপার গড় প্রায় দুই মাইল পূর্বে। এখানে যে একসময় একটি দুর্গ ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু শ্যামারূপার বর্তমান মন্দির পুরাতন বলিয়া মনে হয় না।

১০। **গৌরাঙ্গপুর—ইছাই ঘোষের দেউল**—শ্যামারূপার গড়ের প্রায় দুই মাইল পূর্বে গৌরাঙ্গপুর, অজয় নদের তীরে। এখানকার রেখ দেউলটি প্রাচীন। ঢেকুরের মহামাণ্ডলিক ইছাই ঘোষ ইহার নির্মাতা। দেউলটির গঠন ও স্থাপত্য মনোরম ও ভাবগম্ভীর। দেউলের মধ্যে কোনও বিগ্রহ নাই।

১১। **আররা—রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির**—রাজবাঁধ হইতে যে রাস্তা গোপালপুর হইয়া আরবা গ্রামে দুর্গাপুর-মালানদীঘি রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উপরে ও দুই রাস্তার সংযোগ স্থলের নিকটেই প্রস্তর নির্মিত রাঢেশ্বর অথবা কালেশ্বর শিব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি অতি প্রাচীন; ইহার স্থাপত্য কলাও মনোরম। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে মন্দির নির্মিত হয় মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়; আবার কাহারও মতে ইহা অমরারগড়ের সদ্‌গোপ রাজগণের কীর্তি।

খ। বর্ধমান সদর মহকুমাঃ

১। **বর্ধমান**—প্রাচীন ও মধ্য যুগের বহু স্থাপত্য নিদর্শন বর্ধমান শহর ও তাহার উপকণ্ঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) সের আফগান ও কুতবদ্দিনের সমাধি, আলমগঞ্জ (ইং ১৬০৬ সাল)

(২) পীর বাহারণ সাক্কার সমাধি, আলমগঞ্জ। পীর বাহারণ সাহেব তাব্রিজের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের

দার্শনিক। বর্ধমানে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি এই স্থানেই পরলোক গমন করেন (ইং ১৫৬২ সাল)।

(৩) খাজা আনওয়ার সাহেবের সমাধি—খাজা আনওয়ার বেড়। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। বর্ধমান শহরের নিকটই তিনি যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার সমাধি নির্মাণ করেন বাদশাহ্ ফরুকসের (ইং ১৭১৫ সাল)

(৪) কৃষ্ণ সাগর—এই সুবৃহৎ জলাশয়টি প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমানপতি রাজা কৃষ্ণরাম রায় (ইং সপ্তদশ শতাব্দী)

(৫) রাণীসাগর—বর্ধমান শহরের আর একটি বৃহৎ জলাশয় রাণীসাগর প্রতিষ্ঠা করেন রাণী ব্রজকিশোরী (ইং ১৭০৯ সাল)।

(৬) নবাবহাট—১০৮ শিব মন্দির। মন্দিরগুলির অবস্থান বর্ধমান-তালিত রাস্তার উপর একটি প্রশস্ত সমকোণ ভূমির উপর মনোরম পরিবেশে। মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন মহারাণী বিষ্ণুকুমারী (ইং ১৭৮৮ সাল)

(৭) জুম্মা মসজিদ—বর্ধমান পুরাতন চক মহল্লায় অবস্থিত বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ হইতেছে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-সানের কীর্তি। শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমনেব জন্য তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হন।

(৮) তালিতগড়—গড়টি প্রাচীন। ইহার অবস্থান বর্ধমান তালিত-রাস্তার উপর প্রায় দুই মাইল ব্যাপিয়া চক্রাকারে। গড়ের মধ্যভাগ বর্তমানে লোকের বসতিতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু দুর্গ প্রাকার ও চতুর্দিকের পরিখার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্ধমান রাজ পরিবার এই গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(৯) কাঞ্চননগর—বর্ধমানের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগর বহু পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির স্মৃতি বহন করিতেছে। এখানে জোর বাংলা পদ্ধতির যে মন্দির আছে তাহার কারুকার্য ও স্থাপত্য অতি উচ্চ পর্যায়ের। কঙ্কালরূপী দেবী ভগবতীর প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন একটি মূর্তি এখানে পাওয়া গিয়াছে, ইহার ভাস্কর্য ও শিল্পচাতুর্য মনোরম।

২। **কোট শিমুল**—ইহার অবস্থান দামোদরের কাকি নামক প্রবাহের উপর। একটি পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখানে দৃষ্ট হয়।

৩। **কুলিন গ্রাম**—স্থানটি অতি প্রাচীন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মালাধর বসু কুলিন গ্রামকে ধন্য করিয়াছেন (ইং পঞ্চদশ শতাব্দী)। কিন্তু মালাধর বসুর পূর্বেই কুলিনগ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিবানী দেবীর মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয় ৯৬৩ শকে অর্থাৎ ১০৪১ খৃষ্টাব্দে। গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মিত হয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাহা ছাড়া আরও বহু পুরাতন কীর্তির মধ্যে আছে রামানন্দ ঠাকুরের গড়, গোপীনাথের মন্দির ও মদন গোপালের মন্দির।

৪। **দেউলের মন্দির**—মন্দিরটির অবস্থান মেমারী থানার দেউলে গ্রামে। দেউলে দামোদর নদ হইতে বেশী দূর নহে। এই মন্দির অতি প্রাচীন এবং কেহ কেহ ইহাকে পুরুলিয়া জিলার পারার মন্দির, বাঁকুড়ার বাহুলাড়া মন্দির ও ২৪ পরগণার জটার দেউলের সহিত তুলনা করেন। দেউলে এক প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে।

৫। **কসবা চম্পাই নগরী**—দামোদর তীরের এই স্থানটি চাঁদ সদাগরের স্মৃতি বহন করে। কয়েকটি মাটির ঢিবি, প্রত্যেকটি প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত, চাঁদ সদাগরের প্রাসাদ ও নিকটস্থ ক্ষুদ্রকায় ঢিবি সাঁতালি পর্বত বলিয়া পরিচিত। ঢিবিগুলির শীর্ষদেশে পাথর ও ইট পুরাতন ইমারতের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান। ঢিবিগুলির মধ্যে কোনও ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে কিনা জানা যায় না।

৬। **অমরার গড়**—সদ্গোপ রাজগণের রাজধানী অমরারগড়ের অবস্থান মানকরের সন্নিকট। নগরটি ছিল সুরক্ষিত; প্রাকার ও পরিখা পরিবেষ্টিত। প্রাকার ও পরিখার চিহ্ন এখনও বর্তমান। সদ্গোপ রাজগণের আরাধ্যা দেবী শিবাক্ষার মন্দির এখানে অবস্থিত। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ভল্লুপাদ (দশম খৃষ্টাব্দ)।

গ। কালনা মহকুমা :

১। **রাইগ্রামের বিষ্ণু মন্দির**—মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও সুহৃৎ মহাসামন্ত চূড়ামণি বটুক দাস আদি-বরাহরূপধারী বিষ্ণুর একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমান অধিকারের প্রথম দিকে এই মন্দির বিধ্বস্ত

হয়। মন্দিরের শেষ চিহ্ন স্বরূপ আছে এক বিরাট স্তুপও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট ও প্রস্তরখণ্ড। আদি বরাহের স্থান অধিকার করিয়াছেন পীর গোরাচাঁদ।

২। **অম্বিকা কালনা**—কালনার অবস্থান ভাগীরথী তীরে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অম্বিকা। অম্বিকা দেবীর মন্দির এখানে আছে। অনেকের বিশ্বাস যে এই অম্বিকা আদিতে ছিলেন কোনও জৈন দেবতা। মধ্যযুগের স্থাপত্য কলা ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন আছে কালনায় এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে মজলিশ সাহেব ও বদর সাহেবের সমাধি প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের। কালনার বড় মসজিদও অতি প্রাচীন। হিন্দু ভাস্কর্যের চিহ্ন এই মসজিদে দেখা যায়। এগুলি ভিন্ন আছে বর্ধমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত সমাজ বাড়ী, শিবমন্দির, লালজি বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি।

৩। **বৈদ্যপুরের দেউল**—ইহার স্থাপত্যকলা বহু পুরাতন। দেউল কোন্ সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ঘ। কাটোয়া মহকুমা:

১। **অগ্রদ্বীপ**—অগ্রদ্বীপ ভাগীরথী তীরে। এখানকার ভাগীরথী প্রবাহ কাশীধামের গঙ্গার ন্যায় পূতসলিলা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার উজ্জয়িনী প্রাসাদ হইতে প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে অবগাহন স্নান করিতে আসিতেন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দির বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক গোবিন্দ ঘোষ এই মন্দির নির্মাণ করিয়া গোপীনাথ দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

২। **দাঁইহাট**—ইহার অবস্থানও ভাগীরথী তীরে। বর্তমানে ভাগীরথী প্রবাহ কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্ধমান রাজ-পরিবারের আবু রায় হইতে জগতরাম রায় পর্যন্ত সকলেরই দেহাবশেষ দাঁইহাটের সমাজ-বাড়ীতে রক্ষিত আছে। এখানে যে বদর সাহেবের দরগা আছে তাঁহার প্রবেশ তোরণে প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুমান হয় যে কোনও হিন্দু মন্দির হইতে তাহা অপসারিত হইয়াছিল।

৩। **কাটোয়া**—ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাটোয়া প্রাচীন স্থান। কাটোয়ায় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস হয়। অজয় নদ যেখানে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে, তাহার অদূরেই ছিল কাটোয়ার দুর্গ। মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত নবাব আলিবরদি খাঁ নিরাপত্তার জন্য এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় এই দুর্গ ইংরেজ বাহিনীর মূল শিবিররূপে ব্যবহার করা হয়। মুরশিদ কুলিখাঁ যখন বাংলার নবাব হন, তিনি কাটোয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ; তাহা এখনও বর্তমান।

৪। **ক্ষীরগ্রাম**—মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম একটি পীঠস্থান, দেবী যোগাদ্যা। দেবীর মূর্তি প্রস্তর নির্মিত। সারা বৎসর এই মূর্তি নিকটস্থ ক্ষীর দীঘির জলে নিমগ্ন থাকে, বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে জল হইতে উঠাইয়া পূজা করা হয়। এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে পুরাকালে পাতালবাসী মহিরাবণ ইঁহাকে পূজা করিতেন। দেবীর নাম ছিল ভদ্রকালী। পরে হনুমান যখন পাতালপুরী প্রবেশ করিয়া মহিরাবণকে বধ করেন ও রামলক্ষ্মণকে উদ্ধার করিয়া আনেন, ভদ্রকালী মূর্তিও তিনি লইয়া আসেন ও পথিমধ্যে দেবীকে ক্ষীরগ্রামে রাখিয়া যান। যোগাদ্যার সম্মুখে পূর্বে নরবলি দেওয়া হইত বলিয়া কথিত আছে। ক্ষীরগ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে।

৫। **মঙ্গলকোট**—মঙ্গলকোটের সহিত শ্রীমন্ত সদাগরের মঙ্গলচণ্ডীর সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। স্থানটি যে অতি প্রাচীন, ইষ্টকমিশ্রিত মাটির স্তূপের শ্রেণীই তাহা প্রমাণ করে। পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চলে মুসলমান অভিযানের প্রবেশপথ ছিল মঙ্গলকোট। মুসলমান অধিকারের পূর্বে এখানে হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিক্রমজিৎ ও চন্দ্রসেনের নাম জানা যায়। সুলতান হুসেন শাহ নির্মিত একটি মসজিদে চন্দ্রসেনের নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। মুসলমান যুগের বহু পূর্তকীর্তি মঙ্গলকোটে বর্তমান। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন তিনটি ভগ্ন মসজিদ ; একটি নির্মিত হয় সুলতান হুসেন শাহের সময় (হিজরি ৯১৫, ইং ১৫০৫-৬ সাল), অপর একটি তাঁহার পুত্র নসরত শাহের আমলে (হিজরি ৯৩০, ইং ১৫১৯-২০ সাল) ও

তৃতীয়টি বাদশাহ শাজাহানের সময় (হিজরি ১০৬৫, ইং ১৬৫৪-৫৫ সাল)। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক পীর দানেশ মন্দের সমাধি এখানে আছে। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কীর্তির মধ্যে আছে গোলাম পাঞ্জাতনের সমাধি ও কোরা সাহেবের মসজিদ।

৬। **কোগ্রাম উজানী**—ইহার অবস্থান মঙ্গলকোটের অদূরে কুনুর ও অজয়ের সঙ্গম স্থলে। ইহা একটি পীঠস্থান, দেবী মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অনুসারে উজানী শ্রীমন্ত সদাগরের পিতৃভূমি। মনসা মঙ্গলেও উজানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন উজানী এখন অজয় গর্ভে কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণ এখনও চণ্ডীমঙ্গলোক্ত ভ্রমরদহ ও শ্রীমন্ত ডাঙ্গা দেখাইয়া দেয়। কোগ্রাম বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের জন্মস্থান; তাঁহার সমাধিও এখানে আছে।

৭। **কেতুগ্রাম**—কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা; অন্য একটি পীঠস্থান। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের। ইহার বামে শক্তিধর কার্তিক ও দক্ষিণে গণেশ। প্রবাদ আছে যে চন্দ্রকেতু নামে কোনও রাজা এই দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবৎসর মহানবমীতে এই দেবীর মহাপূজা হয়।

৮। **অট্টহাস বা ফুল্লরা**—কেতুগ্রাম থানার দক্ষিণ ডিহির নিকটবর্তী অট্টহাস আর একটি পীঠস্থান, দেবীর নাম ফুল্লরা। বর্তমানে দেবী মূর্তি নাই কিন্তু মন্দির আছে। প্রতিবৎসর মহাষ্টমীর সময় দেবীর পূজা হয়।

৯। **বিশ্বেশ্বর**—কেতুগ্রাম থানার বিশ্বেশ্বর গ্রামে বিশ্বেশ্বর শিব অবস্থিত। বিশ্বেশ্বর অট্টহাসের ফুল্লরার ভৈরব। এখানকার শিবমন্দিরটি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রতিবৎসর কৃষ্ণাচতুর্দশীর শিবরাত্রির সময় এখানে বিরাট মেলা হয়।

পরিশিষ্ট ৯

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক-পরিচয়

পাণ্ডুরাজার ঢিবি—কলিকাতা হইতে ১৩০ মাইল দূরে অজয়নদের উপর আসানসোল মহকুমায়। অণ্ডাল ষ্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল রামনগর ও গোঁসাইখণ্ড হইয়া কিছুদূরে পাণ্ডবেশ্বর। সেখানে ৬টি শিব মন্দির, নিকটে প্রকাণ্ড উচু ঢিবি। এখানে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন মিলিয়াছে। তিনটি স্তরে তিন যুগের সভ্যতা। প্রথম স্তরে ১০০০ খ্রীঃ পূঃ—১২০০ খৃঃ পূঃ, অধিবাসীরা স্থান পরিবর্তন করে। দ্বিতীয় স্তরে অগ্নিকাণ্ড, তৃতীয় স্তরে ব্যাপক প্লাবনের চিহ্ন। ১০টি নরকংকাল পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রথম স্তরেই একটি দীর্ঘ দেওয়াল, পোড়া ইটের ভিত্তি প্রস্তর, লালকালো রঙে চিত্রিত মৃৎপাত্র, ঝুঁটওয়ালা ষাঁড়ের পোড়ামাটীর মূর্তি, তামার বালা, ষ্ট্যাণ্ড-যুক্ত পুষ্পপাত্র জাতীয় পাত্র ও কতকগুলি উপরত্ন পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু হইল একটি ৫০ পয়সার চেয়েও ছোট, অথচ তাহার চেয়ে পুরু খড়ি পাথরের সীল, তাহাতে—জল, মাছ ও শিরস্ত্রাণ একই সারিতে অংকিত। স্যার মাইকেল রিড্‌লি বলেন, এইগুলি চিত্রলিপি এবং A E T E A এই অক্ষরগুলির সূচক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক A. L. Basham নিজে সীলটি পরীক্ষা করিয়া এই মত সমর্থন করেন। বর্তমানে এটি পশ্চিমবংগের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে রক্ষিত আছে। উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের মতে সীলটি দ্বারা প্রমাণিত হয় খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসর কি আরো পূর্বে ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীদের সহিত অজয় অঞ্চলের জলপথে যোগাযোগ ছিল এবং লেখাগুলি বিশ শতকের প্রথম দিকে আবিষ্কৃত "Linear A" লিপির সমগোত্রীয়। প্রথমস্তরের ভস্মের রেডিও-কার্বন পরীক্ষা করিয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, এগুলি অন্ততঃ ১২০০ খৃঃ পূঃ এর নিদর্শন বটে। টাটা মৌল অনুসন্ধান সমিতির বিশেষজ্ঞগণ বলেন মধ্য ভারতের (তাম্রশ্মীয়) সভ্যতার বিস্তার এই পাণ্ডুরাজার ঢিবি পর্যন্ত হইয়াছিল। প্রসংগক্রমে পণ্ডিতেরা বলেন যে অজয়

গঙ্গার উপত্যকা ধরিয়া কাটোয়া পর্যন্ত Chalcolithic তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার চিহ্ন প্রচুর মিলিতে পারে।

শেষ স্তরে একটি লোহার বর্শাফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের ফিলিষ্টিন ও হিট্টিয় সভ্যতার সমগোত্রীয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে খনন কায সুরু হয়, এর পূর্বে পশ্চিমবংগের কোনখানে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন মিলে নাই।

বীরভানপুর—আসানসোল মহকুমায়। এখানে প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের মাঝামাঝি যুগের প্রাচীনতম ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ পাওয়া গিয়াছে। এগুলি গঠনে শিল্পচাতুর্যের অভাব। আনুষঙ্গিক অন্য কোন বস্তু ইহাদের সঙ্গে নাই। এখানে মৃত্তিকার ভূকালমাসমূলক (Geochronological) গবেষণা চলিতেছে।

দুর্গাপুর—বাং ১৩৪০ সালে এখানে খনন কাযের ফলে নিওলিথিক যুগের কুঠার ফলক, বাটালী, গদাফলক, পেষক ও স্থূল মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিনসেন্ট্ বল্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক পুর্বেই এখানে প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের বালিপাথরের আয়ুধ দেখিয়া দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথের, বিশেষতঃ পুর্বভারতের পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, তাহা অনুমান করিয়াছিলেন।

মশাগ্রাম—এখানে গুপ্তযুগের স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান।

মল্লসারুল—গল্সী থানার অধীন। এখানে পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া ১৯২৯ ইং সালে ডঃ সুরেশ্বর রায় ১০·৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৬·৫ ইঞ্চি চওড়া একখানি তাম্রশাসন পান। এখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিজয় সেনের তাম্র-শাসন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গতঃ ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন Epigraphia Indicaতে। লিপিটিতে বর্ধমানকে পুণ্যোত্তর জনপদ, সতত ধর্মক্রিয়া বর্ধমান এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কতকগুলি আঞ্চলিক নামের পরিচয় পাই, যথা, বীথী (মহকুমা বা পঞ্চায়েৎ ?) ভুক্তি (বিভাগ) বিষয় বা মণ্ডল (পরগণা) চতুরক (চৌকী)। কতকগুলি পদবীও আছে যথা, মহত্তর, তদানুক্রম, কার্ত্তাকৃতিক, উর্ণস্থানিক, হিরণ্যস্থদায়িক, মণ্ডলক, আবসনিক,

দেবদ্রোণী সাবন্ধ, ভোগপতিক, পুস্তলক, বিষয়পতি, অগ্রহারীণ ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কতকগুলি গ্রামের প্রাচীন নাম পাওয়া যায়:— গোধগ্রাম, (গোগাঁ), বক্কত্তক, (বাকতা) কোড্ডবীর (কোড়ুই), অধঃকরক (আদরা) কপিত্থবাটক (কইতারা, কৈচড) গণ্ডজ্জোটিকা (খাঁরজলি) শাল্মলিবাটক (শিমনাডা, শিমলন), বিন্ধ্যপুর (বিজুর), বটবল্লক (বডবেলুন), আম্রসর্ত্তা (আমগডে), মধুবাটক (মওডা) প্রভৃতি।

সিদ্ধলগ্রাম—পণ্ডিতেরা এটি বীরভূমে অবস্থিত বলেন। কেহ কেহ বর্ধমান জেলায় সিধলেগ্রাম, কেহ বা শীতলগ্রামকে সিদ্ধলগ্রাম বলেন। নিত্যধামগত শ্রীল হরিদাস দাস মহাশয় কৈচড ষ্টেশন (B. K. R.) এর নিকটবর্তী ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাটকেই সিদ্ধলগ্রাম বলেন। এই গ্রামে কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী দেবীর শিলামূর্তি আছে এবং ভট্ট ভবদেবের বংশীয় সাবর্ণ গোত্রীয় গোষ্ঠীপতি চৌধুরী মহাশয়ের নিবাস। দুইটি শিলালিপিতে এই গ্রামের উল্লেখ (১) ভোজবর্মের বেলার লিপি (১১শ শতক); সিদ্ধলগ্রামীয় সাবর্ণ গোত্রীয় রামদেব শর্মাকে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত উপ্যনিকাগ্রাম দান করা হয়। ইঁহার প্রপিতামহ পীতাম্বর শর্মা মধ্যদেশ হইতে উত্তররাঢ়ের এই গ্রামটিতে আসেন। (২) দ্বিতীয় লিপিটি ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে আছে। তাহাতে হরিবর্ম দেবের মন্ত্রী সাবর্ণ গোত্রীয় ভট্ট ভবদেবের বংশাবলীর পরিচয় আছে।

বর্ধমান—অষ্টম শতকে হরিকেল মণ্ডলের বৌদ্ধরাজা কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে বর্ধমানপুরের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার সহিত বর্তমান বর্ধমান নগরীর সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঢেকুর—কাঁকসা থানার গৌরঙ্গপুরের সন্নিকট। জঙ্গলে আবৃত শ্যামারূপার গড় প্রাচীন ঢেকুর, সদ্গোপরাজ ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের রাজধানী। এই ঈশ্বর ঘোষের একখানি ১১ শতকের তাম্রলিপি দিনাজপুরে রানী সাংকাইল থানার অন্তর্গত রায়গঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সোম ঘোষের পুত্র ঈশ্বর ঘোষ দুর্ধর সাহস, ইনি কান্তিতে চন্দ্রকেও জয় করিয়াছেন এবং নিজ শৌর্য্যে রিপুদের জয় করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ৫৪ প্রকারের কর্মচারীর পদবী তালিকা যথা:—রাজন্, রাজ্ঞী, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, কুমারামাত্য, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষ-

পাটনিক, মহাসর্বাধিকৃত, মহাসেনাপতি, মহাপাদমূলিক, মহাভোগপতি, মহাতন্ত্রাধিকৃত, মহাব্যুহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, মহাকায়স্থ, মহাবলাকোষ্ঠিক, দণ্ডপাণিক, কোট্টপতি, হট্টপতি, ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, ঐখিতাসনিক, মহাবলাধিকরণিক, মহাসামন্ত, মহাকটুক, ঠক্কুর, অঙ্গিকরণিক, অন্তঃপ্রতীহার, দণ্ডপাল, খণ্ডসাল, দুঃসাধ্যসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, তদানিযুক্তক, আভ্যন্তরিক, বামাগারিক, খড়্গগ্রাহ, শিরোরক্ষিক, বৃদ্ধধানুষ্ক, একসরক, খোল, দূত, গমাগমিক, লেখক, দূতপ্রৈষণিক, সানীয়াগারিক, মাণ্ডলিক, কর্মকর, গৌল্মিক, শৌল্কিক ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় প্রথমতঃ ইছাই ঘোষ মহামাণ্ডলিক বা সামন্তরাজা থাকিলেও শেষে তিনি বাহুবলে সামন্ত রাজাদের বশীভূত করিয়াছিলেন।

নৈহাটী—কাটোয়ার নিকটবর্তী কেতুগ্রাম থানার গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে ১২ শতকের বল্লাল সেনের তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে সেন বংশীয় রাজপুত্রেরা চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সদাচার দ্বারা বিখ্যাত যে রাঢ দেশ, তাহাকে অননুভূতপুর্ব প্রভাবে প্রভাবিত করেন এবং বিশ্বের লোককে অভয় বিতরণ পূর্বক বহুপ্রদ হইয়া কীর্তিমান হন।

তাম্রশাসনখানিতে নিকটবর্তী স্বল্পদক্ষিণ নামক বীথীতে অবস্থিত বাল্লহিট্‌ঠা গ্রাম আম্বায়িল্লা, খাণ্ডয়িল্লা (খারুলিয়া), নাড্‌ডিনা, জলসোথী ও ঘোড়ানন্দী নামক বাল্লহিট্‌ঠার চারি পার্শ্বের ৫ খানি গ্রামের নাম আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, আম্বয়িল্লা বর্তমান অম্বলগ্রাম, এবং ঘোড়ানন্দী মুরুন্দী গ্রাম। বাল্লহিট্‌ঠা বর্তমান বালুটে, নৈহাটীর ছয়মাইল উত্তরে বর্ধমান জেলার সীমায় অবস্থিত। তাম্রশাসনে বুঝা যায়, বল্লাল অর্ধনারীশ্বরের উপাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে সূর্যগ্রহণের সময় দানাদির প্রচলন ছিল, কেননা তাঁহার মাতা বিলাস দেবী ঐ বাল্লাহিট্‌ঠা গ্রামের সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে সূর্যগ্রহণের সময় গ্রামখানি দান করেন।

১২ শতকে ২৪ পরগণায় গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে প্রকাশ যে তিনি বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকস্থ বিড্ডারশাসন নামক গ্রাম সামবেদী বাৎস্য গোত্রীয় ব্যাসদেব শর্মাকে দান করেন। ১১ শতকে বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের লিপিতে প্রকাশ, তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী "খাস সম্ভোগ ভট্টবড়া" গ্রাম উদয়কর দেবশর্মাকে দেন।

বরাকর—পশ্চিম বর্ধমানে। বেগুনিয়া নামে কথিত দেউলে ১৩৮২

শকাব্দের অর্থাৎ ১৪৮৬ ইং সালের একটি এবং ১৪৬৮ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খৃঃ অব্দের আর একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। বেগ্‌লার মাহের ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় রিপোর্টে প্রথম, এবং ১৯০২-০৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে ডাঃ ব্লক এবং ১৯২২-২৩ সালের রিপোর্টে কে. এন্‌ দীক্ষিত এই শিলালিপি সম্পর্কে লেখেন। মন্দির সম্পর্কেও।

মন্দিরটি ক্রম-সূক্ষ্ম শুণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট, সেজন্য ইহার স্থানীয় নাম বেগুনিয়া মন্দির। দেউলগুলি শিবের এবং রেখ দেউল শ্রেণীর। আমলকটি 'কন্‌কেভ', উড়িষ্যার মত কন্‌ভেক্‌স্‌ নয়।

শিলালিপি হইতে সম্ভবতঃ গোপভূমের রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় মিলে। প্রথম লিপিটিতে আছে ১৩৮২ শকের ফাল্গুন শুক্লা অষ্টমীতে বুধবারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্যা হরিপ্রিয়া শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় লিপি বলে—নন্দ নামে সৎব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী মন্দিরটি সংস্কার করেন। প্রথম লিপিটির লেখার ছাঁদ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ, দ্বিতীয়টির ছাঁদ রঘুনন্দনের "ধর্মপূজাবিধি"র ন্যায়।

জান্নগর—নবদ্বীপের নিকটবর্তী। এখানে যে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাতে একদিকে চন্দ্রসেন নৃপতির নাম, অপরদিকে মৈথিল অক্ষরে কিছু লেখা আছে। প্রাচীন নাম জহ্নুনগর, কৃত্তিবাস ও নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম) উল্লেখ করিয়াছেন।

কালনা—ইহার পরেই প্রাচীনতায় কালনায় অবস্থিত তিনটি মস্‌জিদের শিলালিপি। গৌড়ের হাবসী সুলতান দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের আমলে প্রথমটি নির্মিত। তারিখ হিজরী ৮৯৫ বা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয়টি নির্মিত ৯৩৮ হিজরীতে বা ১৫৩৩ খৃঃ অঃ হুসেন শাহী বংশের হুসেন শাহের পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ তাঁহার সেনাধ্যক্ষ, ও অমাত্য উলুগ্‌ মস্‌দদ্‌ খাঁয়ের দ্বারা এটি তৈয়ারী করান। নাম মস্‌জিদ-ই-জামিয়া, তিনটি মস্‌জিদের মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড, এক কালে ৭।৮ শত পালকিতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা এখানে আসিয়া উপাসনা করিতেন। তৃতীয় মসজিদটি নির্মিত হয় ১৫৬০ খৃঃ অঃ। সুলতান আবুল মুজফ্‌ফর বাহাদুর শাহ উহা নির্মাণ করান। আরও দুইটি শিলালেখের উল্লেখ করিয়াছেন "ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব" নামক সরকারী পুস্তিকার ১৯৫৯ সালের সম্পাদকদ্বয়। ১৯৫৮ সালে সে দুইটি কলিকাতাস্থ ভারতীয় সংগ্রহালয়ে প্রেরিত হয়। একটি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ও

অপরটি হুসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ের। (৯৩৩ হিজরী বা ১৫২৬ খৃঃ)।

মঙ্গলকোট—এখানকার একটি শিলালিপি নূতন হাটের নিকট হুসেনশাহী মস্‌জিদে পাওয়া যায়। সেটিতে চন্দ্রসেনের নামোৎকীর্ণ শিলাফলক আছে। ইহা ৮ম হইতে ১২শ যে-কোন শতকের হইতে পারে। চন্দ্রসেনের বা চন্দ্রকেতুর নাম জান্নগর, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, চন্দ্রকেতুগড় বা বেরাচাঁপা—এতগুলি স্থানে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় লিপিটি হাজী দানিশ মন্দ বাঙালী সাহেবের—১০৬৫ হিজ্‌রী বা ১৬৫৪-৫৫ খৃঃ অব্দের। মহম্মদ শাহ্‌জাহান বাদ্‌শাহ গাজীর আমলে এটি লিখিত—লিপির সংবাদ এই।

বৈদ্যপুর, কুচুট—এই দুই প্রাচীন গ্রামের বিরাট পোড়ামাটির মূর্তি পরিপুর্ণ মন্দিরের লেখা পড়া যায় নাই। বৈদ্যপুরের পোড়ামাটীর মন্দির অনেকের মতে বৌদ্ধদের দেহারা। এখানে যেটুকু লেখা মন্দিরের দ্বারের উর্ধ্বে পড়া গিয়াছে, তাহাতে "শুভানন্দ পালেন…চ শকে ভগবৎপাদ সেবার্থং দেবকুলং বিনির্মিতং" এইটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে। এখানকার শিলাময় হরগৌরীমূর্তি বেশ প্রাচীন।

কুচুট কালেশ্বরের লক্ষ্মীনারায়ণের বিরাট পঞ্চরত্ন মন্দিরের লেখা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ক্ষীরগ্রাম—যোগাদ্যা দেবীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাতের সংলগ্ন শিলালিপি চূণকাম করিতে করিতে একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল পার্শ্বে একটি উর্ধ্ব হইতে নিম্নে লম্বমান রেখা অবশিষ্ট, তাহাদ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। তবে মন্দিরের দ্বার সংলগ্ন বেলে পাথরের বাহুগুলি যে খৃষ্টীয় ৭।৮ম শতকের তাহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপুর্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরদবন্ধু সান্যাল মহাশয় অনুমান করেন। বিধর্মীদের দ্বারা বিধ্বস্ত মন্দির ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের পর ১৭৪০ মধ্যে কোন সময়ে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা বিরাট আকারে পুনর্নির্মিত হইলে সম্ভবত প্রাচীন খিলানগুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে ক্ষীরকণ্ঠ শিবের অত্যুচ্চ ঢিবির উপরে অবস্থিত মন্দির বৌদ্ধযুগের স্তূপের সম্ভাব্য নিদর্শন। বালিপাথরের অনাদিলিংগ শিব দাক্ষিণাত্যের সহিত সংযোগ সূচনা করে। এবং গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত বিধ্বস্তপ্রায় উচ্চ যজ্ঞকুণ্ডের পুরাতন ইট খৃঃ একাদশ শতকের, তাহা পণ্ডিতেরা বলেন।

শ্রীখণ্ড—ভূতনাথ শিবের মন্দিরের সংলগ্ন শিলালিপি হইতে মন্দির যে প্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজ রাজবল্লভের দ্বারা পুনর্নিমিত হয়, তাহা জানা যায়।

কোড়ুই—সম্ভবতঃ মল্লসারুল লিপিতে উল্লিখিত কোড্ডবীর অথবা রামচরিতে উল্লিখিত কোটাটবী। এখানে রাজা ধর্মনারায়ণ রাজত্ব করিতেন প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়ামারা, ডালঢালা, ভাতঢালা ইত্যাদি পুষ্করিণী, প্রাচীন মুদ্রা ও গ্রামে ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষ, দেবকীর্তি ইত্যাদি দেখিয়া গ্রামটিকে প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। এখানকার হরগৌরী মূর্তির নিম্নে প্রাচীন কয়েকটি অক্ষর ক্ষোদিত ছিল। সম্প্রতি মূর্তিটি চুরি যাওয়ায় উহার কাল বা পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব।

কাঁটারিয়া কুরুম্বা—কাঁটারিয়ায় পোড়ামাটির ইটে মূর্তি ক্ষোদিত আছে, পথপ্রান্তে অবস্থিত মূর্তিটির গোড়া একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত। মন্দিরটি প্রাচীন মৃৎশিল্প ও মন্দির শিল্পে অতুলনীয়।

কুরুম্বায় প্রচুর বিষ্ণুমূর্তি অক্ষত বা প্রায় অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উচ্চতায় একটি ৪০ ইঞ্চি, (চালসহ) শুধু বিষ্ণু ২৮ ইঞ্চি। চারি হাতে শঙ্খ, চক্র গদাপদ্ম। জানু দুইটি চিত্রহারে বেষ্টিত। কর্ণে কুণ্ডল। মস্তকে মুকুট। নিচে বীণাপাণি, বামে, দক্ষিণে চামরধারিণী নারীমূর্তি। এ দুইটি ১১ ইঞ্চি করিয়া। তাঁহাদের আবার পার্শ্বে ছয় ইঞ্চি উচ্চ বিষ্ণুমূর্তি। চালে হাতী, অশ্ব, পরী, পদ্ম ও লতাপাতা। আর একটি ঐরূপই ৩৩ ইঞ্চি উচ্চ। ধর্মরাজতলা শেওড়া গাছের নিচে অসংখ্য ভগ্ন মূর্তি দেখা যায়।

শ্রীল মাধবচন্দ্রপুরীপাদের ভ্রাতাদের বাস এই গ্রামে। তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা রক্ষিত অধিকারী মহাশয়দের গৃহে।

জগদানন্দপুর—(নলহাটী) দাঁইহাটের কাছে। কষ্টিপাথরের অপূর্ব মন্দির।

পাতুন—যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির আশ্রম বলিয়া প্রকাশ। এখানে প্রচুর শিলামূর্তি বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সর্বপ্রকারের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যপুর—এখানকার বিষ্ণুমূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দণ্ডায়মান বিষ্ণুর হস্তে গদা ও চক্রের পরিবর্তে ঐ মূর্তির নিম্নে গদা ও চক্রপুরুষ আছেন, এবং বিষ্ণুর দুই হস্ত ইহাদের মাথায় দেওয়া আছে। মূর্তিটির মূলাকৃতি ও পরিহিত বসনেও বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ বৈখানস আগমে বর্ণিত অভিচারক-স্থানক মূর্তি। (ডঃ রমেশ মজুমদার)

পরিশিষ্ট ১০

বর্ধমানের তীর্থ-পরিক্রমা

ইং ১৯৬৩ সালে অজয় নদের অববাহিকায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননকার্যের পূর্বে বর্ধমানের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল খৃঃ পূঃ ৬ শতকের জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীরের সময় পর্যন্ত। কিন্তু এই খননের পর হইতে ইহার ইতিহাস ২০০০ খৃষ্ট পূর্বের তাম্রপ্রস্তর যুগ, এমন কি ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বের লৌহযুগ পর্যন্ত আগাইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন অজয় ও কোপাই নদীর অববাহিকায় কাটোয়া পর্যন্ত তাম্রপ্রস্তর যুগের বহুতর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই তাম্রপ্রস্তর যুগ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সভ্যতার খবর পাই প্রধানতঃ প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র, মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটির কাজ, প্রাচীন পুঁথি, লেখমালা বা তাম্রশাসনের মাধ্যমে। বহু গ্রাম এই সকলের প্রাপ্তিস্থান বা বিষয়বস্তুরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

কতকগুলি স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া আছে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে। এই সকল গ্রন্থ উর্ধ্ব সীমায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী এবং নিম্ন সীমায় ১৩শ শতাব্দীর হইতে পারে। পীঠস্থানগুলির পরেই প্রসিদ্ধ সিঙ্গীগ্রামের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কাশীরাম দাসের বহুপূর্বে এখানে মহাপণ্ডিত সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবির্ভূত হইয়া দ্বাদশ শতকেই অমরকোষের "টীকাসর্বস্ব" নামে মূল্যবান ব্যাখ্যা লেখেন। এই টীকা তাঞ্জোর সরস্বতী লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার বৈশিষ্ট্য হইল প্রথমতঃ ৩০০ খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ ইহাতে পাই, তাহা ছাড়া অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিত" কাব্য, যাহার পঠন পাঠন এদেশে এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃতি পাই। দ্বিতীয়তঃ সপ্তশতী চণ্ডীর উপর বন্দ্য-বংশীয় গোপাল চক্রবর্তী টীকা লেখেন। তৃতীয়তঃ বাংলা ১১৮৭ সালে এখানকারই সন্তান গজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীমবাজারে বসিয়া "শক্তিবন্দনা" নামক অতি মূল্যবান্ বাংলা কাব্য রচনা করেন। গঙ্গাধর দাস ও কৃষ্ণরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতা বলিয়াই নহেন, তাঁহারা নিজেরাও কাব্য লিখিয়াছিলেন। সাধক ও পণ্ডিত ৺বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় এখানকার বিখ্যাত ভাগবত-কথক,—স্তর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর দীক্ষাগুরু।

কাছেই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ তর্কবাগীশের পুত্র মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয় দোনায় বসিয়া প্রায় ঐ সময়েই মহাকাল-বিরচিত শ্যামাস্বরূপাখ্য স্তোত্রের টীকা রচনা করেন। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত দলিলপত্রের সাহায্যে অনুমান হয় বাংলা এগারশ পঞ্চাশ সনের কাছাকাছি তিনি এই টীকা লেখেন।

'ভট্টাচার্য্য-তনূজেন দোনাগ্রামনিবাসিনা।
শ্রীমতা যাদবেন্দ্রেণ তন্যতে স্তোত্রবোধনী ॥
প্রণম্য কামদাং কালীং মহাকালেন ভাষিতম্।
কর্পূরাখ্যং মহাস্তোত্রমাদৌ ব্যাখ্যায়তে ময়া ॥'

বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তিনি। ক্ষীরগ্রামের পণ্ডিত রামকিশোর ভট্টাচার্য "বেদবাণ তর্ককতন্বী শাক" পরিমিত এ (১৬৫৪ শক) বা বাংলা ১১৪১ সালে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'সত্যনারায়ণ কথা' লেখেন। তাঁহার পুত্র বাঞ্ছারাম বিখ্যাত 'যোগাদ্যা বন্দনা' লেখেন তাহার আন্দাজ ৩০ বৎসর পরে।

সাতগেছিয়ার দুলাল তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার একটু পরের লোক। তিনি বিবাদার্ণব সেতুর অন্যতম সংকলয়িতা। ১১৩৮ সনে ইঁহার জন্ম, ১২২২ সনে মৃত্যু।

অন্য কতকগুলি গ্রামও অবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইলেও আধুনিক পণ্ডিতদের লিখিত। তাহাদের সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পযন্ত। মণ্ডলগ্রামের সভাভরণ শর্মাকৃত 'গোপীবিরহ চন্দ্রিকা'র লেখক বালকিশোর শর্মা লিপিকাল দিয়াছেন ১৬৯২ শকাব্দা, অর্থাৎ বাং ১১৭৭ সন, মূল পুঁথি হয়ত আরো পূর্বেকার।

মধ্যযুগের শাক্ত বৈষ্ণব মঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ধমানের অনেকগুলি স্থানের সংবাদ পাই। সে স্থানগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মসম্পর্কিত সংবাদও এই গ্রন্থগুলিতে প্রসংগক্রমে উল্লিখিত।

আবার কতকগুলি স্থান মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা চিহ্নিত। তাঁহারা হয় ভক্ত নতুবা লৌকিক বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা স্বাধীনতা যুগের মহান্ নেতা। তাঁহাদের আবির্ভাবে এই প্রাচীন সভ্যতার খ্যাতি যে আমাদের কালেও অক্ষুন্ন আছে তাহাই সপ্রমাণ হয়।

এই পুণ্য নামাবলীর মধ্যে আছেন গতযুগের গীতিকার দাশরথি, নীলকণ্ঠ,

মতি রায়, দেওয়ান মশাই, কমলাকান্ত ব্যতীত স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুর পিতা ডঃ অঘোরনাথ, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও কাশীশ্বরী, ভুবনবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতপ্রেমিক রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বসু ও মহেশচন্দ্র চৌধুরী, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, মহম্মদ ইয়াসীন, আবদুস সাত্তার ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ডঃ রাসবিহারী ঘোষ, লালবিহারী দে, অনাথনাথ বসু, গিরীশচন্দ্র বসু, সোহহং স্বামীর শিষ্য স্বামী নিরালম্ব, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, কাশীপ্রবাসী যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী, ভাস্করানন্দ স্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীধর মহারাজ প্রভৃতির নামও অবিস্মরণীয়। এ যুগের সাংবাদিক ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে অগ্রণী যোগেন্দ্র বসু, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল, রাধাকুমুদ, হরিদাস পালিত, নলিনাক্ষ দত্ত প্রভৃতির জন্মভূমি এবং পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অশোক শাস্ত্রী, পরশুরাম, যতীন সেনগুপ্তের মাতুলালয় বর্ধমান জেলা। ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিশ্ববিদিত রাজা রামমোহন রায় মধুর সম্পর্কে এই জেলার সহিত সংপৃক্ত। বর্ধমান জেলা ইঁহাদের শ্বশুরালয়। কবিবর কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় ও কালীকিংকর সেনগুপ্ত প্রভৃতিও আমাদের। পাঁজোয়া, শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যগণ, কবিরাজকেশরী শ্যামাদাস বাচস্পতি ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ, পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে দিক্‌পাল স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ডঃ গণপতি পাঁজা ও ধনপতি পাঁজাও আমাদেরই, তাহা বর্ধমান ভুলিতে দেয় নাই। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে আচার্য্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন, দর্শন ও বেদের পণ্ডিত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম কে না জানে! মাধ্যমিক শিক্ষায় রায়বাহাদুর রসময় মিত্র, দ্বিজপদ কুণ্ড, মৃত্যুঞ্জয় গোঁ, গোবিন্দ-বিজয় গোস্বামী, কেশব হাজারী, চণ্ডী মজুমদার, নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ প্রভৃতি অমর নাম। তাঁহাদের জন্মভূমি এই বর্ধমান জেলা। অধুনালুপ্ত অজয় তীরবর্তী পারিগ্রামের সন্তান দায়ভাগপ্রণেতা জীমূতবাহন, নারী অধ্যাপিকা রূপমঞ্জরী, যিনি হটীবিদ্যালংকার নামে খ্যাতা, তারকনাথ তর্কবাচস্পতি, স্যর আশুতোষের গুরু গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ, পল্লীবাসীস্রষ্টা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভারতখ্যাত পুত্র গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ আমাদেরই সম্পদ্। মাধবনিদান প্রণেতা মাধব কর, বাংলা মায়ের মুখোজ্জ্বলকারী নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ যে একই মানকর গ্রামের সন্তান, তাহা হয় ত

আমরা সংবাদ রাখি না। পুজিত বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি ও ভক্তদের নামও কম চমকপ্রদ নহে।

প্রাচীন গ্রন্থ ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উল্লিখিত গ্রামগুলির প্রসিদ্ধি মাত্র গ্রন্থেই নিবদ্ধ নয়; সেগুলির উৎসব আনন্দ সেইসকল গ্রামের নিজস্ব অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় পরন্তু আজও অন্যান্যস্থানের বহুলোক সেখানে সমবেত হইয়া আনন্দ ও গোষ্ঠীসুখ অনুভব করে। শাক্তমেলা, বৈষ্ণব মেলা, মনসার মেলা, শিব ও ধর্মরাজের মেলা, আদিম জাতির মেলা এবং মুসলমান মেলা বহু সংখ্যায় দেখা যায়। বৈষ্ণব বিভাগেও আবার রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ ইত্যাদি দেবতাদের লইয়া কতকগুলি মেলা, আবার বৈষ্ণব অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং অপরাপর ভক্তদের কেন্দ্র করিয়া আরো কতকগুলি মেলা গড়িয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, লোক সমাবেশ বৈষ্ণব মেলায় সবচেয়ে বেশি, মুসলমান মেলায় তারপর। শিব ও ধর্মঠাকুরেব মেলায় তার নীচেই। তারপর অন্যান্য মেলা। মনসা মেলায় সবচেয়ে কম। মনসা মেলা গঙ্গা বা অজয় তীর অবলম্বন করিয়া কাটোয়া মেমারী ও কালনা থানায় সর্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছে।

মেলার জন্য যে সকল গ্রাম আজও বিখ্যাত তাহাদের সংখ্যা প্রায় পরস্পরের কাছাকাছি—এইটি লক্ষ্য করিলে একদিকে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা এবং অন্যদিকে অজয়, ভাগীরথী ও দামোদর এই তিনটি নদীর অপেক্ষাকৃত নবীন অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই বর্ধমান জেলায় সাংস্কৃতিক ভারসাম্য লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না।

দেখা যায় বর্ধমান জেলায় প্রধান প্রধান শাক্ত মেলা ২৮টি আর গঙ্গামেলা ৫টি, মোট ৩৩টি, শিবের মেলা ২১টি, ধর্মরাজের ১৫টি, মনসার ৩৭টি মুসলমান মেলা ৩৫টি, চরকের ৫টি, হনুমানের ২টি, সাঁওতালদের ২টি। বৈষ্ণব মেলা ৪০টি তন্মধ্যে ১৮টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মহাপ্রভুরই ৪টি, অন্য ভক্তদের ১৪টি, বাকী রথযাত্রা রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া।

গ্রামগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার ঘনিষ্টসূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যেমন ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার সহিত কতকগুলি গ্রামের সম্বন্ধ আছে। লালকালির ব্যবহার ও অম্বুবাচীসুলভ বিধিনিষেধ হইতে এটিকে বাংলা দেশে কামরূপের প্রতীকরূপে সম্ভবতঃ দেখা হইত, যদিও পরবর্তীকালে পৌরাণিক প্রভাবে একে গুপ্ত বারাণসীর আখ্যা কৃত্তিবাস দিয়া গিয়াছেন। সম্ভবত ক্ষীরগ্রাম দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে রাজার অধীন ছিল ও প্রাচীনকালে

খেট, খর্বট, বা অন্ততঃ দ্রোণমুখ গ্রাম বলিয়া পরিগণিত ছিল; ধামাসিয়া নামটি "ধর্মস্থীয়" নামেরই অপভ্রংশ মনে হয়।

ক্ষীরগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির কেন্দ্রীয় দেবতাদের কথা ভাবিলে ইহার সত্যতা ধরা পড়িবে। ক্ষীরগ্রামের উত্তরে শীতলগ্রামে সিদ্ধেশ্বরী পশ্চিমে ঢেকুর অর্থাৎ অজয় তীরবর্তী দিক্করবাসিনীর দেশ। ঢেক্করীর অধীশ্বর ইছাই ঘোষ যে ভবানীর ভক্ত এবং ভবানীর মন্দির গড়াইয়া দিয়াছিলেন ধর্মমঙ্গল গ্রন্থগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দিক্‌করী বা দশভুজা ভবানীরই নামান্তর। তাহা হইতেই ঢেক্করী শব্দ আসিয়াছে ইহা নিশ্চিত। কালিকা পুরাণ বলিতেছেন কামাখ্যা দেবীর আশেপাশে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, প্রচণ্ডচণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা) ইন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি, পবন গিরি, ভস্মকূট, হেরুক শ্মশান ও বেতাল ভৈরবনাথ। মূল উমানন্দ শিবকে ঘেরিয়া অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ ও ঈশান,—এই পঞ্চশিব পঞ্চবক্ত্রের প্রতীক হিসাবে আছেন। আর কামরূপের এই উমানন্দ ভৈরব হইলেন পাতালেশ্বর শৈলেশ্বর এবং লিঙ্গেশ্বর। যোনিচক্রের ভারে তিনি পাতালপ্রবিষ্ট, শৈলরূপী বলিয়া শৈলেশ্বর, লিংগরূপী বলিয়া লিংগেশ্বর এবং গীতপ্রিয় বলিয়া গীতেশ্বর। এই সমস্ত নামগুলি এই অঞ্চলের সাথে মিলিয়া যায়। পাচণ্ডী, সিদ্ধেশ্বরী, ভালসুনি, লিংগেশ্বর, শৈলেশ্বর, পাতালেশ্বর, গীতেশ্বর, পবনী (পুঁইনা), চন্দ্রপুর, ইন্দ্রপুর ও দোনায় কামরূপে-সিদ্ধ রামকৃষ্ণের স্থাপিত "হেঁরো" পুকুর, সেখানকারই ভৈরবনাথ ইত্যাদি কামরূপ-তন্ত্রের জলন্ত উদাহরণ।

অপর দিকে প্রতি সংক্রান্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা বাড়ীর গুয়া ডাকা অনুষ্ঠানে নাসিগ্রাম, কুড়মুন, কলিগ্রাম, একুয়ার, কুসুমগ্রামের আগুরিদের ডাক হয় ও উপস্থিত থাকিলে পানসুপারি দেওয়া হয়। তারপর "মাঝ" কথাটি উচ্চারণ করিলেই উৎসব সাঙ্গ হয়। অর্থাৎ এই সকল গ্রামের প্রতিনিধিরা "মাইঝ" রক্ষা করিতেন। নরবলির মুণ্ড ও অস্ত্রাদি রক্ষার জন্য দেবীর অন্তরঙ্গজনদের এই ব্যবস্থা। ইহা সম্ভবতঃ আদিম জাতিদের নিকট গৃহীত। এখানে বৈশাখে গোবর্ধনপুর ও কোড়ুই হইতে ঝাঁপি ও শঙ্খ যথাক্রমে আসে, স্বরগ্রামের মুচীরা দেবীর লগ্নের দিন হইতে বাজাইবার উপযোগী মাদল তৈরী করেন। সুতরাং ইহারা পরস্পর সংপৃক্ত।

এইরূপে বৈষ্ণবদের দ্বাদশ গোপালদের যোগাযোগ আছে। চৈতন্য,

নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি প্রভু ও মহাপ্রভুদের শাখা এবং দ্বাদশ গোপালের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক আছে।

দ্বিতীয়তঃ এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হইল মূর্তি পূজার সাথে সাথে বৃক্ষ পূজার ব্যবস্থা, শৈবশাক্ত পূজায় বিল্ববৃক্ষ, মনসা পূজায় সিজবৃক্ষ, বৈষ্ণব পূজায় তুলসীবৃক্ষ, শুধু দুর্গা পূজায় নবপত্রিকা এবং নানাপ্রকার যন্ত্র পুষ্প যথা অপরাজিতা, রুদ্রাক্ষ জবা, বকফুল প্রভৃতি দেবীর যোনি, স্তন ও শিবের পাদুকা রূপে উপহার দেওয়ার রীতি আমাদের বুদ্ধ সমকাল এমন কি সিন্ধু সভ্যতার কাছাকাছি লইয়া যায়।

তাহার সহিত তাম্রপাত্র যথা কোশাকুশি ইত্যাদির বহুল ব্যবহার আমাদের নিকট তাম্রযুগের স্মৃতি বহন করে। ঐ সব পাত্রের যোনি বা লিঙ্গের আকার, নানাপ্রকার যন্ত্র ও মুদ্রাও ঐ সুপ্রাচীন যুগের স্মৃতিচিহ্নরূপে আমাদের নিকট দেখা দেয়।

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ বর্জন করিয়া একত্র আহার বিহার বৈষ্ণব ও মুসলমান উৎসবের বৈশিষ্ট্য। ধর্মরাজ ও শিবের গাজনে নিম্নজাতি ও ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীত ধারণ করেন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা পূজার স্পর্শদোষ নাই বলিলেই চলে।

ধর্মপূজায় কাঁচা মদের কলসী পরিক্রমাকে ভাণ্ডার ঠেলা বলা হয়। ঘটে পুজা অবশ্য সব দেবদেবীরই আছে। যে সব দেবতাকে নাড়াচাড়া করা শক্ত সে সব দেবতার অর্চ্চারূপে কলস প্রদক্ষিণ-এর চিহ্ন ক্ষীরগ্রামে ও জামালপুরে দেখি। ধর্মরাজের এই মদের কলস আবার বৈদিক যুগের সোমকলসকে মনে করাইয়া না দিয়া পারে না। ধর্মঠাকুরদের বিশেষতঃ বুড়োরাজের অনুষ্ঠানে সোমবার ও সোমকুম্ভ দুই-এর প্রাধান্য সর্বস্বীকৃত। সোমের পুর্ণিমাও গুরুত্বপুর্ণ বুড়োরাজ তথা অন্যান্য ধর্মরাজতন্ত্রে।

অতএব চিরাগত শৈবশাক্ত ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে প্রাচীন দিনের কথাগুলি আমরা নূতন করিয়া ভাববার অবকাশ পাই। সংস্কার-কৃত গৌড়ীয় বা অন্য বৈষ্ণব উৎসবেও প্রাচীনের ছাপ না থাকিয়া পারে নাই।

জ্যোতিষের দিক হইতে সিংহ রাশির পর কন্যা রাশির আবির্ভাবের সাথে সাথে সিংহারূঢ়া দুর্গার পুজা, 'সার্প' নামে কথিত অশ্লেষা নক্ষত্রসহ কর্কট রাশির উদয়ে সর্প দেবীর উপাসনা লক্ষ্য করিবার মতো। কুম্ভ রাশিতে রবি গেলে কুম্ভ মাথায় শিবের ভক্তগণ জল সাধিতে যায়, ইহাও

লক্ষণীয়। হিন্দোল (দোল) উৎসবেরও রথযাত্রার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যায় আচার্য যোগেশচন্দ্র "পূজাপার্বণ" গ্রন্থে দিয়াছেন।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা উৎসবের সাথে বৈশাখে সলিতা পাকানো, ধান ভাঙা, হলুদ বাঁটা, ছাতা, জুতা পরিধান করা, লাঙল দিয়া জমি চাষ, প্রথম ও শেষ পাঁচদিন এবং ১৫ই দিন লেখা এবং বাকী বৈশাখ মাস লাল কালি ভিন্ন অন্য কালিতে লেখা, স্ত্রীপুরুষে শয়ন, পূর্ণগর্ভা নারীর গ্রামে বাস, নিষিদ্ধ। নরবলির চিহ্ন হিসাবে মোর নাচের দিন হইতে প্রতি রাত্রে মোর নাচ হইবে, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে দেবীর জল হইতে উত্থান ও জলে নামানো পর্যন্ত।

মনসা পূজার মধ্যে বৈশিষ্ট্য অণ্ডাল থানার মহলগ্রামে "রয়নী" উৎসব—এটি মনসারই একটি বিশিষ্ট উৎসব। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—'The most important Serpent-festival is known here as Rayani Puja which can be celebrated at any time of the year. The origin of the word Rayani is rather doubtful. Attempts have, however, been made to derive the word from Sanskrit 'Rajani' meaning night as certain rituals of the performance are held during night. Comparison has, however, been made of it with a certain class of songs prevalent in West Bengal which is known as 'Jagaran' meaning taking vigil. But there is a great deal of difference between the two.

Rayani is a very important social festival among the Hindus of the above area though it is unknown elsewhere in Bengal.* When a child is born in a family a mental vow is taken by its head to the effect that the snake festival known as Rayani would be performed on the occasion of its marriage or 'Sacred Thread' ceremony if the child is a male and Brahmin by caste. It is indeed a very costly ceremony. Therefore due to economic reasons a greater part of its rituals is now being sacrificed though only a couple of decades back the festival used to be celebrated with all its complicated details. The worship is arranged two or three days before the actual sacred thread or the

*পূর্ববঙ্গে এই রয়নীর বহুলপ্রচার। পশ্চিমবংগে এটি ব্যতিক্রম।

marriage ceremony, as the case may be. The celebration of Rayani extends over a period either of five or two and a half days according to the custom of each family or in absence of that according to mental vow taken for either of the above periods at the time of the child's birth. In this connection clay-images of the serpent goddess as big as the image of Durga (three to four feet in height) are built. On either side of the image are placed three or four images of her associates including that of Neta. In front of these images a row of idols representing the chief characters of the legend of Chand are placed side by side each on his or her distinct seat. The legend of Chand is recited musically all these days during day and night. No body dares to hold the marriage of his son or daughter without performing this ceremony as it is very strongly believed here that on failure to do so snakes create trouble to the couple. The belief must have had its origin from the tragic legend of Lakhindar and Behula of this area"—Folklore, January-February, 1961.

ঝাঁপান উৎসব হয় আউসগ্রাম থানার কালসা, মেমারী থানার কেজা এবং কালনা থানার কয়েকটি গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাংলার উৎসব' গ্রন্থে প্রবীণ গ্রন্থকার তারিণীশংকর চক্রবর্তী মনসামঙ্গলের পঙ্‌ক্তি তুলিয়াছেন :

'একশত শিষ্য সদা সঙ্গের জোগান।
বান্ধিয়া ছত্রিশ খানা নাগের ঝাঁপান॥
তথির উপর চড়ে নাগ-আভরণ।
বিষম শব্দ আর ঢাকের বাজন॥

অর্থাৎ 'চাঁদবেনের বন্ধু বিখ্যাত ওঝা শঙ্খ ধন্বন্তরি একশত শিষ্য নিয়ে ছত্রিশ রঙের নিশান উড়িয়ে নাগভূষিত হয়ে ঝাঁপানে চড়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছেন। বিষ্ণুপুরের ঝাঁপানের খেলায় যে সমস্ত বেদে আগে আসতো তারা বিপ্রদাসের শঙ্খ ধন্বন্তরির মত সুসজ্জিত চতুর্দোলায় চড়ে আসত। চতুর্দোলার মাথায় রঙীন চাঁদোয়া থাকতো। চারপাশে থাকতো রঙিন নিশান, আর দোলার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পিছনে জ্যান্ত গোখরো

সাপ। তাদের কেউ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে, কেউ চলন্ত চতুর্দোলার নড়াচড়ার সঙ্গে হেলছে দুলছে। আর চতুর্দোলার ভিতর বসে থাকত বিষবেদের সর্দার, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।' চতুর্দোলায় চড়িয়া গুণীর আবির্ভাব এখন আর নাই-ই। শুধু ঝাঁপান নামটি আছে।

এ প্রসঙ্গে মুঙ্গলাগ্রামের ব্রহ্মাণী এবং চাণ্ডুলীর ব্রহ্মাণীর সাত বোন-এর খ্যাতি আলোচনার যোগ্য। এ দুটি একত্রে বৈদিক যুগের স্মৃতি বহন করে।

ঋগ্বেদে আছে (১৯১ সূক্ত ১ মণ্ডল):

ত্রিঃসপ্ত ময়ূর্য্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ
তাস্তা বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব।

অর্থাৎ গঙ্গা প্রভৃতি সাত নদী বিষ নষ্ট করেন, যেমন মেয়েরা কলসী করিয়া জল তুলিয়া লইয়া যায়। একুশজন ময়ূরীরও এই কার্য।

এখানে সাত নদীকে সাত বোন ধরিলে কুম্ভ এবং ময়ূরের যে উল্লেখ আছে ছদ্মবেশে সে সবই মনসা পুজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কুম্ভও আছে তাহা আবার কোথাও কোথাও কৈতর ঘট অর্থাৎ কবুতর বাহিত। এই কবুতর নিশ্চয়ই ময়ূর স্থানীয়। আর চাণ্ডুলীতে প্রবাদ আছে যে এই ব্রহ্মাণীরা সাত বোন। স্পষ্টতঃই স্বসারঃ শব্দের সহজ অর্থ করা হইয়াছে। সায়ণ ইহার অর্থ স্বাধীন ভাবে যাহা সরণ করে বা অগ্রসর হয় তাহাকেই অর্থাৎ নদীকেই "স্বসা" বলিয়াছেন। "স্বসারঃ" বহুবচনের রূপ।

তাহার পর ব্রহ্মাণীর উৎপত্তি কালীপাহাড়ী মুঙ্গলায়। এ সম্বন্ধেও বেদের মন্ত্র লক্ষণীয়:

শরাসঃ কুশরাসো দর্ভাসঃ সৈর্য্যা উত।
মৌঞ্জা অদৃষ্টা বৈরিণাঃ সর্বে সাকম্ ন্যলিপ্সত।

'অর্থাৎ শর কুশ মুঞ্জ এই সব ঘাসে সাপ লুকাইয়া থাকে।' এখানে কালী-পাহাড়ীকে 'মুঞ্জবান্' অর্থাৎ হিমাচল এবং শিবের বাসস্থান ধরিয়া ব্রহ্মাণীকে তাঁহার কন্যা ধরা হইয়াছে। ইহা বেদের দূর প্রতিধ্বনি বই কি?

কি শাক্ত, কি শৈব কতকগুলি উৎসবের কেন্দ্র-দেবতাকে ক্ষুধায় অন্ন ও রোগে শান্তির জন্য ভক্তরা আশ্রয় করিয়াছেন। বৈষ্ণব উৎসবেও মহোৎসব দরিদ্রের পরমকাম্য। শাক্ত দেবীগণের মধ্যে দেবী যোগাদ্যাকে যে 'ভূতধাত্রী মহামায়া' বলা হইয়াছে তাহা সুপ্রাচীনকাল হইতে বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত। হাল লাঙ্গল, চ্যাঙ ব্যাঙ ছাড়া ক্ষীরকলসের জলসিঞ্চনে ভূমির উর্বরতার

ব্যবস্থা ইত্যাদি দীর্ঘদিনের রীতি। এমন কি ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রাচীনকালে যে ক্ষীরগ্রামে ও ক্ষীরগ্রামের সহিত সম্পর্কিত গ্রামে নরবলির ব্যবস্থা ছিল তাহারও কারণ ভূমির উর্বরতা বিধান। রক্তই জীবন, সুতরাং রক্ত সিঞ্চনে প্রথমতঃ রক্তবর্ণের হরিদ্রা তাহার পর অন্যান্য শস্যেরও বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণা প্রবল ছিল। শাকম্ভরী মাজি গ্রামে উপাসিতা। সপ্তশতী চণ্ডীর মতে তিনিও দুর্ভিক্ষ-নিবারিণী উদ্ভিজ্জ জগতের দেবী। এমন কি পূর্বস্থলীর অধীন নসরৎপুরে দিবাভাগে যে কালীপূজা হয়, তাঁহার নাম বাগ্‌দেবী। অবশ্য কর্পূরাদি স্তোত্রে কালীর বীজমন্ত্র 'ক্রীং' তিনবার উচ্চারণ করিলে গদ্যপদ্য স্বতই মুখ হইতে নির্গত হয়, এইরূপ উক্তি মহাকাল করিয়াছেন। কিন্তু নসরৎপুরের কালী সে-অর্থে বাগ্‌দেবী নহেন। তিনি চাষের 'বাগ্‌' অর্থাৎ সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়াই ভক্তেরা তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন। এরুয়ার প্রভৃতি অন্যত্রও অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।

সিঙ্গীর ক্ষেত্রপাল শিব। কিন্তু তাঁহার নামেই প্রমাণ যে ভক্তরা তাঁহাকে ক্ষেত্রের পালয়িতারূপেই উপাসনা করেন। সুতরাং শিবের সহিত ধানভানার সম্বন্ধ একবারে কষ্ট-কল্পনা নহে, অন্ততঃ কৃষি প্রধান বর্ধমান জেলায়।

অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় এখানকার মনসা বা অন্যান্য দেবীরা সকলেই কালে কালী বা দুর্গার মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহাদের প্রাধান্য খর্ব হইয়াছে, দুর্গা বা কালীর প্রভাবে। সর্প পূজা শস্যদেবী অন্নপূর্ণাদির পূজা এককালে প্রবল ছিল কিন্তু বর্ধমানের নদী বিধৌত অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র তাঁহাদের মাহাত্ম্য অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। অন্ততঃ মেলা করিয়া একত্র হইয়া তাঁহাদের উপাসনা কমিয়াছে। শুধু নদী বিধৌত ও বন্যা অঞ্চলে বর্ষায় সর্পভীতি আছে, সেজন্য সেখানে মনসা উৎসব আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে।

ধর্মপূজাও অনেক স্থলে শিবপূজায় পর্যবসিত। এবং এই ধর্মরাজ মৃত্যুঞ্জয়-রূপে সোমধারণ করেন, সোমপানে সোমবার পালনে সন্তুষ্ট এবং রোগহারী রূপে প্রপূজিত। জামালপুরের বুড়োরাজ ও ধর্মরাজ, এই পর্যায়ে পড়েন। ধান্য-খেড়ুরের কালী এবং শুশুনার তারাখ্যা দেবীও রোগহারিণী। উভয় ক্ষেত্রেই ভক্তেরা প্রচুর কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তবে রিপুবলির পরিবর্তে অসহায় ছাগাদি পশু বলি দেন। বলা যায় না, তারাখ্যা দেবীর মূর্তির যে ইতিহাস প্রাচীনেরা বলেন তাহার দ্বারা এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা হয় কিনা। শুনা যায়

সমুদ্র মন্থনে বিষ উত্থিত হইলে মহাদেব তাহা পান করিয়া বিষের জ্বালায় অস্থির হন, তখন দেবী তারারূপে তাঁহাকে স্তন পান করাইয়া নিরাময় করেন। মূর্তিটিতেও দেবী ভক্তকে স্তন পান করাইতেছেন দেখা যায়, এই ভক্তই প্রাচীনদের মতে স্বয়ং মহাদেব। ক্ষীরগ্রামেও নানাপর্যায়ে দেবীকে দশমহাবিদ্যার প্রতিটি বিদ্যারূপে উপাসনা করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাই। তারারূপে যখন তিনি উপাসিতা হইয়াছিলেন তখনই সম্ভবতঃ ক্ষীরগ্রামে নীলকণ্ঠ ভৈরবের নাম 'ক্ষীরকণ্ঠক' হয় বা ভক্তেরা তাঁহাকে সেই নাম দেন। কারণ, তাঁহার বিষে নীলকণ্ঠ ক্ষীরে পূর্ণ হয়। এই ক্ষীরদায়িনী ত্রিনয়নী তারা চক্ষুরোগক্লিষ্ট ভক্তদের অমৃত সিঞ্চনে চর্মচক্ষু, জ্ঞাননেত্র ও আরোগ্য দিবেন তাহা ভক্তেরা আশা করিবেন বই কি।

নাগপুজা প্রসঙ্গে কুলীগ্রাম, শিশুনা (শুশুনা) গ্রাম ও কাঁকোড়া নামের সাথে কুলীরক, শিশুনাগ ও কর্কোটক নাগের যোগাযোগ আছে কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে কাঁকোড়া গ্রামে মহাভারতোক্ত অষ্ট নাগের অন্যতম কর্কোটক পুজা হয় তাহা ঠিক। দেবীর পুজার সঙ্গে বৃক্ষপুজা যে পাশাপাশি চলে তাহা দেখিয়াছি। কুলচণ্ডী গ্রাম বা কুলাইগ্রামের পিছনে এই কুল বৃক্ষের পুজার ইংগিত বিদ্যমান মনে হয়। নন্না পুজা তেঁতুলতলায় হয় তাহার তাৎপর্য কালীপুরাণ দিয়াছেন,—তিন্তিড়ীকে কল্পবৃক্ষ বলিয়াছেন এবং ওর বীজমন্ত্র পর্যন্ত দিয়াছেন। কামরূপে তিন্তিড়ীর আদর আছে, এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে হনুমান লংকায় যে দেবীর মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহার চারিধারে তিন্তিড়ী বৃক্ষের সমারোহ ঐ জন্যই। তিন্তিড়ী তন্ত্রমতে কুলবৃক্ষের অন্তর্গতও বটে।

কালিকাপুরাণ বলেন—

> কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লী তিন্তিড়ী চাপরাজিতা
>
> ভূত্বা তস্মিন্ মহাশৈলে স্থিতো দেব্যা ধৃতঃ প্রিয়ে ॥

শাক্তানন্দ—তরঙ্গিনী বা তন্ত্রসারে কুলগাছ কিন্তু কুলবৃক্ষ নয়, কিন্তু বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল এবং শাক্তমাত্রেই প্রাতঃকালে কুলবৃক্ষকে পুজা করিবেন এই নির্দেশ হইতেই বোধ হয় কুল গাছে চণ্ডী কল্পিতা। কুলাইচণ্ডীর পুজার বেশ প্রচলন ছিল এককালে।

কতকগুলি গ্রাম দেখিতে পাই সেগুলি আপাতত উপরোক্ত কোন কারণে প্রসিদ্ধ নয় বটে কিন্তু তাহাদের নামকরণে বিশেষ বিশেষ পুজা অর্চনায়, এই

অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও দেবতাদের নামের ছাপ আজও বর্তমান। যেমন বালিণ্ডা, সেলেণ্ডা, সারুল, ভাটাকুল ঢেঁড়ে, বরামপুর, ভাল্লগ্রাম, দেয়াসীন ইত্যাদি।

এই দেশে যে প্রথমে আদিম জাতির বসতি ছিল এবং বনদেবতাদের পুজা হইত পণ্ডিতেরা এ বিষয় একমত। স্থান নামের মধ্যে এর প্রচুর প্রমাণ মেলে। বেলেণ্ডা, সেলেণ্ডা, সারুল, বেলুন, পুৎসুরি এই সব নামের পেছনে দেখা যাইবে খন্দ দেবতা বালিণ্ডা, সেলেণ্ডা, সারুপেন্নু, বেয়েলাপেন্নু, পিৎসু পেন্নু—ইহাদের নাম কার্য করিতেছে। 'বরামপুর' অনার্য বনদেবতা 'বড়াম' এর পুজা হইতে উদ্ভূত। ভাটাকুল বুদ্ধপুর্ব ও বুদ্ধসমকালের 'ভট্টা' নামক যক্ষিণীর নাম হইতে আসিয়াছে, ঢেঁড়ে কানপুর নাম যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ঢেণ্ঢনপাদ, কাহ্নপাদ ইত্যাদি হইতে আসিয়াছে এমন মনে করা অযৌক্তিক নহে। কানপুর ইত্যাদির কাছাকাছি ইচু, ভাগড়া প্রভৃতি স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রাবল্য এবং ঢেঁড়েতে বসন্ত দেবতার প্রাধান্য তাহাই সূচিত করে, এমন কি গোবর্ধনপুরের অধুনা দেবমূর্তিহীন মাসিপিসীর মন্দির হইতে ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যাপুজার দিন যোগাদ্যা বা যুগাদ্যার কাছে মাসিপিসীর ঝাঁপি আসা পুরাতন খন্দ বসন্ত দেবতা 'যুগা পেন্নু'র স্মৃতি বহন করিতেছে। ছোট পোসলার মনসা দেবীকে ঝংকেশ্বরী বলে। ইহা স্পষ্টতঃই 'যক্ষেশ্বরী' নামের অপভ্রংশ। কসিগ্রামে নম্নাপুজার অনুষ্ঠান হয় শেষ পঞ্চমী বা নাগ পঞ্চমীতে। বৎসরে বারোমাস একটি নির্দ্দিষ্ট তেঁতুল তলায় চম্বল দেওয়া হয়। এই 'নম্না' 'নরনাগ' ব্যতীত আর কিছুই নহে। তেঁতুলতলায় পুজা হয়, আপাততঃ কোন মূর্তি নাই। কিন্তু মনুষ্য আকারধারী নাগ, তাহার মাথার পিছনে সাপের ফনা,—নাগের এইরূপ মানব বিগ্রহের কথা এমন কি সম্পূর্ণ সাপের চিহ্নহীন মনুষ্য বিগ্রহের কথা অন্যত্র পাই। দ্বিতীয় প্রকারের নাগ হইলেন মহাভারতের আস্তিক। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে সম্ভবত বৃন্দাবন দাস ইহাকেই "ডঙ্ক" বলিয়াছেন—

'সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে।'

এবং 'ডঙ্ক' শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে লিখিয়াছেন—

'মনুষ্য শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।' (চৈঃ-ভা, আদি ১১)

সংস্কৃতির দিক দিয়া এগুলি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। চৈতন্য ভাগবতের আমলে যে বিষহরির পুজা প্রচুর ছিলো তাহা বৃন্দাবন দাস সখেদে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাল্লগ্রাম, ভালকী প্রভৃতি স্থানের সংগে ভল্লুক টোটেমের সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন (অমরাগড়ের) গ্রামবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি……ওঁরা ভল্লুক পুষতেন…ভালুক মরলে তাঁরা অশৌচ পালন করতেন, হাঁড়ি ফেলতে হত পর্যন্ত…ভালুক টোটেম এবং ভল্লুক পোষা সমস্ত কাহিনী পশুপালক সমাজের নিদর্শন।' (প. ব. স. পৃ ২০৭)

'পুতিতুণ্ড' থেকে যেমন পুতুণ্ডা, ধর্মপুজার সেবায়েৎ 'দেবাংশী' থেকেও তেমনি দেয়াসীন গ্রামের নাম এসেছে।

কতকগুলি গ্রামের নাম তাহাদের আদি ভৌগোলিক অবস্থান, উৎপন্ন উদ্ভিজ্জাদি, প্রাচীন অধিবাসী বা কোন অধুনা বিস্মৃত কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া সম্ভবতঃ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের লইয়া হয় কোন আলোচনাই হয় নাই কিংবা তাহাদের মধ্যে দু'একটি লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

আচার্য সুনীতিকুমার একবার কতকগুলি বাংলাস্থান নামের শেষে-লা অংশটি আর্যেতর নয় বলিয়াছিলেন। কিন্তু 'কেরালা' এই প্রসিদ্ধ দক্ষিণ দেশের নামটি 'কেরা' অর্থাৎ নারিকেল এবং 'লা' অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান,—এই দুইএর মিলনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাংলাদেশে, সুতরাং বর্ধমান জেলাতেও, এই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। কারণ, লা প্রত্যয়টি লা ধাতু ড প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিংগে আপ্ যোগ করিলে তৈয়ারী হয়। যেমন ঝিরেলা, পিরীলা (পীর-লা)। লা আবার ল হইয়া যায় অনেক স্থলে। যেমন সারু-ল। অনেক সময় হয় -র বা -ড় বা -রি; যেমন পুৎসু-রি।*

কোন স্থান আবার হিন্দী পুরণ বাচক সংখ্যা থেকে। যেমন পাঁজোয়া (পাঁচবা), আওরিয়া (আউঅল + ইয়া), দোনা (দু না)। কোন কোন স্থান আবার বেশ রোমান্টিক, যথা, বরণডালা, ঘুঙুর ইত্যাদি।

'-লা' ব্যতীত '-বন' আড়া বা ড়া ('বাটক' এই সংস্কৃত কথার অপভ্রংশ)

*একদা পণ্ডিতের আবাস মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা গ্রামটির নাম খাঁটি বৈদিক 'মধুলা' শব্দ হইতে আসা একেবারেই অসম্ভব নহে। মুঙ্গলা ঠিক তাহারই (বর্ধমান জেলার) প্রতিস্পর্ধা। মঙ্গলার কাছাকাছি অনেক ক'টি গ্রাম এই নামকরণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল যেমন আমলা মাহুলা ইত্যাদি। 'মধুলা' শব্দটি ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১৮২ সূক্ত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য: "হরিষ্ঠা মধুত্বা মধুলা চকার।" অর্থাৎ হে বিষ, হরি বা অশ্বেস্থিত আদিত্য তোমাকে মধু অর্থাৎ অমৃতে পরিণত করাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত বতুপ্ প্রত্যয়ের অনুরূপ -'ইয়া' বা -'উয়া' প্রত্যয় দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে। যেমন নিগন (নিংগবন) সিমলন, পিপলন, জামড়া, কাঁদড়া, কাকুলিয়া, গাঁকুলিয়া, ধেনুয়া। অনেক সময় '-লা' আবার -'না' হইয়া গিয়াছে যেমন ঈশনা, জামনা।

আরো একটি লক্ষ্যের বিষয় বর্ধমানে খাঁটি সংস্কৃত -'গ্রাম' ও -'পুর' দ্বারা নাম অনেক আছে। তন্মধ্যে গ্রাম-ভাগান্ত নামগুলির সাথে মুসলমানী নাম যথাসম্ভব কম, -'পুর' ভাগান্ত স্থানের নামে মুসলমানী নামও দেখা যায় যেমন ক্ষীরগ্রাম, কংকুগ্রাম, পটুগ্রাম, নাসিগ্রাম, শীতলগ্রাম একদিকে, অন্যদিকে নসরৎপুর, আলমপুর ইত্যাদি। তবে গ্রাম ভাগান্ত নামের গ্রাম শব্দটি আর্যেতর হইতে পারে, যেমন নাসিগ্রাম।

দ্বীপ, স্থলী, চর, টিকুরী, ডাঙ্গা, ডিহা, ডিহি এগুলি দ্বারা আমরা বুঝিব যে, প্রথমে এ সমস্ত স্থান হয় কোন নদীর চর ছিলো বা পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হইতে অনেকখানি উচে ছিল। যেমন অগ্রদ্বীপ, পুর্বস্থলী, মাঝের চডা (= চূড়া), গঙ্গাটিকুরী, জালুইডাঙ্গা, শরডাঙ্গা, বাবলাডিহা, গ্রামডিহি ইত্যাদি। গড় নামটি বেশ রহস্যজনক। অনেকে সমুদ্রগড় নামটিকে সমুদ্র নামক কোন রাজার গড ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু জান্নগড় (জহ্নুগড়), সমুদ্রগড়,—এই সব, গড় অর্থাৎ গর্ত্ত এই অর্থে ধরিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। গ'ড়ে, গর্ত্ত শব্দগুলি স্মরণীয়। 'ঘাট' শব্দটি নিঃসন্দেহে নদীর ধার সুচনা করে। কিন্তু বাখরগঞ্জে যেমন হাটী 'কাটি' হয়, জলপাইগুড়িতে কুঠি গুড়ি হয়,—সেইরকম এই অঞ্চলে ঘাট অনেক সময় হাট হইয়া যায়। ইন্দ্রাণী পরগণায় প্রবাদ আছে,

বার ঘাট তের হাট তিন চণ্ডীশ্বর
এই যে বলতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।

হাট কথাটি আকাই হাট, নৈহাটী, সীতাহাটী, দাঁইহাট ইত্যাদিতে আছে বটে, কিন্তু ঘাট শব্দটি অত বেশি পাই না। কারণ, দুটি শব্দে মেশামিশি হইয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ।

অনেক সময় দেখা যায়, শব্দের আগের অংশটিতেই এই 'দ্বীপ' বা 'চড়া' সুচিত করে, যেমন ধিৎপুর (= দ্বীপপুর)। অবশ্য ঐ নামের সঙ্গে অধিকন্তু পুর শব্দটি যোগ করা হইয়াছে।

বিতর্কমূলক নাম হইল সিঙ্গী ও সিদ্ধিগ্রাম। পণ্ডিত মহলে এই দুই নাম

এক কি না তাহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছে। কিন্তু একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ সিঙ্গীবাসী দলিললেখকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সিঙ্গী গ্রামকেই পুরাতন দলিলে সিদ্ধিগ্রাম বলা হইত। তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে। সিঙ্গী ও সিদ্ধির একই অর্থ। মনসাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই নামই সিজ বৃক্ষকে বুঝায়। সিঙ্গী হইল 'স্নুহি' নামের অপভ্রংশ, স্নুহিকেই আবার বলে সিদ্ধবৃক্ষ বা সিজ গাছ। দেবীভাগবতে দ্রষ্টব্য—

সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধি প্রদাংভজে॥

অর্থাৎ যিনি সিদ্ধবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী, সিদ্ধা এবং সিদ্ধিপ্রদা তাঁকে ভজনা করি। এর প্রায় আংশিক অনুবাদ আছে বিপ্রদাস পিপলাইএর মনসামঙ্গলে—

জাগিয়া জাগুলি নাম সীজ বৃক্ষে স্থিতি।

হয় সিঙ্গীগ্রামে প্রথমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে স্নুহি গাছ হইত অথবা মনসাপুজার প্রভাবে উহার প্রাচুর্য ছিল। অবশ্য প্রথম অর্থটি অমূলক নহে যেহেতু পাশেই বাকসা, মেইগাছি; ওকড়সা, রোণ্ডা গ্রাম অর্থাৎ বাকস, ওকড়া, এরণ্ড, ও মেহেদী এইসবের আড্ডা। সুতরাং সিঙ্গী ও সিদ্ধিতে কোন বিরোধ নাই।

পুতুণ্ডার নাম পুতিতুণ্ডার সংক্ষেপ। বুঝা যায় এই সব অঞ্চলে পুতিতুণ্ড অর্থাৎ অহিতুণ্ডিক বা সাপের ওঝা বাস করিতেন।

পালিশগ্রাম ও পালসিট পলাশের সঙ্গে সংপৃক্ত হইতে পারে। পলাশী, পলাশন ত বটেই।

আবার আর একটি নাম বেরুগ্রাম,* বেরু হইল বেউড় বাঁশ, সুতরাং কোনকালে ঐগ্রামে বেউড়ের ঝাড় ছিল অসংখ্য।

এই রকম সব। ঝিরেলা, নাম প্রসংগে,—জিরেকে অনেকে ঝিরে বলেন, সেই হইতে যেখানে ঝিরে পাওয়া যায় তাকে ঝিরেলা বলতে বাধা কি? কুর অর্থে অন্ন, বের অর্থে বেগুন, সুতরাং শুকুর, কুরমন (কুরমান্), এবং বেরা গ্রামের নাম-তাৎপর্য কতকটা উপলব্ধি করা গেল।

*'বেড়ু বাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা' (ঘনরাম—ধর্মমঙ্গল)
আবার কবিকংকণ তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'উজানীর কথা গড় চারি ভিতা
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।'

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১১	রহিয়াছে	করিয়াছে
১৯	৫	Ethnological	Ethnical
২০	৮	"সিংহের"	'সিংহের'
ঐ	১২	ঐ	ঐ
৩১	১	খলজি	খিলজি
৩১	১২	ডাঃ	ডঃ
৩১	২০	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
৩৬	পার্শ্বটীকা	মেহের উন্নিসা	মেহের উন্নেছা
ঐ	১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১	ঐ	মেহের উন্নেছা
৪৪	২	তাহাদেব	তাঁহাদের
৪৬	২৬	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
৬৮	৭	ইাতমধ্যে	ইতোমধ্যে
৮৩	৩	হুয়া	হয়্যা
৮৩	২৯	ডাঃ	ডঃ
৯১	১১	আভনব	অভিনব
১২৩	১৭	কালানি	কানালি
১৪৫	২	৩০৮৩৫৬৫	৩০৮৩৫৬৪
১৫৪	১৮	জিলার গড	জিলার গড
		৯৩ — ৩	যথাক্রমে ৯২'৭৫, ৪'২৫, ৩
১৬৯	৬	অসমারিক	অসামরিক
১৬৭	২০	৮	১১
১৯১	১	খ। অনাবৃষ্টি ও বন্যা।	অতিবৃষ্টি ও বন্যা
১৯১	পার্শ্বটীকা	দামোদর	দামোদর ক্যানেল
২৬৪	২৮	পুর্বে	পরে
২৬৫	২০	আবাঙ্গালীর	অবাঙ্গালীব
২৬৬	১০	সালালপুব	সালানপুর
২৭৩	২৪	বাসভ্রাম	বাসভূমি
২৭৯	১৯	ডাঃ	ডঃ
২৮১	১২	ডাঃ	ডঃ
২৮৩	১৭	ডাঃ	ডঃ
২৮৫	২০	অবম্বন	অবলম্বন
৩০৫	১৬	পশ্চিম বংগের	পশ্চিম বঙ্গের